ভাগের পূজা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৩০

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পূজারীগণঃ—

১। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া

২। শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার

৩। শ্রীমতী সরসীবালা বসু

৪। শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী

৫। শ্রীমতী চারুবালা বসু

৬। শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন

৭। শ্রীমতী লীলা দেবী

৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৯। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

১০। শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়

১১। শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

১২। শ্রীযুক্ত জলধর সেন

১৩। শ্রীমতী স্নেহশীলা বসু চৌধুরাণী

১৪। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

১৫। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

১৬। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত


উপহার

ভূমিকা

শ্রীমান বিজয়রত্ন মজুমদার ভায়া 'যমুনা'-পত্রে 'ভাগের পূজা' জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আরম্ভ সময়ে ভয় হইয়াছিল, 'ভাগের মা' যেমন গঙ্গা পান না, এ 'পূজা'ও তেমনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এ পূজার যিনি প্রধান পুরোহিত, সেই বিজয়রত্ন ভায়া সেকেলে পুরোহিত নন ; তাঁর মধ্যে একালের তেজ আছে, নিষ্ঠা আছে। তাই একে একে ষোলজনকে দিয়া যোড়শোপচারে এই পূজা শেষ করিয়াছেন। তাঁহার আরও বাহাদুরী এই যে তিনি এই পূজার ভার সমান অংশে পুরুষ ও মহিলাবৃন্দের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আমি সেকেলে বুড়া মানুষ ; আমাকেও এই পূজার সামান্য একটু নৈবেদ্য সাজাইতে হইয়াছিল! মনে করিয়াছিলাম, আমি ঐটুকু করিয়াই অব্যাহতি লাভ করিলাম। কিন্তু, শ্রীমান বিজয়রত্ন নাছোড়-বন্দা ; তিনি আমাকে দিয়া এই 'ভাগের পূজা'র ভূমিকা না লিখাইয়া ছাড়িবেন না। কিন্তু কি লিখিব? এই ষোলজন পূজারী ও পূজারিণী, যাঁর যেমন খেয়াল, যাঁর যেমন মর্জ্জি, তেমনই করিয়া আখ্যানভাগ লইয়া খেলা করিয়াছেন ; কেহ গিয়াছেন দক্ষিণে, কেহ ঠিক তাহার পরেই একে-বারে পশ্চিম মুখে দাঁড়াইলেন। শেষে দেখা গেল যে, এই যথেচ্ছাচারের মধ্য দিয়াও গল্পটী সুন্দরভাবে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি (এ অধীন বাদে) 'ভাগের পূজা' সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু বলা আমার পক্ষে শোভন হইবে না, কারণ আমিও যে এ পূজায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ইতি

শ্রীজলধর সেন

দুটো কথা

'যমুনা'র পক্ষ থেকে 'ভাগের পূজা' সম্বন্ধে দুটা কথা বলা কর্ত্তব্য বলে মনে করি। না বল্লে প্রত্যবায় আছে; কিন্তু দেখ্‌ছি যা বলবার তা আমার অগ্রজোপম জলধর দা বলেই দিয়েছেন।

কথাটা বিজয়রত্ন ভায়া যখন তুলেন তখন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছলাম, কেননা ভায়ার খেয়ালে একটু নূতনত্ব ছিল, পূজারিণী ও পূজারী এ পূজায় পালা করে যোগ দিবেন। এর আগে ভারতীতে 'বারওয়ারী' যে বেরিয়েছিল, তাতে বারজন পূজারীই ছিল। আমি ত বিশ্বাসই করতে পারি নাই যে আটজন পূজারিণী এই পূজায় যোগ দিয়ে সফলতাকে করায়ত্ত করে তুলবেন।

আমি এই ষোলজন সাহিত্যসাধক ও সাধিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁরা যে পরিশ্রম স্বীকার করে আমাদের এই ছোট কাগজে ভাগের পূজার পৌরহিত্য গ্রহণ করেছেন, তাতে তাঁদের মহানুভবতাই প্রকাশ পাচ্চে। সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বিনী শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া যে সমস্যার ইঙ্গিত করে দিয়েছিলেন পরবর্ত্তী শক্তিশালী লেখক লেখিকারা সেই সমস্যার পূরণ করতে চেষ্টা করেছেন। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করেছেন প্রথিতযশা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।

পরিশেষে একটা কথা বলি, এই ভাগের পূজার পরিকল্পনা বিজয়রত্ন ভায়ার—ইহাকে সফল করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। আজ ভাগের পূজাকে পুস্তকাকারে দেখে তাঁর যতটা আনন্দ হ'বে ততটা অন্তের হ'তে পারে না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি বিজয়রত্নের সাহিত্য-সাধনা দিন দিন সফলতা লাভ করুক।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র
যমুনা-সম্পাদক

নিবেদন

শ্রদ্ধাস্পদ জলধর দাদা ও চারু দা' দু'জনেই লিখেছেন, "ভাগের পূজা" যে ষোড়শোপচারে শেষ হয়েছে তার কৃতিত্ব যা কিছু, আমারই। আমার মনে হয়, যে পনেরজন লেখক লেখিকা—আমার সাহিত্য ভ্রাতা ও সাহিত্য-ভগ্নী এই পূজার কায করেছেন, কৃতিত্ব তাঁদেরই ; তাঁদের সহায়তা ছাড়া এ কায আমার দ্বারা সম্ভব হোত না। তাঁদি'কে ও আমাদের এই উদ্ভট খেয়ালকে যাঁরা প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই 'যমুনা' কর্তৃপক্ষগণকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। শেষ বক্তব্য, বঙ্গবাণীর সন্তান-সন্ততিগণের মিলিত প্রচেষ্টার ফল বঙ্গীয় সুধীজনকে সন্তুষ্ট করতে যদি পারে, তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে। ইতি, শারদীয়া, ১৩৩০

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

বঙ্গ সাহিত্যে অমর কীর্ত্তি

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট হইল।

ভাগের পূজা

১

লেখিকা— শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া সেইমাত্র পূজার ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,—শুনিলাম, ছোট ভাই তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহার প্রিয়তম গান গাহিতেছেন,—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি!"

মনটা স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল!—এই গানটা অনেকের কণ্ঠে শুনিয়াছি,—নির্ম্মলের কণ্ঠে ভাল লাগিত বলিয়া ফরমাস দিয়া-ও দু' একবার তাহাকে গাওয়াইয়াছি, কিন্তু ভাল জমাট বাঁধে নাই। নির্ম্মল যখন কোন ফরমাসের খাতির-যত্ন না পায়,—আনমনে যখন নিজের খেয়ালে গায়, তখন তার কণ্ঠস্বরে কি বিশেষত্ব প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠে, জানি না। সে সময় যা কিছু গায়, আমার বড় মিষ্ট লাগে।

আজ শুনিলাম,—সেই আপন-ভোলা, আনমনা খেয়ালী সুর! সমস্ত দিনটা আজ আমার মন ভাল নাই,—একাদশীর উপবাস করিয়া, সদ্যঃ বিধবা গরীব পুরোহিত-পত্নী আজ সমস্ত দুপুর ধরিয়া যে কান্নাটা আমার কাছে কাঁদিয়া গিয়াছেন,—তাহাতে মোক্ষ চিন্তার পথে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইয়া, সমস্ত হৃদয়টা আমার, ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত—বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে। অসহায় দুর্ব্বলের উপর,—শক্তিশালী প্রবলের পীড়ন প্রতাপ আলস্য না ধরিলেই—যখন খুসী জাহির করা,—এ তো জন্মাবধিই দেখিয়া আসিতেছি। এ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের দাবী লইয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার লোক যে কত বিরল, তাও খুব জানি। তবু কেন যে মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মন বাঁকিয়ে উঠে,—কেন যে দুস্থের মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠে, জানি না। অনর্থক কপালের ভোগ আর কি।

পুরোহিত-পত্নীর দুঃখের কাহিনীটা কিছু বেশী বৈচিত্র্য-রঞ্জিত নয়। সেই,—প্রচলিত প্রথামত, সাধারণ ঘটনা! অল্প বয়সে চার পাঁচটি শিশু-সন্তান লইয়া তিনি বিধবা হইয়াছেন, মাথার উপর বলিষ্ঠ অভিভাবক কেহ নাই,—তিনি দরিদ্র, এবং সবচেয়ে মহাপাপ, তিনি কিঞ্চিৎ সুন্দরী, এবং বুদ্ধিটাও তাঁহার নিতান্ত দীন হীন স্বভাবের নয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে,—চিরদিন ধরিয়া যা ঘটিয়া আসিতেছে,—তাই ঘটিয়াছে!..... অবাধ্য স্ত্রীলোকটাকে রীতিমত শাসন করিবার জন্য, ব্যর্থ আক্রোশে গ্রামের দু' চারজন মাতব্বর এবং জমিদার গোষ্ঠির অন্তর্গত আমার এক মহামান্য পিতৃব্য মহাশয় খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

বাস্তবিকই এগুলা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল,—যদি নিজের

চোখে অত্যাচারের প্রমাণগুলা না দেখিতাম! সে সব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই; কিন্তু ছয় বছরের পর ছ'মাসের জন্য পল্লী ছায়ার নির্জ্জন শান্তিতে বাস করিতে আসিয়া যে এত মর্ম্মব্যথা ভোগ করিতে হইবে,—এটা কল্পনার অতীত ছিল! অল্প বয়সে,—যখন কোন দিকে চোখ কাণ রাখিবার সামর্থ্য ছিল না,—তখন পল্লী জীবনের আবহাওয়া খুবই ভাল লাগিয়াছিল। এখনও আমি এই পল্লী জীবনকে খুব ভালবাসি। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ আমার ভয় জাগিয়াছে,—ওই প্রবল প্রতাপশীলবর্গের নৃশংস অত্যাচারে নিরীহ দুর্ব্বলদের নিষ্পিষ্ট হওয়া দেখিতে দেখিতে পাছে, হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া নিজের মোক্ষ সাধনার পথটায় কোন সময়ে কাঁটা দিয়া বসি,—সেই ক্ষতির আশঙ্কাটাকে! কিন্তু—মানুষ হইয়া, মানুষের এ নির্য্যাতন দেখা আর সয় না যে!

মাথার শিরাগুলা দপ্ দপ্ করিতেছিল! নির্ম্মলের ঘরে বারেণ্ডায় আসিয়া অন্ধকারেই সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। নির্ম্মলের গান ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারে বারে ধ্বনিত হইতেছিল:—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
কক্ষে আমার বদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি।"

মনে মনেই ভাবিলাম,—অন্ততঃ পুরোহিত-পত্নীকে যে আজ ইতর নির্য্যাতনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেছি না,—এ দুঃখটা, এ "বদ্ধ-দুয়ার" বড় অসহনীয় বটে!

অন্ধকারে জুতা পায়ে কোন একটি কিশোর মূর্ত্তি সামনে আসিয়া সহসা ডাকিলেন, "মা,—নয় ?"

চমকিয়া দেখিলাম,—পুত্ররত্ন ! সহর হইতে বাড়ী আসার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম—"প্রসাদ ? হঠাৎ এলি, কি রকম ?"

ক্ষোভোত্তেজিত স্বরে সে বলিল "আর পিকেটিং করব না মা। গাঁজার দোকানে কদিন ধরে পিকেটিং করে এবার খুব শিক্ষা লাভ হয়েছে! যে দেশের লোক এত গাঁজাখোর,—সে দেশ নন্ কো অপারেশনের যোগ্য হতে এখনও ঢের দেরী !"

নিম্মল আলো হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সাগ্রহে বলিল "কেন বল দেখি ? কি খবর ? সমস্ত আগাগোড়া বল, সহরের অবস্থা এখন কি রকম ?"

সে সমস্ত খবর,—বসিয়া শুনিতে গেলে, ছেলেটার আহারের ব্যবস্থা দেখা হয় না, কাযেই আমায় উঠিয়া পড়িতে হইল। নির্ম্মল প্রসাদের সঙ্গে সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া দেখিলাম গয়লা-বৌ গাই দুহিয়া আনিয়া দুধের বক্‌নোটা রাখিতেছে। আমায় দেখিয়া বলিল "বাড়ী চল্‌লুম পিসিমা।"

মন ব্যস্ত ছিল, সংক্ষেপেই বলিলাম "যাও।"

ঘরে ঢুকিয়া অন্যমনে কাজ করিতেছি—একটু পরে শুনিলাম, দূরে গোয়াল ঘরের কাছে, গরুর চাকর হরি বাগ্দীর সঙ্গে ইতিমধ্যে গয়লা-বৌয়ের বচসা সুরু হইয়া গিয়াছে!

বাহিরে আসিয়া বলিলাম—"কি হোলো?"

গয়লা-বৌ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ত্থাখোদেখি পিসিমা, আমি মেয়ে মানুষ, এই অন্ধকারে একলা কি করে বাড়ী যাই? হরেকে বল্‌ছি একবার আলোটা দেখিয়ে দে,—তা যাবে না। না বাবু এমন করলে কাল থেকে 'সঙ্গে' বেলায় গাই দুইতে আস্‌বো না।"

হরে অলস মধুর সুরে কি একটা আপত্তির কথা জানাইল, শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু তাহার স্বভাব জানিতাম,—এক কথায় কথা শোনা বা হিসাব বুঝিয়া আগের কাজ আগে করা, তাহার কোষ্ঠিতেই লেখা নাই!—বিরক্ত হইয়া বলিলাম "যা আগে গয়লা-বৌকে রেখে আয়।"

হরে স্পষ্ট স্বরে জবাব দিল "এখন আমি খড় কাট্‌তে যাচ্ছি।"

সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠা ছাড়া গতি নাই, দেখিলাম! কিন্তু, এই দুর্ভোগটা

আমার পক্ষে বড়ই ক্লেশাবহ ছিল।—ক্রোধের দ্বারা আমি অপরের কতখানি অনিষ্ট সাধন করিতে পারি, তার হিসাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম; কিন্তু নিজের জন্য যে এ পর্য্যন্ত কত পীড়া সঞ্চয় করিয়াছি—সেটা হিসাব হাড়ে হাড়েই আঁকা আছে। তবুও উপায় নাই। সংসারের সঙ্গে যখন সম্পর্ক রাখিতেই হইয়াছে, তখন ঠেকিয়া ঠকিয়া, একটু শিক্ষালাভ করিতেই বাধ্য হইয়াছি যে,—লাল চোখ না দেখিলে কোন ন্যায়ের অনুশাসন মানিতে চায় না, এমন এক শ্রেণীর মানুষ এ সংসারে প্রচুর পরিমাণেই আছে; অন্ততঃ আমার চারিদিকে এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য কিঞ্চিৎ বেশীই।

দৃপ্তকণ্ঠে বলিলাম—"থড় থাক, আগে গয়লা-বৌকে রেখে এস।"

মুহূর্ত্তে সুর নামাইয়া সে উত্তর দিল, "যাচ্ছি।"

নিশ্চিন্ত হইলাম। জল খাবার সাজাইয়া লইয়া নিম্নলের বারেণ্ডার দিকে যাইতেছি,—শুনিলাম গোয়ালের বেড়ার আড়ালে বসিয়া নিজের চারকোণা কাচের লণ্ঠন পরিষ্কার করিতে করিতে,—হবে নিজের মনে অস্ফুট স্বরে ছড়া কাটিয়া গোঁজ গোঁজ করিতেছে। সব কথা শুনিতে পাইলাম না, যেটুকু কাণে ঢুকিল, তাহার অর্থ এই যে,—ছুতারণীশ্রেণীর যে নির্লজ্জ-ধৃষ্টা অবাধে সমস্ত পাড়াটা বেড়াইয়া আসে, স্নানের সময় সেই আবার অসমর্থতার অজুহাতে পরকে খাটাইয়া, জল তোলাইয়া স্নান করে! ওই গয়লা-বৌ একলা একলাই,—নিজের গরজে সারাদিন হাটবাজার করিয়া বেড়ায়,—পান খাইয়া এ পাড়ায় সে পাড়ায় খবরদারী করে, তখন কয়গণ্ডা চাকর উহার সঙ্গে প্রহরা দিবার জন্য থাকে?..... ইত্যাদি—

কথাটা সত্য। অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র গৃহের বিধবা নারী,—ওই গয়লা-বৌটা। লোক লস্কর প্রহরী পরিজন কেহই তাহার নাই, নিজের

হাট বাজারটা পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের হাতেই করিতে হয়। বয়স অল্প—সুতরাং সত্য হউক মিথ্যা হউক, দুর্নাম তাহার অল্প বিস্তর রটিয়াছে,—শুনিতে পাই। হয়ত সেগুলা সত্য, কিন্তু মিথ্যা হওয়াও যে অসম্ভব নয়,—তাই বা বলি কি করিয়া? অনেকের নামেই ত অনেক কথা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম, কাহারও দ্বারা কাহারও ক্ষুদ্র স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিলেই ত—অমনি নির্ব্বিচারে কুৎসা সৃষ্টির—কারণ গজাইয়া উঠে! তা সে হউক না যত বড় মিথ্যা,—যত বড় ভিত্তিহীন অর্থহীন কাহিনী! এ দেশের মাটী বড় উর্ব্বর,—পরকুৎসার শস্যটা এখানে অবহেলায় বড় সুলভেই উৎপন্ন হয়! আড়াল পাইলেই রাজার মাকে ডাইন বলিবার প্রথাটা না কি এখানকারই সনাতন ধর্ম্ম! সুতরাং মিথ্যার জন্য সঙ্কোচ-বোধ করিবার মত কোন দুঃখই, এ সোণার দেশে নাই! পল্লীগ্রামের লোকের মন কি সরল,—আর কতই উন্নত! সহর দেশের অবস্থা, কে জানে কি রকম!

হরের কথাটা শুনিয়া লইলাম,—কোন উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিলাম না। কি উত্তর দিব? হরে যদি আমাদের গরুর চাকর না হইয়া আমার খুল্লতাত হইতেন এবং গরীব গয়লা-বৌটা যদি আমাদের সেই গরীব পুরোহিত-পত্নী হইতেন, তা হইলেও এই ব্যঙ্গ শ্লেষ গুলা এর চেয়ে বেশী কিছু ভদ্র সংস্করণে উন্নতি লাভ করিত না, ইহা যখন স্থির নিশ্চয়, তখন কিছু বলিবার চেষ্টাই ধৃষ্টতা!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্ধকারের আড়াল দিয়াই নিঃশব্দে চলিলাম। হরে নিজের মনে আরও খানিকটা বকিল, তার পর,—যথেষ্ট অপ্রসন্নভাবে বাহিরে আসিয়া, গয়লা-বৌকে ডাকিয়া বলিল "শীগ্গীর এস!"

চাহিয়া দেখিলাম,—গয়লা-বৌ চলিয়া গেল। পশ্চাদ্বর্ত্তী হরের চলনের ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম ইহার চেয়ে,—অনিচ্ছুক গতির চলন আর নাই।

সহানুভূতি বোধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলাম না। সাধ্যপক্ষে আশ্রিতদের উপর বেশী কাজের চাপ দিতে চাই না, যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়াই চলিতে চাই। কিন্তু "মানুষ",—আর "মানুষের অন্যায়"—এ ছুটার পার্থক্য বোধ, আজ অনেক ঘা খাইয়া,— অনেক ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। মানুষের খাতিরে মানুষের অন্যায়কে আজ ভক্তির চক্ষে দেখিবার সামর্থ্যও আমার নাই।

বারেণ্ডায় উঠিয়া প্রসাদের গল্প স্রোতে বাধা দিয়া বলিলাম "হাত মুখ ধুয়ে জল খাও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জল খাইতে খাইতে প্রসাদ বলিল "চর্‌কা কাটছ মা ?"

সংক্ষেপেই উত্তর দিলাম "যতটুকু সময় পাই, আর চোখে যতক্ষণ সয়, ততক্ষণ সুতো তৈরী করি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, যার পর নাই অসন্তোষ ভরে মাথা নাড়িয়া সে বলিল "কিন্তু দেশের ছোটলোক গুলোকে মদ গাঁজা টাড়ি না ছাড়ালে কোন কাযই হবে না। এ দেশটা নেশার ঝোঁকেই মরে রয়েছে।"

শুষ্ক হাস্যে নির্ম্মল বলিল "তার কারণ—সুশিক্ষার অভাব! আগে ছোটলোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর। ছেলে ধরে, কেউটে ধরিস্, তবে ধরা সার্থক হবে।"

দুজনের মতে সামঞ্জস্য না থাকিলেও, দুটা মতই বোধ হয় মূলতঃ সত্য। —আরও কত মত শুনিয়াছি, যাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু একই সত্য, সকলের মধ্যে আংশিক ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু অসামঞ্জস্যের তর্কের ভিড়ে কায করিবার পথ এবং অবসর দুই আটক পড়িয়াছে।—যাক্, তর্ক শুনিয়া যতটা সময় আরামে কাটে, কাটুক!—চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

"ছোট লোকদের" মধ্যে শিক্ষা চালাইবার সখটা নির্ম্মলের যেমন ছিল, প্রসাদের তেমন ছিল না।

স্কুলে ধর্ম্মঘট সুরু হইবামাত্র, সে সকলের আগে স্কুল ছাড়িয়া বাহিরে আসে। সে নিজে ছিল পেশী-প্রধান ধাতুর মানুষ, সুতরাং 'পিকেটিংএর'

'জোরটার' উপর আস্থা রাখিত— খুব বেশী। সেই জন্যই বিশেষ উৎসাহে ওই পথটায় গিয়াছিল। নির্ম্মল ভিন্ন ধাতুর মানুষ। তা ছাড়া স্বাস্থ্যের অভাবে,— শারীরিক শক্তি খরচের চেষ্টাটা ছিল— তাহার কম। হট্টগোলের ভিড়ে ঢুকিলেই সে ক্লিষ্ট অসুস্থ হইয়া পড়িত বলিয়া,—সে দিকটায় বড় ঘেঁসিত না। সেই জন্যই আসন্ন বি-এ পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার চেষ্টায় কলিকাতার ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে পল্লীবাসে আসিয়া, আড্ডা লইতে হইয়াছিল।

নির্ম্মলের প্রস্তাবে প্রসাদ একটু দমিয়া গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "ছোট লোকদের শিক্ষা-টিক্ষা এ সব পরে হলেও চল্‌বে। আমাদের পাড়ার হেমবাবু বল্‌ছেন,—আগে ওদের দিয়ে কায করিয়ে নাও।"

নির্ম্মল বলিল "কায কর্‌তে হলেই তার উপযোগী শিক্ষা একটা চাই, "

মুহূর্ত্তে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। শিক্ষা বলিতে প্রসাদ বোঝে এ, বি সি, ডি, অক্ষর পরিচয় হওয়া,—নির্ম্মল বোঝে অন্যরূপ।—উদাহরণের দ্বারা সে নিজের ধারণাটা প্রসাদকে বোঝাইবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইল। প্রসাদ রাগিয়া উঠিয়া বলিল "তুমি জানো না ছোট মামা,—ও সব চাল্ এ দেশে চল্‌বে না। বিলাতি ছোট লোক গুলো আর যাই হোক,—জাতীয় স্বার্থ বলে একটা জিনিষকে বোঝে,—এ দেশের ছোট লোক গুলো তা বোঝে না। আজ একজন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী গাঁজা কিনিতে এসেছিল, ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে তাকে কত কাকুতি মিনতি করলুম—হাতে ধরলুম, পায়ে পড়লুম,—শেষে পৈতে দেখিয়ে যোড় হাত করে বললুম, "গাঁজা খেও না," তাতে সে রেগে লাল! হাঁক ডাক করে চেঁচিয়ে বল্লে, "আরে আমার মহাদেব গাঁজা খায়, আমি কেন খাব না? আমি আলবৎ খাব, আলবৎ গাঁজা কিনব, তোমাদের স্বদেশীর খাতিরে কি আমি ইষ্ট দেবতার

অপমান করব ?" বলে সে আমাদের হাত ছাড়িয়ে গাঁজা কিনতে দোকানে ঢুকল। আমিও রাগ করে পিকেটিং ছেড়ে বাড়ী চলে এলুম। —এসব ছোট লোক নিয়ে কি কাজ হয় ? এদের শিক্ষা দিয়ে কি বা হবে ?"

পিকেটিং ছাড়িয়া অকস্মাৎ প্রসাদের বাড়ী আসার কারণটা এতক্ষণে ব্যক্ত হইল দেখিয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু কারণটা শুনিয়া অসুখী হইলাম।—নির্মল হাসিয়া বলিল "মহাদেব গাঁজা খান, অতএব তাঁর ভক্ত গাঁজা খেতে বাধ্য,—যুক্তিটা বলবান বটে, কিন্তু মহাদেব তো শুধু গাঁজা খেয়েই সব কর্ত্তব্য শেষ করেন নি,—বিশ্বধ্বংসী হলাহলকেও তিনি পাকস্থলী বাঁচিয়ে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন,—বিশ্বকে ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তটি সে বিষয়ে কতদূর সমর্থ,—পরীক্ষা করে দেখেছিলি প্রসাদ ?"

প্রসাদ ক্ষুণ্ণ এবং কতকটা ক্ষোভোত্তেজিত হইয়াই বলিল "আরে, তখন কি আমার জ্ঞান বুদ্ধি যোগাল ? রাগে তখন আমি—প্রায় দিশেহারা হয়েই উঠেছিলুম ! আমার এমন ইচ্ছে হোল যে..."

সবিদ্রূপ হাস্যে নির্মল বলিল "ঐ তো দোষ !—ঐ জন্যেই মহাজনরা উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, যুদ্ধের বাজনা শোনবার আগেই শিং শানিয়ে তৈরী হও।—কারণ যুদ্ধের বাজনা সুরু হবার পর শিং শানাবার ফুরসুৎ আর মিলবে না,—তখন মরো আর তরো, সেই ভোঁতা শিং নিয়েই, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে লড়তে হবে। তাতে পেটা বাঁচুক আর মরুক,—তার জন্যে দায়ী তোমার বুদ্ধি আর বিবেচনা !"

অনিষ্টকর অগৌরবের জন্য, বুদ্ধি বিবেচনাকে দায়ী হইতে দেখিলে, কোন মানুষই স্বস্তি পাইতে পারে না। প্রসাদ জল খাওয়া শেষ করিয়া,

হাত ধুইতে ধুইতে—অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "বুদ্ধি বিবেচনার দোষ কি বল? দৈবের গতিকে সবই"—

হঠাৎ দূরে একটা বিস্ময়োত্তেজিত নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল! আমরা তিনজনেই একযোগে চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম "ও কি!"—

আবার সেই আর্ত্ত চীৎকার! আমার বুকের ভিতরটায় ধড়াশ করিয়া উঠিল! এ যে গয়লা-বৌয়ের আর্ত্তনাদ!—মুহূর্ত্তে সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। একাদশীর উপবাসের ক্লেশকে চিরদিনই অবহেলা করিয়া চলিতেছি, কখনও কাতর হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।—কিন্তু আজ এই একটা মুহূর্ত্তে,—মনে হইল, আমার সমস্ত দেহেন্দ্রিয় গুলা হঠাৎ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, উঠিয়া দাড়াইবার শক্তিও আর নাই!—ওই ভয়ার্ত্তা নারীকে,- লঘু হউক গুরু হউক কোন বিপদ হইতেই পরিত্রাণ করিবার চেষ্টায়—একটু সাহায্য করিবার অধিকার পর্য্যন্ত, ভগবান আমার হাতে রাখেন নাই। আমি দুর্ব্বল, অপদার্থ নগণ্য! কি মহাপাপ!—

কাতর দৃষ্টিতে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বোধ হয় অ[illegible]-জড়িত স্বরে কি একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কথাটা [illegible] হইতে না হইতে নির্ম্মল ও প্রসাদ আলোটা তুলিয়া লইয়া—এক সঙ্গেই [illegible] ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

সাপ চোর... .ক্ষ্যাপা কুকুর, পাগলা শিয়াল,—পাড়াগাঁয়ের পক্ষে সুলভ ও দুর্লভ অনেক আকস্মিক বিপদ ভয়ের কথাই মনে পড়িল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় গুলা স্তব্ধ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল,—অন্তর তখন আকুল উৎ-কণ্ঠায় ত্রাহি মধুসূদন জপিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে বাহিরের রাস্তায় গয়লা-বৌয়ের সরোদন অভিশাপ বাণী ও ভগবানের উদ্দেশে কি কতকগুলা অভিযোগ ঘোষণার কথা শুনিতে পাইলাম। কথাগুলার অর্থ ভাল রূপ বুঝিতে পারা গেল না, শুধু এই বুঝিলাম, নির্ম্মলের সংক্ষিপ্ত মৃদু কণ্ঠস্বরও তাহার মধ্যে আছে, এবং তাহারা এই বাড়ীর দিকেই আসিতেছে।

সকলেই আগেই গয়লা-বৌ বাড়ী ঢুকিল। তার পর লণ্ঠন হাতে করিয়া নির্ম্মল। নির্ম্মলের পিছনে হরের সঙ্গে আর একটা কে লোক,—একটু যেন জড়সড় ভাবে বাড়ী ঢুকিল। চাহিয়া দেখিলাম,—সে প্রসাদ নয়। প্রসাদকে দলের মধ্যে দেখিলাম না।

নির্ম্মল আসিয়া রোয়াকের নীচের পৈঠায় বসিল। কোন কথা না বলিয়া, হাতে হাত দিয়া, গুম্ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

গয়লা-বৌ একটু দূরে উঠানের উপর মাথা নীচু করিয়া বসিল। হবে ও তাহার সঙ্গীটি—উঠানের এক কোণে অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই নীরব।—

দুর্ভাবনা উদ্বেগ বাড়িয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম "প্রসাদ কই?"

নির্ম্মল মাথা নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "ছোট খুড়োকে ডেকে আন্তে গেছে।"

ছোট খুড়োকে!……পুরোহিত-পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত মনটা—ওই পূজনীয় পিতৃব্যের সম্পর্কটা স্মরণ করিতেও,—সঙ্কোচে বেদনায় যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। অধিকতর সংশয়ভীত হইয়া বলিলাম "কেন?"

নির্ম্মল তীব্রস্বরে বলিল "তার আদরের চাকর অরুণ বাগ্দীর কীর্ত্তি

দেখাবার জন্তে। আর আমাদের এই হয়ে,—বেশ বুঝ্‌ছি আগে থেকেই অরুণের সঙ্গে ষড়যন্ত্রটা তার ঠিক করাই ছিল, নইলে···অরুণের এত সাহস হয় যে—" নির্ম্মল চাপা গর্জ্জন সহ হঠাৎ চুপ করিল!

দুয়ারের কাছে খড়ম ও জুতার শব্দ হইল।—চাহিয়া দেখিলাম, প্রসাদের সঙ্গে ছোট খুড়ো তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে করিয়া শ্রীহরি দুর্গানাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

২

লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি মেলিয়া ছোট খুড়ো একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন · আমাকে ডেকেছ, সত্য ?

এ হেন সময়ে এ হেন স্নেহের সম্বোধনে বাস্তবিকই আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। সাধ্যপ্রকারে কোনদিনই আমি ছোট খুড়োর সম্মুখীন হইতে চাহিতাম না। তাঁহার গরল-ভরা অন্তস্তল হইতে স্নেহের কথাগুলি কোনদিনই আমার কাণে অমৃত বর্ষণ করিত না, আজও করিল না। আমি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া অদূরে উপবিষ্ট নতমুখী গয়লা-বৌএর দিকে চাহিয়া বক্তব্য স্থির করিয়া লইতেছি, ছোট খুড়ো প্রসাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি হে, খবর কি ?

এবারেও আমি কথা কহিতে পারিলাম না। নির্ম্মল বোধ করি আমার লজ্জা কুণ্ঠা বুঝিতে পরিয়াছিল, সেই বলিল—খবর আছে, বল্‌ছি।

জানি না কেন, ছোট খুড়ো আমাকে এক আধটু স্নেহ করিতেন,

কিন্তু নির্ম্মল একেবারেই সে রসে বঞ্চিত ছিল। নির্ম্মলকে বোধ করি ইতিপূর্ব্বে অন্ধকারে তিনি চিনিয়া লইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হইয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বিরক্তিভরে বলিলেন—সত্য, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ ?

আমি ছোট খুড়োর উষ্ণ কণ্ঠস্বরে একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জড়িতকণ্ঠে বলিলাম—ছোট কাকা, আমি...

নির্ম্মল দীপ্তকণ্ঠে বলিল—উনি নন্, খুড়ো, আমরাই আপনাকে ডেকেছি।

ছোট খুড়ো একবারমাত্র প্রদীপ্ত নেত্রে বক্তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে দ্বারের দিকেই ফিরিতেছিলেন, নির্ম্মল বলিল—যাবেন না কাকা···

প্রসাদ এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল, বলিল—আপনার চাকর অরুণে বাগ্দী কি করেছে শুনেছেন ?

আমার পুত্র বলিয়াই বোধ করি প্রসাদ তাঁহার স্নেহ পাইয়াছিল, ছোট খুড়ো চমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না—কি করেছে ?

রাস্তায় গয়লা বৌ-কে...

কে গয়লা বৌ ?

নির্ম্মল বলিল—দিদি, একটা আলো দাও ! একটু খানি সরিয়া আসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গয়লা বৌকে দেখাইয়া বলিল—এই গয়লা বৌ ! বেচারা আমাদের গাই দুয়ে বাড়ী ফিরছিল, আমাদের হরে সঙ্গে ছিল, তা সত্ত্বেও আপনার আদুরে গোপাল চাকর অরুণে বাগ্দী আর এক বেটা কে বামুনদের পুকুর-পাড়ের গাব-তলা থেকে বেরিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে...

ছোট খুড়ো প্রসাদের দিক চাহিয়া কহিলেন, তার পর?—তবুও নির্ম্মল উত্তর দিল।

বলিল—গয়লা বৌ চেঁচিয়ে উঠতে আমি আর ভাগনে ছুটে গিয়ে দেখি, হরের হাতের লণ্ঠন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, অরুণে গয়লা-বৌকে টানতে টানতে···

সন্ধ্যেবেলা,—বেটাদের স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

হরি! হরি! সন্ধ্যাবেলা ঘটিয়াছে বলিয়াই কাজটা দোষের?—আমি আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলাম—কাকা এ-কি আচরণ?

কাকা আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আমার মুখে তিনি কি দেখিলেন, কে জানে,—একটি কথাও না বলিয়া আর একবার তীব্র দৃষ্টিতে গয়লা-বৌকে দেখিয়া লইলেন।

প্রসাদ বলিল—আমরা সময় মত গিয়ে না পড়লে যে কি হোত তা বলা যায় না।

কিছু হ'ত না ভায়া!—বলিয়া খুড়ো মহাশয় সহাস্যে প্রসাদের পিঠে একটি মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। প্রসাদ একটু সরিয়া গিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—কি বলছেন ঠাকুর্দ্দা! আমরা দু'জনে না গিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই...

হাঁ, তারপর?—তিনি একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—ভায়া, গাই বাছুরে ভাব না থাকলে কি আর অরণ্যে ভর সন্ধ্যেবেলা গাঁয়ে-ঘরে কারু গায়ে হাত দিতে পারে?

আমার বুকটা জ্বলিয়া উঠিল, বলিলাম—মিথ্যে কথা। গয়লা বৌকে খুব ভাল জানি আমি।

খুড়া মহাশয় কি একটা উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলেন, নির্ম্মল তাহার পূর্ব্বেই বলিল—ও-সব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলছি নে। আপনার চাকর যে গাঁয়ের বৌ-ঝি, মেয়েদের গায়ে হাত দেয়—এ'তে নিশ্চয়ই আপনাদের উৎসাহ আছে।

প্রসাদ বলিল—ঠাকুর্দ্দা, আপনি অরুণো বেটাকে আমাদের হাতে দিন, আমরা তার বিচার করব। সে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েছে··

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—স্ত্রীলোক বলেই ত গায়ে হাত দিয়েছে ভায়া। পুরুষ হ'লে কি আর হাত দিত।

ছোট খুড়ো মহাশয়ের কথার মর্ম্ম আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। প্রসাদও পারে নাই, জিজ্ঞাসিল—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবে ?

দেবেই ত ! স্ত্রীলোককে যে সাধারণ ভোগ্যা করেই বিধি সৃষ্টি করেছেন। নদী রাজপথ, শুঁড়ির দোকান, সভাস্থল, জলাশয়ে যেমন সকলের সমান অধিকার, স্ত্রীলোকের ওপরও তেমনি সকলের সমান অধিকার আছে —ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং এ কথা বলেছেন।

নির্ম্মল তিক্ত কটু কণ্ঠে বলিল—জ্ঞান ত অসীম দেখছি আপনার ; বুদ্ধ বলেছেন ! বুদ্ধদেবের সব উপদেশ কি এমনি করেই মানা হয় ?—রাগে সে কাঁপিতেছিল। নির্ম্মলের রাগটা চিরদিনই আমার ভয়ের বস্তু। রাগিলে গুরু লঘু বিচার বুদ্ধি অনেকেই হারায়, কিন্তু নির্ম্মল রাগের সময় অনেক অঘটনও ঘটাইয়া বসিত, সেই ভয়ে আমি কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। কিন্তু খুড়ো মহাশয়ের উত্তরে আমার ভয় অনেকটা কমিয়া গেল। খুড়ো মহাশয় নির্ম্মলের কথায় কোন উত্তর না দিয়াই অদূরে দণ্ডায়মান তাঁহার সঙ্গীর উদ্দেশে কহিলেন—চল হে নবীন !

যাবেন কি! বলিয়া নির্ম্মল তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

খুড়ো মহাশয় একবার তীব্রদৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইয়া, আমাকেই বলিলেন—সত্য, ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

আর নিরুত্তর থাকিতে পারিলাম না, ছোট খুড়োর সামনে আসিয়া বলিলাম—কাকা, এ সব অনাচার অত্যাচার হ'তে থাকলে গ্রামে বাস করা যে দুষ্কর হ'য়ে উঠবে! রোজ রোজ এ সব কি হ'তে চল্ল!—গলাটা কাঁপিয়া গেল। কথাটা যেমন করিয়া বলার ইচ্ছা ছিল, বলিতে পারি নাই।

ছোট খুড়ো বলিলেন—কিছু হয় নি, সত্য, কিছু হয় নি! ওসব নটী মাগীদের কথার মধ্যে থেক না মা! আস্তাকুঁড় ঘাঁটলেই গায়ে নোংরা লাগে, পথ বাঁচিয়ে চলতে জানলে কোন গোলই হয় না। ঐ যে তোমার গয়লা বৌটি বসে রয়েছেন, মুখটি নীচু করে, বড় সহজ ভেব না মা ওঁকে, মস্ত একটি খেলোয়াড়! ও যদি না আস্কারা দেবে, অরণো বাগ্দীর সাধ্যি কি ওর গায় হাত দেয়!—এই একটি কথায় তোমায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলুম মা। আর ও সবে মন দিও না!

গয়লা বৌএর মাথাটা মাটীর সঙ্গেই মিশিয়া যাইতেছিল, আমরা তাহা দেখিতেছিলাম, ও হতভাগিনী যে এত বড় অপবাদের বোঝাটা মাথা নীচু করিয়া মানিয়া লইবে, তাহা আমার জ্ঞানেরও অগোচর ছিল, আমি যেন কি এক রকম হইয়া মুখ নত করিয়া ফেলিলাম। আস্তাকুঁড় ঘাঁটাঘাঁটির কথাটা মনে ধিক্কার জন্মাইয়া দিতেছিল।

নির্ম্মলের স্বভাবটাই ছিল, তার্কিকের। সে দুই মুহূর্ত্ত পরে বলিল—আপনি বল্‌তে চান্—গয়লা বৌ আপনাদের আস্কারা দিয়েছে?

খুড়ো মহাশয় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, খড়মের খট্‌মট শব্দে

চক্ষু তুলিতেছি, শুনিলাম—আলবৎ দিয়েছে! বলুক হারামজাদী—নিজেই বলুক, দিয়েছে কি না?

আপনার চাকর অরুণ বাগ্দীকে...নির্ম্মল গয়লা বৌএর দিকে চাহিয়া থমকিয়া গেল। গয়লা বৌ মাথা তুলিয়াছিল, তাহার মুখের ঘোমটা সরিয়া গেছে,—হঠাৎ মেঘমুক্ত হইয়া নিদাঘ সূর্য্যের মত তাহার চোখ দুইটা হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। আমার বুকখানি আশায় আনন্দে দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

খুড়ো মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—অরুণ বাগ্দীর বাবার বাবাকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! বলুক না, সত্যি কি মিথ্যে, জমিদারের ছেলে-টাকে...

বাগ্দী বেটা তার দূত?—নির্ম্মলের বজ্রগম্ভীর স্বর ধ্বনিয়া উঠিল।

জমিদারের আবার দূত, অদূত কি! প্রজা,—যখন যা হুকুম জমিদার করবে—মান্‌তে বাধ্য!

আমি বলিলাম—অমন জমিদারের মুখে আগুন!

নির্ম্মল বলিল—আপনি কি, তার মন্ত্রী?

খুড়ো মহাশয় এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—মাথা গরম কর না, ছোকরা!

ছোকরার মাথা গরম একটুও নয়। মাথা গরম হ'লে এতক্ষণ কি আর ঐ খড়ম পায়ে দিয়ে ঐখেনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে পারতেন, না আপনার জমিদারই নাবালের বৈঠকখানায় শুয়ে আল্‌বোলায় তামাক টান্‌তেন? দু'জনকেই এতক্ষণে গঙ্গাশায়ী হ'তে হ'ত!

ছোট খুড়ো নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিলেনও না, কথার

উত্তরও দিলেন না। আমাকেই বলিলেন—চল্লুম সত্য, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দেহ মনকে সংযত করিয়া লইয়া খুড়ো মহাশয়ের পা দু'টা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—কাকা, আপনি গুরুজন, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, রমণীর উপর অত্যাচার করবেন না! মা বসুমতী অনেক পাপ সহ্য করছেন, ও পাপ সইবেন না। কাকা, গ্রামটাকে উচ্ছন্ন দেবেন না।

হিতে বিপরীত হইল। খুড়ো মহাশয়ের স্নেহের খোলসটি ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়িয়া গেল, চীৎকার করিয়া বলিলেন—আমি উচ্ছন্ন দিচ্ছি—কোন্ হা—কে বলে?

কাকা, আমাদের বিধবা পুরুত

কথাটা শেষ হইবার আগেই নির্ম্মল 'দিদি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! গয়লা-বৌ-এর দেহটি সানের মেঝের লুটাইয়া পড়িয়াছে। ছুটিয়া তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলাম। তাহার মুখ দিয়া একটা গোঁ গোঁ শব্দ নির্গত হইতেছিল। নির্ম্মল উঠানের এক পার্শ্বে রক্ষিত প্রকাণ্ড বাল্‌তিটা আনিয়া আমার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—দিদি, জলের ছিটে দাও, মূর্চ্ছা গেছে।

প্রসাদ বলিল—দাঁড়াও, আমি একটা সোঁকার ওষুধ তৈরি করেছি। নিয়ে আসি—সে ঘরের দিকে যাইতেই, আমি সমস্ত উঠানটা সাফ্ দেখিতে পাইলাম—হরেকে দেখিলাম, কিন্তু ছোট খুড়া বা তাঁহার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কাহাকেও দেখিলাম না, বুঝিলাম, ইত্যবসরে তাঁহারা গা-ঢাকা দিয়াছেন।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নির্ম্মল বোধ হয় আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল—পালায় গেল কোথা! দাড়াও ত, সে ছুটিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে নিরস্ত করিতে বলিলাম--নির্ম্মল! থাক্ গে ওরা! তুমি বস, গয়লা বৌকে বাঁচাও।

প্রসাদ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া এ-দিকেই আসিতেছিল, হঠাৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিল—কে?

আমি শচী।—সঙ্গে সঙ্গেই একজন হারিকেন বাতী পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শচীকে আসিতে দেখা গেল।

শচী! আয় মা, আমি তোদের কথাই ভাব্‌ছিলুম!

শচী আমাদের বিধবা পুরোহিত পত্নীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়স বছর এগারো হইবে।

প্রসাদ বলিল—মা, এটা সুঁকিয়ে দাও দেখি বারকতক, মূর্চ্ছা ভেঙ্গে যাবে'খন।

ও-কে পিসিমা?—বলিয়া শচী আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গয়লা-বৌ ঘোমটা-টা টানিয়া দিয়া, উঠিয়া বসিতেই, প্রসাদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—মা, ওকে এখন উঠ্‌তে দিও না। জানি কি, আবার যদি মাথাটাথা ঘুরে যায়—মুস্কিল হ'বে। বরং ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে খানিক শুইয়ে দাও, সুস্থ হ'ক—তার পর আমরা বাড়ী রেখে আসব।

নির্ম্মলও ঐ ধরণের একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিলাম—তুমি শচীর সঙ্গে ওদের বাড়ী যাও নির্ম্মল!

নির্ম্মল অবাক্ হইয়া একমুহূর্ত্ত চাহিয়া বলিয়া উঠিল—তবে আহ্লাদকে যেতে দিলে কেন? সেই এনেছিল, সেই নিয়ে যেত!

কথা কাটাকাটি করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। বিশেষতঃ আমার সংসারের কর্ত্রীত্বের ভার যখন আমার প'রে ন্যস্ত ছিল, তখন কাহারো কাছে কৈফিয়ৎ দিয়া কোন কাজ করানো আমি পছন্দ করিতাম না,—সেটাকে কর্ত্রীত্বের অভিমান বলা চলে না; তবে আমি যে নিরভিমানিনী—সে কথাও বলিতে চাহি না। তবে আমার ভাই বা পুত্র—ইহারা চিরদিনই আমার আদেশ অম্লানমুখে নীরবে পালন ক'রত বলিয়াই বোধ করি আমার অভ্যাসটা ঐরূপ হইয়া গিয়াছিল।

দুই মিনিট পরে প্রসাদের পানে চাহিয়া দেখি, সে অনেক দূরে দাঁড়াইয়া শচীরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে! বুঝিলাম, প্রসাদ অনেক দিন শচীকে দেখে নাই, তাই আজ তাহাকে এতবড়টী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেছে।

প্রসাদ ইদানীং বাড়ী আসিত রাত্রে, আবার চলিয়াও যাইত—রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে! কলকাতায় তাহার কি-যে এত কাজ, সেই জানিত! আমরা কিছু জানিতে চাহিলে, এত বড় বড় ফর্দ্দ আবৃত্তি করিত যে, আমরা না জিজ্ঞাসা করিয়াই সুস্থ থাকিতাম।

প্রসাদকে জিজ্ঞাসিলাম– তুই শচীকে অনেক দিন দেখিস্ নিরে ?

না মা, অনেক দিন দেখি নি। শচী বেশ্‌টা হ'য়েছে।

শচী মাথা নত করিয়া লইল ; প্রশংসা শুনিয়া কাণ দু'টি তাহার লজ্জা পাইল। শচীর ঈষৎ আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলাম—শচী কি প্রসাদকে চিন্তে পারছিস্ নে ?

শচী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—চিনি, পিসিমা!

বলিলাম, প্রসাদ, তুমি শচীর সঙ্গে ওদের বাড়ী যাও। আজ তোমাকে সেখানেই থাকতে হ'বে হয় ত! আহ্লাদ ওদের বাড়ীতে বরাবরই রাত্রে শুত, আজ তাকে বরালে না কোথায় যেতে হ'বে বলে'—শচীর মা আমাকে খবর পাঠিয়েছেন।

এখনই যাব মা ?

তোর যে খাওয়া হল না রে!...তা হোক, যাও শচীর মা'র কাছেই খাবে'খন।

প্রসাদ ও শচী এক সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিল। 'তুমি একটু দাঁড়াও শচি', বলিয়া প্রসাদ রান্নাঘরের দিকে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যে একগাছা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিল—এস!

প্রসাদের বীর-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অন্তর ভরিয়া গেল ; হাসিয়া বলিলাম—বেশ।

নির্ম্মল অনুতপ্তের মত স্বরে বলিল—আমি কি যেতুম না, দিদি ?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে খানিকটা ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া বলিলাম—তোমার যে এখানে কাজ রয়েছে ভাই ! গয়লা-বৌকে রেখে আস্‌তে হ'বে ত তোমাকেই !—এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলাম—আর ত আমি কারু সঙ্গেই ওকে পাঠাতে পারব না ।

হরে এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিল, আমার কথা শেষ হইতেই বলিল—আমার ভারি দোষ কি-না ! আমি ভালো মানুষের ছেলে, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তবু ছোট বাবু রাস্তায় আমার ঘাড়েই ঘুঁষী মেরে বল্লেন, তুই হারামজাদ, যত নষ্টের গুরু ! ওনারা হ'ল জমিদারের তাঁবেদার, ওঁদের আর কি বল্‌বে, যত রোখ এই গরীব হরের ওপর ।—বলিয়া মিট্‌ মিট্‌ করিয়া নির্ম্মলের পানে চাহিতে লাগিল ।

নির্ম্মল কি কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেই, বলিলাম—নির্ম্মল, এর প্রতিকার করতে পারবে ?

কেন পারব না দিদি, খুব পারব । তুমি শুধু অনুমতি দাও, তুমি শুধু বল, দেখ, আমরা মামা ভাগ্নেয় কি না করতে পারি ! সে চুপ করিল, আবার তখনি স্বর ঈষৎ নামাইয়া কহিল—কিন্তু গয়লা বৌএর কথায় আর আমরা নেই দিদি ।

জিজ্ঞাসিলাম—গয়লা বৌ-এর অপরাধ কি নির্ম্মল ?

নির্ম্মল আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল । তাহার বক্তব্য বুঝিয়া ছিলাম ; কিন্তু সেই চাপাপড়া কথাটাকে আর জাগাইয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইতেছিল না । মৃদুস্বরে বলিলাম - নির্ম্মল, ছোট খুড়োর কথা বিশ্বাস করা আর পৃথিবীটাকেই মিথ্যে ভাবা এক কথা !...তবুও নির্ম্মলকে

হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, বলিলাম, আমি বল্‌ছি তোমাকে, গয়লা বৌ নিষ্পাপ !

গয়লা বৌ হঠাৎ আমার পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—পিসিমা, ওনারা সব মিথ্যে বলেছে।

নির্ম্মল গর্জ্জিয়া উঠিল—মিথ্যে বলেছে! তখন—তুমি চুপ করে রইলে কেন !

মনে মনে নির্ম্মলের প্রতি বিরক্ত হইলেও মুখে বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না ; গয়লা বৌ কি উত্তর দেয়, সেটা শুনিবার আগ্রহও বড় অল্প ছিল না। নীরবে গয়লা বৌএর দিকে চাহিয়া রহিলাম। শুনিলাম,—পিসিমা, ওনাদের সামনে আমি কি কথা বল্‌ব ? ওঁরা কি সেই লোক !.. ...

ওঁরা যাই হোন্ তুমি কেন বল্‌লে না মা ?

গয়লা বৌকে ইতঃস্ততঃ করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম—তুমি কেন পাপ কথা গোপন করতে গেলে মা ! ওঁরা যাই হোন্, বতই ক্ষমতা ওঁদের থাক, পাপী ত ! পাপীকে ভয় কিসের মা ? তুমি নিজে যখন ধর্ম্ম পথে আছ, তখন যে তুমি যমরাজেরও সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পার !

গয়লা বৌ-এর পাতলা ঠোঁট দু'খানা নড়িয়া উঠিল ; বার দুই ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া সেই যে মাথা নমিত করিয়া লইল, পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেল, আর সে মাথা তুলিল না। মনে মনে কত আশাই না করিতেছিলাম, কতবার আকুল আগ্রহে তাহার বুকের কথাগুলিকে বাহির করিয়া আনিবার ব্যর্থ প্রয়াসে তাহার মুখের পানে চাহিলাম, কিন্তু একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া ত দূরের কথা, ক্রমে তাহার মুখখানিও আর দেখিতে

পাইলাম না। কেবল সেই সরু সরু শ্যামবর্ণ হাতের মণিবন্ধ বেষ্টন করিয়া যে কয়গাছি লাল চুড়ীর পলগুলা আলোয় পড়িয়া চিক্‌চিক্‌ করিতেছিল, নিঃশব্দে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ পরে বলিলাম—নির্ম্মল, গয়লা বৌ কে বাড়ী রেখে এস।—হরে অদূরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে আমাদেরই কার্য্য কলাপ দেখিতেছিল, বলিলাম, আলো নিয়ে মামা বাবুর সঙ্গে যেতে হবে।

হরে বিড় বিড় করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই, বিনা কারণে যখন তাহারই ঘাড়ে দোষ পড়ে, তখন আবার তাহার হাতে আলো দিয়া পাঠানোর কি এমন দরকার আছে?

নির্ম্মলের সবল হৃদয় মন কোন দিনই ভয়কে সমীহ সম্মান করিতে জানিত না। সে অনুচ্চ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—ও ব্যাটার দরকার নেই বাবার! গয়লা বৌ, উঠে এস।

গয়লা বৌ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিল; কি ভাবিয়া আর একবার বসিয়া পড়িয়া আমার পায়ের কাছে মাথা নামাইল,—মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম—এস মা! আর, কাল সকালে একবার এস।

নির্ম্মল আলোটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল,—দ্বারের কাছে আসিয়া যতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে আলোকটাকে দেখা গেল, নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যখন নিজের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন নির্ম্মলের ঘরের ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল।

শরীর অত্যন্ত অবসন্ন থাকিলেও শয়নের ইচ্ছা হইল না। অন্ধকার আকাশ ভেদ করিয়া যাহারা নির্নিমেষ নেত্রে ধরার পানে অগণিত দৃষ্টি বিস্তার করিয়া নিশা জাগিতেছিল, তাহাদেরই দিকে চাহিয়া রোয়াকে বসিয়া

ভাবিতেছিলাম—গয়লা বৌএর কি বলিবার ছিল? কেনই বা না বলিয়া অমন চুপ করিয়া গেল! নির্ম্মল ছিল বলিয়াই কি অভাগীর মুখ খুলিল না। কিন্তু নির্ম্মলের জানাটা যে কত দরকার, তাহা ত আমি জানিতাম; তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও নির্ম্মলকে সরিতে বলিতে পারি নাই। উহারাই ত আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা, নতুবা আমার কি আছে? দীনা, দুর্ব্বলা নারী আমি! উহাদের মুখ চাহিয়াই যে আমার বুক দশহাত হইয়া উঠে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রসাদ অতি প্রত্যূষে লাঠি হাতে ছুটিতে ছুটিতে গৃহাঙ্গনে আসিয়া ডাকিল—মা !

উপবাস ক্লিষ্ট মস্তকটি উপাধান হইতে না তুলিয়াই বলিলাম—ঘরে আয়।—বলিয়াই ক্লান্ত নেত্র দুটি মেলিয়া পুত্রের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছি,—রণভঙ্গে আহত সৈনিকের মত প্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল,—মা, রাস্তায় হৈ চৈ হ'চ্ছে—গয়লা বৌ-কে পাওয়া যাচ্ছে না।

এত যে অবসাদ, ক্লান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল, তীর্য্যক গতিতে উঠিয়া বসিয়া ডাকিলাম,—নির্ম্মল !

মামা পথে বেড়াচ্ছিল মা, আমার কথা শুনেই ছুটেছে ! গয়লা পাড়ায় বিষম ঘোঁট্ হ'চ্ছে মা !

কি-যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না ! শ্রান্ত দেহও যেন আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া মস্তিষ্কের কার্য্য আরো গুরুতর করিতেছিল। শুনিতে পাইলাম, ছোট খুড়ো ডাকিতেছেন—সত্য ! সত্য !

প্রসাদ আমার দিকে চাহিয়াই হাতের প্রকাণ্ড লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বলিলাম—আমি দেখ্‌ছি, তুমি বরং ওদিকে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ফেল।

বাহিরে আসিতেই দেখি, ছোট খুড়ো মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত রুদ্রমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। তাঁহার ঠিক পশ্চাতে একটি দিব্যকান্তি কিশোর মূর্ত্তি দেখিলাম

বটে, চিনিতে পারিলাম না। মাথার কাপড়টা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম—উঠে আসুন, কাকা!

কাকা বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—তোমার ভাই কোথা সত্য?

জানি না—বলায় ছোট খুড়ো মহাশয় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—এই বলে যাই সত্য, পার ভাইকে ঠাণ্ডা রাখতে, রাখ, নইলে একটা কাণ্ড ঘটলে আমায় দূষো না।

কি হ'য়েছে কাকা?—স্বরটা ভয়ার্ত্তেরই।

যা হ'বার নয়। বারোয়ারী তলায় দাঁড়িয়ে ছোকরা যা তা বলে জমিদারকে অপমান করে আসে—এত বড় বুকের পাটা? ভাগ্যে জমিদারের লোকজন কেউ ছিল না, নইলে আজ···

বাধা দিয়া বলিলাম—অমন জমিদারকে শুধু অপমান করেই নির্ম্মল নিশ্চিন্ত হ'ল। সে যদি আজ জমিদারের মুণ্ডুটা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসত, দিয়ে ফাঁসীও যেত, আমি অসুখী হোতাম না।

ছোট খুড়ো মহাশয় বিস্মিতস্বরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—ওঃ! তাই! তবে তুমিও আছ এর মধ্যে?

আছি। হাজারবার আছি। যে জমিদার দুর্ব্বল নারীর উপর অত্যাচার করে, সে জমিদারের...

আস্তে আস্তে কে আমার কাণের কাছে বলিল—ঐ ত জমিদার পিসিমা, আমাদের বাড়ীর কাছে ঘুরে বেড়ায়—

ফিরিয়া দেখিলাম—শচী!—সে দৃষ্টি সঙ্কেতে সেই নধর দেহ কিশোরকেই দেখাইয়া দিল।

চক্ষু তুলিতেই দেখি, অল্প-বয়স্ক যুবক একদৃষ্টে এদিকেই চাহিয়া আছে!

কি সে সুন্দর চক্ষু দু'টি, আর কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ সুন্দর সেই করুণ মুখখানি! ওটার দিকে ফিরিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, খুড়ো মহাশয় ডাকলেন—সত্য! মেয়ে মানুষের প্রতাপ বাড়লে কি হয় জান?— পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়! স্ত্রীলোকই জগতের ধ্বংসের কারণ—এ কথা শাস্ত্রে আছে।

৩

লেখিকা—শ্রীসরসীবালা বসু

শাস্ত্রে আছে ?—বজ্রনাদে কথা কয়টি বলিয়া নির্ম্মল একেবারে উন্মত্তের মত উঠানে আসিয়া দুই চক্ষু পাকাইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার শাস্ত্রের নিকুচি করেছে, বুড়ো শয়তান ! সে বামহস্তে ছোট খুড়োর গলাটা টিপিয়া ধরিয়া অগ্নিতেজে বলিল—আমি পালিয়েছি গয়লা বৌ-কে নিয়ে ! আমি ?—আমার নামে ..

নির্ম্মল, সরে এস।

ছোট খুড়োর জিভ্ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি অতি কষ্টে করুণনেত্রে বার বার আমারই পানে চাহিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। জমিদার পুত্র নীরবে দাঁড়াইয়া বোধ করি নির্ম্মলের দুঃসাহসিক কাণ্ডই প্রত্যক্ষ করিতেছিল, আমার কথা শেষ হইতেই সে নির্ম্মলের প্রসারিত হস্তের উপর তাহার সবল হাতখানি চাপাইয়া বলিল—ছাড়ুন।

না, ছাড়ব না। তাহার চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল।—ছাড়ব না, কখন ছাড়ব না। আমার নামে বদনাম দেওয়া, এত বড় স্পর্দ্ধা !

জমিদার পুত্র জোরে ঝাঁকানি দিতেই নির্ম্মলের হস্ত ছোটখুড়োর স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়িল। যাহা আশা করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ! ছোট খুড়ো

ছাড়া পাইয়া বত্রিশ লাফ্ মারিলেন; কোঁচার খুঁটটাকে পাকাইয়া পশ্চাদ্দিকে গুঁজিয়া, প্রবলস্বরে কহিলেন—এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার গায়ে হাত...

নির্ম্মল বলিল—হ'য়েছে কি তোমার এখুনি! আমার নামে বদনাম, চেন না তুমি আমাকে! ভালোয় ভালোয় গয়লা-বৌ কোথায় বলে দাও—তুমি আর তোমার জমিদার দু'জনে মিলে তাকে কোথায় সরিয়েছ! গয়লাপাড়াশুদ্ধ লোককে আমি বলে এসেছি, তোমাদের কথা, সব জাহির হ'য়ে গেছে এতক্ষণে! নিজেরা করে' আবার আমার নামে বদনাম!

জমিদার পুত্র শান্তস্বরে বলিল—বদনাম নয়,—আপনার সঙ্গে তা'কে রাত্রে যেতে লোক দেখেছে।

নির্ম্মল এক মুহূর্ত্ত বক্তার পানে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই অবসরে জমিদারপুত্রকে সম্বোধন করিয়া আমিই বলিয়া উঠিলাম—নির্ম্মলকে আমি পাঠিয়েছিলাম, তাকে বাড়ী রেখে আস্তে!

আমার কথাও শেষ হইয়াছে, একদল লোক হৈ চৈ করিতে করিতে অঙ্গনে ঢুকিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—এই যে বেটা বদমাস্! মার শালাকে ...

তাহাদের উদ্যত মিলিত বাহুর দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিলাম—ইহারা গয়লাপাড়ার লোক এবং জাতিতেও গয়লা! নির্ম্মলের মাথার উপর বাঁক তুলিয়া যখন তাহারা সমস্বরে এক অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় অগ্রসর হইতেছিল, আমি ঘরের দিকে ফিরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলাম—প্রসাদ! প্রসাদ! —নিমেষে মধ্যে কি-যে ঘটিত বলা যায় না, চক্ষু চাহিতেই দেখি, গৌয়ার-

গোবিন্দ লোকগুলার হাতের বাঁক শূন্যে স্থির হইয়া গেছে! তাহাদের এবং নির্ম্মলের মধ্যে দুই বাহু বিস্তার করিয়া স্বয়ং সেই সুকুমার জমিদার পুত্র দাঁড়াইয়া।

নির্ম্মল যে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তরের প্রবল জ্বালায় তাহার বাহ্যিকজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, তাহা আমি তাহার মুখ দেখিয়াই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম।

গয়লাদের সম্বোধন করিয়া জমিদার পুত্র বলিল—বেরিয়ে এস। ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে, ভদ্রমহিলার সামনে লাঠি তোলে না, বেরিয়ে এস...

দু'একটা লোক অসন্তোষভরে কি-একটা কথা বলিতে গেল, জমিদার-পুত্র গম্ভীরস্বরে ডাকিল—রাখাল!

সব-চেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তি উত্তর দিল—হুজুর!

জমিদারপুত্র নিঃশব্দে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বার নির্দ্দেশ করিলেন। লোকটা-ও নিঃশব্দে অনুচরদের লইয়া বাহির হইয়া গেল। সে যেন একটা যাদুমন্ত্র প্রভাবে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গৃহ-প্রবেশকালে যাহারা বীরপদভরে মেদিনী কম্পান্বিত করিয়া ঢুকিয়াছিল, তাহাদেরই এমন নিঃশব্দে ও শান্তভাবে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া শচী বালিকা-সুলভ আবেগভরে বলিয়া উঠিল—কি গোঁয়ার গোবিন্দ লোক মা!—না পিসিমা?

ছোট খুড়ো ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন—তাড়ালে কেন কমল? বাছাধন একটু টের পেতেন, মজাটা কেমন হয়?

প্রসাদ যে কখন্ আসিয়া রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, দেখি

নাই। তাহার কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখি—হাতে সেই লাঠি গাছি। মল্ল-যোদ্ধার বেশে কাঁপড় আঁটিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। বলিল—মজা উনি দেখ্‌তেন না, ঠাকুর্দ্দা, মজা আপনাকেই দেখ্‌তে হো'ত! কিন্তু যাক্‌ সে কথা। গয়লা বৌ কোথা? ঠাকুর্দ্দা, এর জন্যে যদি আপনাকে মেরে আমাদের জেল ও খাট্‌তে হয়, তা'তেও আমরা পেছপাও হ'ব না...রাগে তাহার প্রশস্ত বুকখানা কাঁপিতেছিল।

আর কেন—ভাই!—বলিয়া জমিদারপুত্র কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একেবারে ভূতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল—মা! এর সবটাই ভুল হ'য়ে গেছে! দোষ আমাদেরই—মাপ করুন মা!

এই নৃশংস হৃদয়হীন জমিদার পুত্রের বিরুদ্ধে কয়দিন ধরিয়াই আমার হৃদয় মন উত্তেজিত হইয়া ছিল, সেই-যে আমাদের এই পল্লীটিতে হঠাৎ এক কুগ্রহের মত আসিয়া পড়িয়া, ছোট খুড়োর সহযোগে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে জানিয়াই আমি ইহার মৃত্যু-কামনা করিতেও বুঝি দ্বিধা করি নাই, কিন্তু তাহার এই করুণস্বরে, ততোঽধিক তাহার করুণ দৃষ্টিতে আমি আত্মহারা বিহ্বলের মত 'থ' হইয়া গেলাম। তন্মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল—তাহার মা নাই। শৈশবে সে মাতৃহীন। নাম শুনিলাম, কমল। তাহার কমলের মত নয়নদ্বয় তুলিয়া আমার মুখের পরে স্থির করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল—মা, গয়লা-বৌর খবর আমি জানি-নে, মা!

নির্ম্মল গর্জ্জিয়া বলিল—কে তুমি?

যুবক নির্ম্মলের কথার কোন উত্তর না দিয়া, আমার পায়ের উপর হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মা!

বাছারে!—বলিয়া দু'হাতে তাহাকে তুলিয়া চুম্বন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রসাদ বলিতেছে

সারা সকালটা মেঘ করিয়া আছে, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িবার নাম নাই। বাতাস যে উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তা কে জানে! অসহ্য গুমোট গ্রীষ্মে প্রাণটা আই ঢাই করিতেছে, গত রাত্রের সেই হৈ চৈ ব্যাপার—সকালে আর এক পালা হইয়া গিয়াছে, যাতে না ছিল করুণ রস, না ছিল হাস্য রস, বীররস যা ছিল সেটা বীভৎসেরই নামান্তর। সুতরাং ঐ সবের গোলেমালে মনটা মোটেই ভাল ছিল না। দুপুরবেলা ভাত খাইয়া বিছানায় পড়িয়া হাতপাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু চোখ বুজিবার চেষ্টা করিতেছি, হঠাৎ কোথা হইতে সারা সকালের উধাও হাওয়া দমকা বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখি ঝড় উঠিয়াছে, দুম দাম্ ঝন ঝন শব্দে এদিকে সেদিকে অনেকগুলা জিনিষ পড়িল, অতঃপর দারোজা জানালা বন্ধ করার ধুম,—মা আসিয়া কহিলেন "ওরে প্রসাদ, নির্ম্মল কোথা গেল? হাঁ করে জানালা খুলে বসে আছিস—ঘরে ধূলো ঢুকচে দেখছিস্ কি? বন্ধ করে দে না।"

আমি কহিলাম—প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল মা,—একটু হাওয়া আস্‌ছে, আস্‌তে দাও।

তা বলে ঝড়ের হাওয়ায় ধূলো এসে নাকে চোখে ঢুকবে, সে ভাল?

বলিয়া মা নিজেই জানালা বন্ধ করিতে গেলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম "বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েচে, বন্ধ করো না মা, বন্ধ করো না।

মা হাসিয়া কহিলেন—বৃষ্টিই বোধ হয় তুই মানছিলি ?

বাহির হইতে ডাক আসিল "মা !"

মা শশব্যস্তে বাহির হইয়া গেলেন। আগন্তুককে চক্ষে না দেখিলেও চিনিতে আমার বিলম্ব হইল না, এবং তার আগমনে বড় খুসী হইতে পারিলাম না। বরং ভয় হইতে লাগিল, পাছে মা তাঁহার নব লব্ধ সন্তানটিকে এই ঘরেই লইয়া বসেন। সৌভাগ্য আমার যে, মা ঘরে আসিলেন না,—বারান্দাতেই সতরঞ্চ পাতিবার জন্য ঝিকে হাঁক দিলেন।

ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল। আমি প্রসন্ন মনে সেই দিকে চোখ দিয়াইলাম। কতদিনকার কত উত্তাপ পলে পলে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা ঝরিয়া পড়িতেছে। উত্তাপের চরম সীমায় পৌছিয়া আজ তা শীতল বাদল ধারায় পরিণত হইয়া পৃথিবীর তপ্ত বক্ষে শান্তি সুধার ধারাবর্ষণ করিতেছে। সৃষ্টির এ কি বিচিত্র রহস্য ! জগতের ইতিহাসে, মানবের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ইতিহাসেও ইহার লীলা চলিতেছে ! বয়সে কম হইলেও নেতাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছিলাম, সুতরাং ভাবনাটাকে খানিকটা আগাইয়া লইয়া চলিলাম। কিন্তু সে অগ্রসর হওয়াতে যে-সব দিকে চিন্তার গতি চলিতে চাহিল, তাহা আমার ন্যায় পরাধীন জাতির বালকের পক্ষে অনুচিত,—এমন কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য। অথচ এই, আমাদেরই দেশে বার বৎসরের বালক বীর বিক্রমে শত শত শত্রুর মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে; তের বৎসরের বালক বিপুল সাম্রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ রাজদণ্ড হাতে লইয়া

বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু থাক্ সে কথা,—অতীত এখন অতীতেরই গর্ভে,—তার ছায়া অপেক্ষা বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিই বেশী পরিস্ফুট এবং সেইটাই হইতেছে সত্যস্বরূপ। সবলে মনের গতি ফিরাইয়া তাহাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলাম। বাতাসের খেলা পাগল বালকের মত নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল। শাখা প্রশাখা দুলাইয়া গাছগুলি যেন মনের আনন্দে স্নানপর্ব্ব জুড়িয়াছে। পাখীগুলি সেই পত্র-রাশিবহুল শাখা প্রশাখার মধ্যে বসিয়া স্থিরভাবে বৃষ্টিপাত দেখিতেছে। যাহাদের নীড় আছে, তাহারা নীড়ের মধ্যে আশ্রয় লইয়া মুখটি বাহির করিয়া আছে। বাগ্দীদের রামা আর গয়লা পাড়ার কৈলাস ছাঁকাজাল লইয়া আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তার নালাতে মাছ ধরিতে সুরু করিয়া দিল। মাথার উপর অজস্র বৃষ্টির ধারা,—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। নালার জল পুকুরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতে উজানের মুখে পুকুরের বড় বড় কই মাগুর এখনি উঠিয়া আসিয়া জালে আটকাইবে—সেই আশার আনন্দেই তাহারা এখন মসগুল। পিছন হইতে মার কণ্ঠ শুনিলাম—

"হাঁ করে কি দেখিস্ প্রসাদ, ছেলেটি এসে বসে আছে, দুটো কথা কইবি চল্।"

আমি মুখ ফিরাইয়া মার মুখের দিকে চাহিলাম। যে জমিদার পুত্রের নামে মার মুখের বিরক্তি আর ঘৃণার ভাব তীব্র ভাবে ফুটিয়া উঠিত, আজ তাহার চিহ্ন কোথায় উধাও হইয়া, সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মাতৃত্বের অপরূপ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ! সে মুখে তারই বিজয় পতাকা উড়াইয়া বিরাজ করিতেছে। মাকে আমি খুব জানি। প্রাণ ভরিয়া 'মা' নাম উচ্চারণ করিয়া নির্ভয়ে যে তাঁহার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সেই জিতিয়া যাইবে।

হোক্ না সে অপরাধী,—মার সরলতাকে জয় করিয়া লইতে তার একটুও বিলম্ব হইবে না, অবশ্য অপরাধটাকে সাধুতার আবরণে ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইতে হইবে। বেশ বুঝিলাম, জমিদার পুত্র মার মনে তার আসন বিছাইয়া লইয়াছে। কি জানি কেন, মন আমার খুসী হইয়া উঠিল না। কহিলাম, "তুমি তো বেশ গল্প কচ্ছ মা, কর-গে-না, আমাকে আর কেন, আমি একা একা বসে একটু বৃষ্টি পড়া দেখ্‌চি, দেখি না—"

"অদ্ভুত ছেলে" বলিয়া হাসি মুখে মা চলিয়া গেলেন। বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল, ক্রমে থামিয়া গেল। বারান্দায় বিদায় অভিনন্দনেব পালা চলিতেছে, শুনিতে পাইলাম। মা বলিতেছেন,—"একটু মিষ্টি মুখ করে যাও বাবা, মার কাছে এসে কি শুধু মুখে যেতে হয়?"

খুব সম্ভবতঃ সকাল বেলায় ইহারই মরণ কামনা করার স্মৃতিতে মার মন করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল; তাই তাঁর কণ্ঠস্বরে মমতা ঝরিয়া পড়িতেছিল। কমল উত্তর দিল "সন্ধ্যের পর এসে খেলে হবে না মা? আমি নিশ্চয় আস্‌ব; দেখ্‌বেন, পেট ভরে খেয়ে যাব। এখন আসি, ওদিকে একটু চোখ রাখ্‌তে হবে, বুঝতে পাচ্ছেন তো?"

"তাই এসো বাবা—"

কমলের জুতাব শব্দে বুঝিলাম সে চলিয়া গেল, মা আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আমি কহিলাম—"নতুন ছেলের সঙ্গে এতক্ষণ কিসের গল্প চলছিল মা?"

মা কহিলেন "নতুন ছেলের হিংসেতে তুই তো ঘর থেকেই বেরুলি না,—বেরুলেই তো সব কথা শুনতে পেতিস্।"

"না হয় তোমারই মুখে শুন্‌লাম। তাতে আর দোষ কি মা?"

মা সে কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন—

"নির্ম্মল কোথা, সেই যে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েচে, আর দেখা নেই—"

"কি-জানি!" বলিয়াই আমি মায়ের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। তাঁর চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ সহজ মুখ,—অনেক দিনের ঘোলাটে আকাশের পরে সূর্য্যবিকাশের মতই সৌম্য উজ্জ্বল বোধ হইতেছিল। মায়ের মুখের উদ্বেগ চিহ্ন সকল যে কেন হঠাৎ লোপ পাইল, কি সে তাঁহার মনের সমস্ত গ্লানি বিদূরিত হইয়া আবার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না। মা কমলকে পুত্রাধিক স্নেহে পুত্রের মতই টানিয়া লইয়াছেন। তাহাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ বা হিংসা নাই। মা যাহাকে পুত্র স্নেহে সাদরে বক্ষে ধরিয়াছেন, তাহার প্রতি ভায়ের স্নেহ দিতে না পারিলেও, তাহার মর্য্যাদা হানি যে আমার দ্বারা ঘটিবে না, তাহা আমি জানিতাম। এবং কমলকে আপনার করিবার একটা অক্লান্ত চেষ্টা যে আমাদের পরিবারটির মধ্যে তীব্র বেগে চলিতেছে, তাহা জানিতাম বলিয়াই আমি নিজেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি নাই।

আমার সঙ্গে কাল রাত্রে ইহা লইয়া অনেকক্ষণ তর্ক চলিয়াছিল। মামা আমার মায়ের পক্ষ লইয়াই লড়িতেছিলেন। আমিও যে খুব বিরুদ্ধতা করিয়াছি তা নয়। তবে ইহা আমার মোটা বুদ্ধিতে কিছুতেই ঢুকিল না যে, একা ঠাকুর্দ্দা মহাশয় এত ক্ষমতা ধরেন কিসে? মামা না-কি কমলের মুখেই শুনিয়াছে, ছোট খুড়ো কয়দিন হইতে আমাদের পুরোহিত পত্নীর গৃহের পাশে পাশে কমলের হাত ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন! কমলের দোষ নাই! কমল ঘুরিল কেন? সে না কি বলিয়াছে, ভাল মন্দ সে কিছুই জানে না,

ছোট খুড়ো তাহার অভিভাবক স্বরূপ, তাঁহার নির্দ্দেশ মত সে সব কাজই করিয়াছে !—মা, মামা উভয়েই কথাটা বিশ্বাস করিয়াছেন। এতই গাঢ় সেই বিশ্বাস যে আমার সকল তর্কই পরাজয় মানিয়াছে।

মানুক পরাজয়! এ আমি বিশ্বাস করি না। করিতে পারি না। কমল শিশু নয়, কমল যুবক, কমল কিছু-কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে, শুনিয়াছি। সে বুঝিল না, কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়? ঠাকুর্দ্দা ঘুরাইলেন, সেও ঘুরিল…!…মা বলিতেছেন, ছোট খুড়ো জমিদারের নাম লইয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন! কিন্তু ·…

মা অন্য-মনে মালা জপিতেছিলেন,হঠাৎ মালাটা মুষ্টি মুক্ত করিয়া দু'হাতে কপালে ঠেকাইয়া, মনেমনে কি মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ কহিলেন নির্ম্মল— এলে বাঁচি যে!

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা গেছে মামা জান, তুমি?

গেছে ত!—মা কি-যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখিলাম, এই সুযোগ। বলিলাম—ক'দিনই মামা এই রকম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ্‌ছি—কাল নদীর ধারে দেখলাম জমিদারের সঙ্গে…

তারা গয়লা বৌ এর সন্ধান করছে।

আমার হাসি পাইল—বলিলাম—নদীর জলে! তা হ'বে!

দেখি, মা'র মুখ আমার এই ব্যঙ্গ হাসির প্রভাবে একেবারে শ্বেত ও শুষ্ক হইয়া গেছে। অত্যন্ত বেদনা বোধ হইল, বলিলাম—

গয়লা বউএরই সন্ধান করছে, কিন্তু কোথায় পাবে মা, সন্ধান?…মা, দিনে দিনে যা হ'য়ে উঠ্‌চে, তাতে আর এখানে একদণ্ডই থাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। চল মা, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।"

মার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "এই কি তোর দেশ-হিতব্রত সাধনের পরিচয় প্রসাদ? বাড়ীতে আবর্জ্জনা জমেচে বলে তুই যদি বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও থাকিস্, সে তো তোর সুবুদ্ধির পরিচয় নয়! সেই আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে তোদের পরিষ্কার করতে হবে, আর তাই হচ্ছে তোদের কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালন করাতে বাহাদুরী নেই বাছা, না করাতে মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় বটে।

মনে পড়িয়া গেল সোমবারের সন্ধ্যাবেলার ঘটনা,—পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশের হাতে মার খাইয়া যেদিন বিপন্ন হইয়াছিলাম। সুপ্রকাশ কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, মটর থামাইয়া পুলিশের সহিত বকাবকি করিয়া তাহাদের গ্রাস হইতে আমায় মুক্ত করিয়া, মটরে তুলিয়া তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাহার সহিত আমার এক স্কুল কলেজে পড়ার দরুণ মুখ চেনাচিনি ছিল মাত্র।

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ মোটেই হয় নাই। সে পড়িত ফার্ষ্ট ইয়ারে, আমি পড়িতাম ফার্ষ্ট ক্লাসে। আমি ছিলাম গ্রাম্য গৃহস্থ সন্তান, সে ছিল বিলাসে লালিত সহরের সুসভ্য ধনীর দুলাল। সুতরাং আমাদের প্রভেদও ছিল আসমান জমীন্। যাহা হউক, সেদিনকার আমার শোচনীয় নিগ্রহের জন্য সুপ্রকাশের জননী ও পিতামাতা সহানুভূতি দেখাইয়া উপদেশচ্ছলে যে সুপরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে সেদিন আমি মার উচ্চারিত ঠিক ঐ কয়টি কথাই আবৃত্তি করিয়াছিলাম। আর সেই আমিই এখন কি বলিয়া ফেলিলাম।

মার কথায় যে আমি লজ্জিত হইয়াছি, মা তাহা বুঝিতে পারিয়া, স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "গয়লা বউকে ছোট কাকার লোকেরাই সরিয়ে, রেখেছে

সেই খবরই কমল বলতে এসেছিল। ওকে ছোট কাকা না জানালেও ও তা টের পেয়েচে। ছেলেটিকে যত মন্দ ভেবেছিলাম তা মোটেই না। ওর ভিতরে অনেক গুণ আছে, কুসংসর্গ আর কুপরামর্শতেই গোল্লায় যাবার পথ ধরেছিল। মাথার ওপর কেউ অভিভাবক নেই, হাতে অগাধ পয়সা, ক্ষমতাও অসীম! কাঁচা বুদ্ধি, কাজেই বেগ্‌ড়ানো আর শক্ত কি! কিন্তু চেষ্টা করলেই ওকে ও পথ থেকে ফেরানো যায়,—আহা বেচারীর মা-ও নেই।" মার এই মন্তব্য, এবং মাতৃহীনের প্রতি সস্নেহ করুণ অনুভূতির উত্তরে আমি কোন মতই প্রকাশ করিলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন, "তোর কপালের পাশে কিসের কালশিরে পড়ে রে প্রসাদ? ও কি— পিঠেও দু তিন জায়গায় দাগ দেখ্‌চি, ব্যাপার কি রে?"—অন্ধকারে বাড়ী আসি, প্রত্যূষেই গৃহত্যাগ করি, সুতরাং আমার নির্য্যাতন কাহিনী ঐ অন্ধকারের অন্তরালে সহজেই আত্মগোপন করিয়াছিল। আজ সকালে কলিকাতা যাওয়া ঘটে নাই—সুযোগ হইয়া উঠে নাই। কালশিরা গুলা যে এমন করিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া আছে, সে কথা স্মরণও ছিল না। নহিলে বা একটু সাবধান হইতাম। যাহা হউক, মার ভয়-ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "ও কিছু না মা, একদিন চোট লেগেছিল—তারই দাগ।"

"নিশ্চয় কোন দিন মারপিট হয়েছিল, সত্যি ক'রে বল দেখি প্রসাদ,— ব্যাপার কি? তুই তো সারা দিন উধাও থাকিস্, রাত্তিরেই যা তোর বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক। সারাদিন কোথায় থাকিস্, কি করিস্, জিজ্ঞেস করলে যা বলিস্, তার একবর্ণও বুঝি না।"

বেশ বুঝিলাম, আর কোন কথা লুকান চলে না। মা ব্যথা পাইবেন,

চিন্তিত হইবেন, সেই ভয়েই পুলিশের নির্য্যাতন কাহিনী প্রকাশ করি নাই। কিন্তু সেদিনকার ঘটনা হইতে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হয় তো আমার কারাবাসও হইতে পারে! সুপ্রকাশের পিতা স্বনাম খ্যাত একজন এটর্ণী। তাঁহার পরিবারে আমার পরিচয় হওয়ায়, তাঁহারা আমায় স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা সাহেবী ধরণের লোক, তাহা হইলেও আমার উপর তাঁহাদের খুব অনুগ্রহ। আমায় বাঁচাইবার জন্য সুপ্রকাশের পিতা অবিনাশ বাবু তাঁহার এটর্ণী বুদ্ধিতে আমার জন্য যে জবানবন্দীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া আমায় শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমি রাজী হই নাই। আমি স্পষ্টই বলিয়াছি, যে, আত্ম পক্ষ সমর্থন আমি করিব না। ইহাতে যে দণ্ডই আমি পাই, তাহাই লইতে প্রস্তুত!—যাক্ সে কথা, এখন তাহা হইলে মাকে সব কথাই আগা গোড়া খুলিয়া বলিতে হয়। মুহূর্ত্তের জন্য মাথা তুলিয়া মার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, মার চক্ষে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাতে তিনি ব্যগ্রতাভরেই পুত্রের অন্তরের অন্ধকারতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত। বেশ বুঝিলাম, অতঃপর সে কাহিনীর প্রকাশই মঙ্গল! বুঝিয়া তখন সব কথা বলিবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছি—ঠিক সেই সময়ে মামা লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, গয়লা বৌ কে পাওয়া গেছে!

মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কোথায় রে?

কালীদ'র বাগান-বাড়ীতে, দিদি!

কালীদ'র বাগান-বাড়ী? সে ত জমিদারের বাগান রে?—মা ধীরে ধীরে অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন।

মামা বলিল—জমিদারের বাগান বটে, কিন্তু জমিদার এ সবের কিছুই

জান্‌ত না। ছোট খুড়োর আদেশেই ছোট খুড়োর লোক সেই রাত্রেই গয়লা বৌ-র ঘরের মটকা গলে, ঘরে নেমে তার মুখে কাপড় বেঁধে.....

আমি ভীমনাদে বলিয়া উঠিলাম—দাঁড়াও।

মামা বলিল—থাম।

৪

লেখক—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

প্রসাদের মা'র কথা

আমার নামে ছেলেবেলা থেকেই এই একটা মস্ত বড অপবাদ আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলে আসছে যে, আমি না কি যখন তখন এবং যাকে তাকে একটু তাতেই বিশ্বাস করে বসি, এবং আমার দয়ামায়াটা না কি পাত্রাপাত্র বিচাব না করেই বিনা কাবণে হঠাৎ উথলে ওঠে। হবেও বা! কিন্তু এ কথাও বলি যে, সারাটা দুনিয়ার এই যে লোকগুলো, এদের না বিশ্বাস করে পুরুষরা হয় ত বা থাকতে পারে—কিন্তু আমরা পারি না। আমরা যে স্ত্রীলোক, আমরা যে অনেক কষ্টে, অনেক সহ্য করে, অনেক দরদ দিয়ে তাদের একটু একটু করে গড়ে তুলেছি—আমরা যে তাদের মায়ের জাত। পুরুষরা ঠাট্টা করে বলে বটে যে, আমরা একটু তাতেই গলে যাই—একটু তাতেই খপ্ করে মানুষকে বিশ্বাস করে বসি। তা'ত করিই, কিন্তু কেন যে করি, সেটা ত আর তারা ভেবে দেখে না। আমরা কি নিজেরাই বুঝি না—এমনি করে দুনিয়ায় অনেক সময় আমাদের ঠকতে হয়?—তা খুব বুঝি আমরা—কিন্তু নাচার! পুরুষ মানুষেরা কাজে বেরিয়ে গেলে, দুপুর বেলায় তিলক সেবা ক'রে বোষ্টমের দল যখন এসে, "ভিক্ষে দাও মা," বলে

চৌকাঠের ধারে দাঁড়ায়, তখন কি আমরা কিছু বুঝতে পারি না মনে কর! সব বুঝি, কিন্তু ঐ যে বল্লুম,—আমরা যে মায়ের জাত, আর তারা যে এসে দাঁড়ায়,— আর কিছু না,—কেবল মা বলেই। তাই ঐ জায়গাটাতে যখনি ঘা পড়ে, অমনি সেই দশমাস দশ দিনের তিল তিল করে আপনাকে ভুলে যাওয়ার দরদটুকু বুকের মাঝখানে একবারে টন্ টন্ করে ওঠে। ও যে নাড়ীর টান,—বিধাতার নিজের হাতে গড়া জিনিষ। ওর হাত থেকে কি ছাড়ান পাবার যো আছে—যে তাই পাবো!

প্রসাদ প্রায়ই আমাকে খোঁচা দেয়, কমল নাকি আমাকে মা বলে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি নিজের দলে টেনে নিয়েছে। হবেও বা! কিন্তু এ কথাও বলি, যারা মনে করে, শুধু একবার মা বলে ডেকে কমল সস্তায় আমার অন্তঃকরণটা জয় করে ফেলেছে, তারা জিনিষটা পুরোপুরি ঠিক বুঝতেই পারে নি। তারা শুধু কান দিয়ে শুনলে কমল ডাকলে, "মা"—বাস্, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আমি ত শুধু এটুকুই লক্ষ্য করিনি,—আমি যে সেই সঙ্গে দেখে ফেলেছি, তার সুন্দর চোখ দুটি কেমন করে আস্তে আস্তে সজল হয়ে উঠলো।

প্রসাদ বলে, কমল ছেলেটি বড় সোজা নয়,—কিন্তু বিশেষ বাঁকা বলেও ত তাকে মনে হয় না। গয়লা বৌ ফিরে এসে যা বল্লে, তা থেকে-ও ত কমলের বিপক্ষে বিশেষ কোন দোষের কথা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁ গয়লা বৌ, এই যে এতদিন কমলদের বাগানে আটক রইলে, তা সে কোনদিন গিয়ে তোমাকে জ্বালাতন করে নি ত?"

সে বল্লে, "না মা, তেনাকে ত কোনদিন দেখি নি।"

আবার জিজ্ঞেস করলাম, "ছোট খুড়োকে কোনদিন দেখ নি?"

গয়লাবৌ ঘাড় হেঁট করে বল্লে, "আজ্ঞে, তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন, আর নানান কথা বল্‌তেন।"

গয়লাবৌয়ের মুখ থেকে সব কথা শুনে যতদূর বোঝা গেল, তা থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ছোট খুড়োই তাকে বাগানে আটক করে রেখেছিল; এবং এই আটক করে রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর কিছুই না, তাকে কোন ধনী লম্পটের হাতে তুলে দেওয়া। তাতে করে সেও বেশ দিব্যি রাজরাণীর হালে থাকতে পাবে; আর ছোট খুড়োও বুড়ো বয়সে কিঞ্চিৎ গুছিয়ে নিতে পারেন। রাগে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—কিন্তু থাক্ এখন সে কথা!

প্রসাদকে ডেকে সব কথা বল্লুম। সে বল্লে, "এখনো তোমার সন্দেহ আসছে না মা?—বলিহারি তোমাকে যাহোক্!"

আমি বল্লুম, "কখনই না—কমল এর মধ্যে কিছুতেই নেই। ছোটখুড়ো নিশ্চয়ই অন্য কোন বড় লোকের জন্যে এ কাজ করেছে। তা যদি না হোতো, তা হলে কমল নিজে কখনো গয়লাবৌকে ছেড়ে দিতো না।"

প্রসাদ মুখভঙ্গী করে উঠলো—"ন্যাকা ছেলে আর কি! তারই বাগানে এতদিন আটক রইল, আর তিনি কিছুই টের পেলেন না—কচি খোকা আমার!"

আমি বল্লুম "কিন্তু শেষকালে সেই ত গয়লাবৌকে বার করে দিলে। আর, তার পরামর্শেই ত বাগান বাড়ীতে খোঁজ করা হোলো,—তা না হলে কে আর সেখানে খোঁজ করতে যেত? সে নিজেই যদি গয়লাবৌকে লুকিয়ে রাখবে—তবে নিজেই আবার ধরিয়ে দিতে গেল কেন শুনি?"

এ কথার জবাবে প্রসাদ বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারলে না বটে, কিন্তু

তার মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝলুম, তার বুকের ভিতরকার অবিশ্বাসের জমাটি কালো মেঘটা এতখানি বর্ষণ করেও একটুও হাল্কা হ'তে চাইছে না। কিন্তু এ যে নেহাতই বাড়াবাড়ি!

কমল সেদিন সন্ধ্যায় সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বল্লুম, "গয়লাবৌকে যে খুঁজে পাওয়া গেছে—এ কেবল তোমারি চেষ্টায় বাবা! তোমার কাছে আমরা যে কি পর্য্যন্ত ঋণী, তা আর কি বলবো কমল!"

সে এ কথার কোন জবাব দিলে না; এবং কথাটাকে হঠাৎ মাঝপথে চাপা দিয়ে বলে উঠলো—"আমাদের বাড়ী একদিন বেড়াতে যাবে না মা?"

আমি বল্লুম, "কেন যাবো না বাবা?—নিশ্চয়ই যাবো! তোমাদের বাড়ী বেড়াতে যাবো, এর আর কথা কি বাবা!"

পরদিন কমলদের বাড়ী বেড়াতে গেছলুম। আহা, বাছার মাথার ওপর কেউ নেই! দূরসম্পর্কীয়া কে এক পিসীকে এনে সংসারে রেখে দিয়েছে;—আমার ত তাকে একটুও ভাল লাগলো না; কমলও যে তার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়, তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল।

জিজ্ঞেস করলুম, "এখন পর্য্যন্ত বিয়ে কর নি কেন কমল?"

সে ঘাড় হেঁট করে একটু হেসে উত্তর দিলে, "কে দেবে মা?"

"কেন, তোমার পিসী রয়েছেন ত!"

সে কোন কথা বল্লে না—কেবল একটু হাসলে। কিছুই বুঝতে পারলুম না।—এর উপর আর খোঁচা দিয়ে ভিতরের সমস্ত খুঁটি নাটি ব্যাপার জেনে নেবার প্রবৃত্তি আমার আদবেই ছিল না। কেন না, তার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, এমন একটা জিনিষ তাকে জিজ্ঞেস করা

হয়েছে, যার উত্তরে শুধু কেবল একটুখানি হেসে ক্ষান্ত হওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই।

কেন কে জানে, এই সুন্দর মাতৃহীন, অনাথ ছেলেটির যতই কাছাকাছি আস্‌ছি, ততই যেন স্নেহ, মমতা, করুণায় বুকটা আমার একবারে ভরে ভরে উঠছে। করুণ—বড্ড করুণ তার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস-টুকু। এর উপর প্রসাদ কি করে যে রাগ করে থাকতে পারে, তা আমিও বুঝতে পারি না—নির্ম্মল-ও না।

কমলের কথা

গয়লা বৌকে শেষকালে ছেড়ে দিতে হোলো। কিন্তু তাই বলে এ কথা আমার মন কোন দিন স্বীকার করবে না যে, এর মধ্যে একটুও ভীরুতা আছে। প্রসাদ যতই কেন সাউখুড়ি করে বেড়াক না, তাকে আমি একতিলও ভয় করি না। সে একা কি করতে পারে? আমার দলে লাঠিয়ালের ত অভাব নেই।

গয়লা বৌকে যে ছেড়ে দিলুম, এর মধ্যে অনেক কারণ আছে। সত্যি বলতে কি, তার রূপে যে আমি কোন দিন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলুম, এ কথা স্বীকার করতে আমি কোন দিনই রাজি নই। তবু যে তাকে এত কাণ্ড করে আটক করেছিলুম, সেটা একটা ঝোঁক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটা আমার একটা বরাবরের ধারণা, সেই ছেলেবেলা থেকে, যে, আমার মত সুপুরুষ দুনিয়ায় আর দুটি নেই। এর মূলে যে একেবারে কোন সত্য নেই, বিনয়ের খাতিরেও এত বড় মিথ্যে কথাটা বলতে পারবো না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আস্‌ছি, আমি না কি ভারি সুন্দর ;—হবেও বা! কিন্তু এই "হবেও বা," বলে চুপ করে বসে থাকবার যে বয়স, সেটা কবে এক দিন তার একরাশ ছেলেমানুষী আর খামখেয়ালে খেলা ধূলোর বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গাচুরো টুকরাগুলো এক যায়গায় জড় করে, একটা মস্ত বড় থলের পুরে, পিঠে ঝুলিয়ে, হঠাৎ বলা কওয়া নেই, কোথায় যে সরে পড়লো, তার আর দিশে পাওয়া গেল না। সেই দিন থেকে নিজের রূপের ব্যাখ্যানা শুনে শুধু কেবল "হবেও বা," বলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। তার পর আরও

কয়েক বৎসর কেটে গেল—১৯ বৎসরে পা দিলুম। মাথার উপর কেউ নেই—বাপ মা ত নয়ই—আত্মীয় স্বজনও নয়।

আমার মনে হয়, যৌবন যদি কিছু চায় ত সে বিজয়-গর্ব্ব। সকলের মনের অবস্থা অবশ্য ঠিক জানি না, তবে আমার মধ্যে যৌবন যে বেশে দেখা দিয়েছে—তা থেকে তাকে বিজয়-বীর ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, বর্ষাকাল; দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে বাইরের ঘরে, বাগানের দিকের জানালাটার ধারে, একটা সোফার ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছি। জানালার সামনেই পুকুর,—ঝুপ্ ঝুপ্ করে একঘেয়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছিল। জানালার ধারে চুপটি করে বসে আছি, এমন সময় কাঁকালে কলসী নিয়ে একটি স্ত্রীলোক ভিজতে ভিজতে ঘাটে এসে হাজির হোলো। ঠাওরে দেখলুম—গয়লা বৌ।

আমি যেমন বসেছিলুম তেমনিই বসে রইলুম—ঠিক যে তাকে দেখবার জন্যে তা নয়—এমনি শুধু শুধু। গয়লা বৌ জলে নামছিল, হঠাৎ তার নজর পড়ে গেল আমার দিকে। সে এমনি অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলে—যেন আমি একটা মানুষই নই এবং আমার অস্তিত্বটাকে সে স্বীকারই করতে চায় না। বড্ডই অপমান বোধ হোলো। কি করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার পিঠে হাত দিলে—ফিরে দেখি, খুড়ো মশাই।

পিঠ চাপড়ে খুড়ো বলে উঠলেন, "ব্যাপার কি বাবাজী ?"

আমি কোন কথা বল্লুম না—যেমন চুপ করে বসেছিলুম তেমনিই বসে রইলুম।

খুড়ো জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে একবার উঁকি মেরে বল্লে —"গাঁথলো না কি ?"

আমি তবুও চুপ করে রইলুম। খুড়ো আবার আরম্ভ করলে, "গড়ন পেটন নেহাত মন্দ নয় হে ; ছোট লোকের মেয়ে হলে হবে কি, অনেক বামুন কায়েতের ঘরেও অমন একখানা—বুঝলে কি না—।"

অধিকাংশ স্থলেই দেখেছি, স্ত্রীলোক যেখানে আপনা হতে তু বলতেই এসে হাজির হয়, সেখানে মানুষের যৌবনটা কিছুক্ষণের জন্যে একবার চন্ চন্ করে ওঠে বটে, কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্যে নয়। আমাব খুব বিশ্বাস, যৌবন বলে যে রসিক জীবটি আমাদের বুকের মাঝখানে বাসা বেঁধে থাকেন —তিনি বিলক্ষণ কল্পনাপ্রিয় এবং কবিত্ব বলে' জিনিষটা তাঁর মধ্যে বেশ দস্তুর মতই আছে। তাই দেখতে পাই, যাকে চাইলেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাকে চাইবার পর না-পাওয়ার অবকাশটুকুকে কল্পনায় সুন্দর করে তোলবার কোন রকম ব্যবস্থা বা সুবিধা নেই, সেখানে যৌবন বড্ড শীগ্‌গিরই নেতিয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ত আর কোন ভুল নেই যে, দুনিয়ার যত কেন সৌন্দর্য্য থাক্ না, কল্পনার কাছে তা হার মানবেই—কেন না, কল্পনা যে সৃষ্টির চাইতে অনেক বড়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, যাকে চাইবামাত্রই হাতের গোড়ায় পেলুম, তার সৌন্দর্য্য যতই কেন বেশী হোক না, তার একটা সীমা আছে, কেন না, তাকে দেখছি যে চোখ দিয়ে। কিন্তু যাকে চেয়েও পেলুম না—তাকে চোখ দিয়েই শুধু দেখলুম না ত—মন দিয়েও যে তাকে দেখতে চেষ্টা করলুম ; আর ঐ মনের দেখা যে সত্যিকারের দেখার চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ দেখিয়ে দেয়, যা হয় ত আমাদের ঐ চোখে দেখা জিনিষটার মধ্যে আদবেই নেই।

সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা, তবু কিন্তু বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। বয়স তখন ১৬ কি ১৭; ছেলেবেলাকার সহপাঠী বন্ধু দুলাল-দের বাড়ীতে গেছি তার ভগ্নীর বিবাহে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বর তখন পর্য্যন্ত আসে নি। আমরা বাইরের ঘরে উন্মুখ প্রতীক্ষায় বসে আছি। দুলালের একটি ছোট্ট ভাগ্নী, বয়স হবে ৫ কি ৬—দিব্যি ফুট ফুটে মেয়েটি—সেজে গুজে এসে দুলালের কাকাকে জিজ্ঞেস করলে "বর কখন আসবে দাদা মশাই ?"

লোকটি ছিলেন কিঞ্চিৎ রসিক প্রকৃতির—তিনি তখন বড়াক্ বড়াক্ করে তামাক টানছিলেন—হুঁকাটাকে নামিয়ে রেখে একটু হেসে বল্লেন—"তোর বর ত মজুত রয়েছে ভাই—মালা বদল করলেই হয়।"

মেয়েটি বলিল, "ধ্যাৎ !"

বৃদ্ধ আবার বলিল, "ধ্যাৎ কি বল্—আমি যে তোর বর হইরে !"

মেয়েটি আবার বলিল "ধ্যাৎ !"

বৃদ্ধ বলিল, "কেন, আমাকে তোর পছন্দ হয় না বুঝি ?"

"না হয় না," বলে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল, খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলে, কাছে বসিয়ে দুলালের কাকা বল্লেন, "আমাকে ত তোর পছন্দ হোলো না—আচ্ছা দেখি, তোর পছন্দর দৌড় কত দূর,—এই ত একঘর লোক রয়েছে, বল দেখি তুই কাকে বিয়ে করবি ?"

মেয়েটি পূর্ব্ববৎ বলে উঠলো—"ধ্যাৎ !"

শেষকালে অনেক পেড়াপেড়ি করাতে সে ঘরের চারিদিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল। তার পর তার দাদা মশায়ের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক ছুটে ঘর

থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল—তার আর তল্লাসই পাওয়া গেল না।

হো হো করে হেসে উঠে, দুলালের কাকা বলে উঠলেন, "তা যাই বলো, নাতনীর আমার পছন্দকে তারিফ করতেই হবে!" সকলে সকৌতুকে বলে উঠলো—"কাকে পছন্দ করলে শুনি?"

আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে দুলালের কাকা বল্লেন, "কমলকে" আমার সেদিন খুব লজ্জা হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হয়েছিল আনন্দ।

সেইদিন প্রথম টের পেলুম—রূপটা বড় কম জিনিষ নয়। সেদিন একটা প্রকাণ্ড বিজয়-গর্ব্বে বুকখানা সাতহাত হয়ে উঠেছিল; এবং বুকের ভিতরকার সমস্ত অলি গলি প্রতিধ্বনিত করে তুলে, মাথা চড়া দিয়ে উঠে নবীন যৌবন তাল ঠুকে সাড়া দিয়েছিল,—"হাম হ্যায়!" সেই সময় আবার পড়ছিলুম, দুর্গেশনন্দিনী; তিলোত্তমা কি করে অন্যমনস্ক হয়ে ঘরময় লিখে বেড়াচ্ছে—কুমার জগৎসিংহ আর কুমার জগৎসিংহ। আমি কল্পনায় দেখতে লাগলুম—সেই ফুটফুটে মেয়েটি তার পাঠশালে যাবার সেলেট-খানিতে আস্ক আস্ক লিখতে গিয়ে লিখে ফেলেছে রাত দিনই আমার নাম, আর চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে।

এমনি ধারাটা যখন মনের অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ একদিন কোথা থেকে এসে জুটলেন—খুড়ো মশাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, এই দুনিয়ায় যারা জন্মেছে পরের মাথায় হাত বুলোবার জন্যে। কিন্তু এই পর বলে জীবটি সব সময়েই যে ঠিক তাঁরি সমবয়স্ক বা সমধর্ম্মী হবে, এমন ত আর কোন লেখা নেই—কাজেই এই সব লোককে বহুরূপী সেজে বেড়াতে হয়—তা না হলে এঁদের ব্যবসা চলবে না যে।

ছোট খুড়ো যেদিন সত্যি সত্যিই আমার স্কন্ধে এসে ভর করে বসলেন—সেদিনও আমার বয়স কুড়ি পার হয় নি। তাঁর বয়স তখন ৫৫ কি ৫৬ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশীও হবে বা। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখলুম এই একটা, যে, আমার সঙ্গে মিশতে তাঁর একটুও বাধলো না—না বয়সে—না স্বভাবে।

দেখতে দেখতে খুড়ো আমার এমনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন যে, তাঁর কাছে প্রাণের কোন কথাই লুকোবার আর দরকারই রইলো না। তার পরই খুড়োর সঙ্গে মাঝে মাঝেই কলকাতায় যাওয়া দরকার হয়ে পড়তে লাগলো—কেন, তা আর বলে কাজ নেই।

তাই ত বলি, গয়লা বৌ কি আর এমন সুন্দরী যে, তার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠবো!—দু দশ টাকা ছাড়লে আঙুলের ফাঁক দিয়ে অমন ঢের স্ত্রীলোক গলে চলে আসে। কিন্তু তবু কেমন একটা ঝোঁক হোলো—তাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতেই হবে—তার কারণও ছিল একটু।

একটু আগেই বলেছি, আমার বরাবর ধারণা ছিল, আমার মত সুপুরুষ আর দুটি নেই; এবং এ ধারণাটাও এদানি হয়েছিল যে, আমাকে দেখে মরে না এমন স্ত্রীলোক দুনিয়ায় খুব কমই আছে। প্রমাণও ঢের পেয়েছি। কিন্তু প্রথম এবং মক্কম ধাক্কা খেলুম এই গয়লা বৌয়ের কাছ থেকে।

সে সত্যিকারের চেয়ে অনেক বেশী জিনিস আমার বুকের মধ্যে এনে দিলে সেই মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে সে আমাকে জানিয়ে দিলে যে, তাকে পাওয়া বড় সহজ নয়! সে যদি সেদিন আমাকে দেখে অমন করে চোখ ফিরিয়ে না নিত,—তাহলে হয় ত তার পিছনে পিছনে কিছুদূর

পর্য্যন্ত আমার চোখ দুইটি ধাওয়া করতো,—মনটা নয়। কিন্তু সে যে আমার চোখের চেয়ে মনটাকেই কেড়ে নিয়ে গেল বেশী ক'রে—সেই ত হলো মুস্কিল!

খুড়োকে বল্লুম—"খুড়ো, গয়লাবৌকে কিন্তু চাই-ই চাই।" খুড়ো বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্লে, "বড় শক্ত কাজ বাবাজী—মাগীর বড্ড গুমোর,—আর খাঁইও বড় কম নয়।"

আমি বল্লুম, "খাঁইয়ের জন্যে ভাববেন না,—যত লাগে দিতে রাজী আছি।—আপনাকে কেবল ওর গুমোরটা ভাঙতে হবে, বুঝলেন?"

তার পর গয়লাবৌকে ত বন্দী করা হোলো। খুড়োকে বল্লুম—"পাড়ার লোকে টের পেলে কি বল্‌বে?"

খুড়ো অম্লানবদনে বল্লে, "তখন আমার নামে দোষ দিলেই সব গোল চুকে যাবে অখন—তুমি তখন ডাহা ভাল মানুষটি সেজে বসবে—বুঝলে?"

খুড়ো অনেকবার ঠিক এমনি করেই নিজের ঘাড়ে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে, আমাকে দিব্যি ফাঁকতালে রেহাই দিয়েছে; এবং বেশ দেখতে পাই, এই ধরণের কাজ পেলে খুড়ো একেবারে উৎসাহে মেতে ওঠে। এর কারণও আছে বিস্তর।

খুড়ো চায় আমাকে দেখাতে যে সে আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে—যদিও আসলে তিনি ভালবাসেন আমার লোহার সিন্দুক, আর কাঁচা মাথাটাকেই—সব চেয়ে বেশী।

যাক্, এখন কথা হচ্ছে, আমাকে যে খুড়ো প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন এটা ত প্রমাণ করতে হবে—তা না হলে চলবে কেন। আর এটাও খুড়ো জানেন যে, আমাকে তিনি যতই ঋণজালে জড়াতে পারবেন, ততই তাঁর

পক্ষে সুবিধে। কেন না, তাঁর ঋণ শোধ হবে যেদিন, সেদিন সুদ, তস্য সুদ, মায় সুদের চৌদ্দপুরুষ, তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। তাই আমার ঋণের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, ততই তাঁর উৎসাহ পরদায় পরদায় চড়তে আরম্ভ করে! এই হোলো খুড়োর পরোপকারের ভিতরকার আসল চেহারাখানা। খুড়ো চায় পরোপকার করতে, কেন, না, খুড়ো সকলের চেয়ে এটা বেশী জানে যে, জীবন নাট্যের যে দৃশ্যটিতে পরোপকা-রের অভিনয় হবে, তার পরের দৃশ্যটি নিশ্চয়ই প্রত্যুপকারের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাকে শেষ করবে! তাই যখনি বলেছি—"খুড়ো এর পরে লোকে যে আমাকে একবারে"—খুড়ো তাড়াতাড়ি আমার মুখ চাপা দিয়ে বলে উঠেছেন—"আহা, সে জন্যে এত ভাবো কেন—আমি রয়েছি ত—আমার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ো না হে!"

যাক্, এমনি করে গয়লাবৌকে ত আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলা হোলো। কিন্তু গোল বাধিয়ে বসল—প্রসাদ আর তার মামা নির্ম্মল।

সেদিন বৈঠকখানায় বসে আছি—হঠাৎ খবর পেলুম, খুড়োকে না কি একলা পেয়ে প্রসাদ আর নির্ম্মল ভয়ানক রকম অপমান করছে। তখনি ত ছুটে গেলুম দেখতে, ব্যাপারখানা কি। গিয়ে মাথা মুণ্ডু কি যে দেখলুম, যা জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না—দেখলুম, সেই গোলমাল এবং হট্টগোলের মাঝখানে স্তব্ধ, স্থির, শান্ত, অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে এক নারী মূর্ত্তি। কি প্রশান্ত নির্ম্মল সে মূর্ত্তি! মাথা যেন আপনা হতে হেঁট হয়ে যায়। গেছলুম প্রসাদ এবং নির্ম্মলকে একটু শিক্ষা দিতে; কিন্তু হঠাৎ কি করে জানি না, মনটা একেবারে ডাহা বেমালুম হয়ে গেল। স্ত্রীলোক চিরকাল আমাকে উত্তেজিতই করে এসেছে,—আজ

এই প্রথম মালুম পেলুম, স্ত্রীলোক মানুষকে শান্ত করতেও জানে,—তার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করতেও পারে। কখন নিজের অজ্ঞাতসারে ডেকে ফেললুম—"মা!" প্রাণটা সত্যি সত্যি সেদিন যেন কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠলো—জীবনের অনেকগুলো ফাঁক এক মুহূর্ত্তে কে যেন ভরে দিয়ে গেল।

প্রসাদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে, বাইরের ঘরে বসে কত কথাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ খুড়ো এসে বল্লে—"গয়লাবৌয়ের সঙ্গে একবার দেখা করবে না?"

বললুম—"না, মনে করছি, কালই তাকে ছেড়ে দেবো।"

"সে কি!"

খুড়ো একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিরক্তভাবে বললুম, "বাজে বক্‌বেন না মশাই, আমার এখন ও সব কিছু ভাল লাগছে না—যান এখান থেকে।"

খুড়ো চলে যেতে মনে মনে ভাবলুম—গয়লাবৌকে নিয়েই বা আমি কি করবো? তার দেহটাকে ত আর আমি ভালবাসি নি, যে, জোর করে সেটাকে নিজের ভোগে লাগাবো। আমি যে ভালবেসে ফেলেছি তার ভিতরটাকে—যার উপর কোন জোর জবরদস্তিই খাটে না। তাকে আটক রেখে আমি কি করবো?—কিছু না—কিছু না—কিছু না!—কান্না পেতে লাগলো। স্ত্রীলোক যেখানে স্ত্রী বা মা বা বোন, সেখানে তাকে জোর করে পাওয়া যায় না। জোর করে পাওয়া যায় কেবল সেই-খানে, যেখানে সে ভোগের সামগ্রী,—যেখানে সে একটা মাটির ঢেলা মাত্র। গয়লাবৌকে ছেড়ে দেবো—নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো। কিন্তু এর মধ্যেও একটা কথা আছে।

পরদিন সকালে গয়লা-বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম। আমাকে দেখেই সে মাটীতে লুটিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল, "আমাকে ছেড়ে দিন—আমি আপনার ছোট বোন হই, দোহাই আপনার।"

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চন্ চন্ ক'রে উঠল—বললুম, "তুমি কেঁদ না, এখনি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু একটি উপকার করতে হবে, ছাড়া পেয়ে তুমি কারোর কাছে বোলো না, আমার সঙ্গে তোমার কোন দিন দেখা হয়েছে। অর্থাৎ আমি যে এর-ভেতর আছি, এ কথা ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়।"

সে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লে, "আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—এ কথা আমার মুখ দিয়ে কোন দিন বেরুবে না।"

ভাবলুম, এখনি ছেড়েদি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলুম, এখনি না ছেড়ে, নির্ম্মলকে সঙ্গে করে এনে, তার সুমুখে ছেড়ে দিলেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হবে। কাজেও তা করা গেল, নির্ম্মল ত অবাক্! সে আমার হাত দুটো ধরে বলে উঠল, "কিছু মনে কোরো না ভাই—তোমাকে আমরা আগাগোড়াই ভুল বুঝে এসেছি।" লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হোয়ে গেল। কি ভয়ানক প্রতারণা!—কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও যে নেই।

৫

লেখিকা—শ্রীমতী চারুবালা বসু

প্রসাদের মা'র কথা

গয়লা বৌকে পাবার পর কয়েকটা দিন বেশ নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়া গেল। এখানে আসার পর হইতে যে বিষাক্ত ধূয়োটার ঘূর্ণিপাকে নিজের সমস্ত প্রাণটাই হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে দুটোকেও অস্থির করিয়াছিল, হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা দমকা বাতাস আসিয়া কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাওয়ার মত মনের সমস্ত আবর্জ্জনাটাকেই মুহূর্ত্তে উড়াইয়া দিয়া, সেই অন্তরের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়া দিল, সে একটা মস্ত নীরব শান্তি। সমস্ত গ্রামটার মধ্যেও যেন এই ভাবটা বহিয়া চলিয়াছিল। সারা গ্রামটার মুখেও যেন আমারই মনের অনুরূপ একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এত দিনের উদ্বিগ্নতা কাটিয়া গিয়া, একটা প্রসন্নতার সুবাতাস যেন চারিদিক দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। ভাবটা এই যে, যেন মস্ত বড় শনি গ্রহটাই কেটে গেছে তাদের,— তাও আমারই কৃপায়,—তাদের কৃতজ্ঞ দৃষ্টির মধ্যে এও যেন স্পষ্টই আমি দেখতে পাই! যখন এই ভেবে নিজের মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌ছিলাম, তখন কেবল মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে সমস্ত বলটা আমার ব্যথিত করে তুলছিল

প্রসাদ। ক্ষণিক তার যুক্তি তর্কের মাঝে নিজের যুক্তি তর্কের সূত্র হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

ক'দিন ঘোর অশান্তিতে কাটাবার পর, এই বিপুল শান্তির মাঝে লাভে হতে তার ক্ষতিপূরণ শুদ্ধ পেয়ে গেলাম পুত্র রত্ন কমলকে। কেন কে জানে, প্রথম দর্শনেই, এই নধর—কান্তিময় সুন্দর ছেলেটিকে দেখেই আমার সমস্ত অন্তরটা বুভুক্ষর মতই, আকুল আগ্রহে তার দিকে টেনে নিয়েছিলো। তার করুণ দৃষ্টিটার মধ্যে কি দেখেছিলাম জানি না—সেইদিন থেকেই, সমস্ত অন্তরটা আমার মাতৃত্ব রসে স্নিগ্ধ হয়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে, ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল। আরও যতই তাকে নিকটে পাচ্ছি, ততই মাতৃত্বের বিপুল গৌরবে সমস্ত প্রাণটা আমার ভবে ভরে উঠছিল।

আজও তার কথাই ভাবছি। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে নিজের ঘরে চরকাটাকে নিয়ে বসেছি। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশটা আজ পরিষ্কার হইয়া নির্ম্মেঘ আকাশে সূর্য্যদেব এখন মধ্য গগনে চড়িয়া বসিয়াছেন। তাঁহার খর রশ্মি, মেঘের উপরেই জানালা দিয়া খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছিল। খানিক পরে তীব্র রোদটায় চোখ দুটো টনটন করিতে লাগিল বলিয়া—অপ্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বসিলাম। দূরে বসিয়া টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া নির্ম্মল বি-এ'র পড়াটাই মুখস্থ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—বাঃ রে—অন্ধকার করে দিলে কেন?

আমি আজ উত্তপ্ত রোদটার জন্য প্রকৃতির উপর একটু দোষারোপ করিয়া, জানালা বন্ধর ইতিহাসটুকু বিবৃত করিতেই, নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—এই তো হচ্ছে মানুষের দোষ, নিজের কর্ম্মভোগটুকু আর এক জনের

ঘাড়ে না চাপিয়ে মানুষ কিছুতেই স্বস্তি বোধ করে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের কোন দানটাই মানুষ মনে প্রাণে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছুতেই গ্রহণ করতে চায় না। তার কারণ আর কিছুই নয়—মানুষ নিজেই নিজে অসুখী,—নিজের মনে নিজেই একটা অতৃপ্তি টেনে এনে অসুস্থতা ভোগ করে। আমি জিজ্ঞাসিলাম "তার মানে?" নির্ম্মল বলিল "মানে আর কি? মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা বলছি, সে তোমার বলে বলছি নে, দিদি, শুধু তুমি আমি বলে নয়, সকলকার কথা বলেই বলছি। এই ধরো যেমন এই ভীষণ বর্ষার দিন কটা কেউ-ই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি—কেন? তার অপরাধ কি না, অবিরত তার ধারায় সিক্ত হয়ে মানুষকে চলতে ফিরতে হয়েছিল, তোমাদের সাংসারিক বিষয়েও কত কি! আবার যেই একটু রোদ ফুটে উঠেছে, অমনি তার ভীষণ তাপ মানুষের অসহ্য হয়ে উঠেছে,—তোমার চোখ টন টন করছে,—এমনি আরও কত জনের কত কি হচ্ছে! তাই—সেই কথাই বলছিলাম।

নির্ম্মলের যুক্তির খেইটা কোথা দিয়ে কোথা গিয়ে ঠেকেছিল, সে অন্যের কাছে হয় ত সমস্যার মত ঠেকিলেও আমি বুঝিলাম,—ঐটুকু কথার সূত্র ধরিয়া এতখানি দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার ছেলে সে নয়; মানুষের অকৃতজ্ঞতাতে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও তার থাকে না। সে যাকে উদ্দেশ করে কথাটা বলেছিল, বুঝিলাম, সে প্রসাদ। নির্ম্মলের ছেলেবেলা থেকেই ঐ স্বভাবটা। নিজের মনে অন্যের উপর হলেও রাগ অভিমান-টুকু কারণে অকারণে যে সময়েই হোক, বর্ষণ করে ফেলিত। আমার উপর সেটা আবার এমনি ভাবেই করিত যে, সে সময় সে আসল সূত্রের

খেইটা হারিয়েই ফেলে এমন দিক দিয়ে যেত যে, সেটা কাহারো বোধগম্যই হইত না।

অবশ্য তার ঝালটা যখন ঝাড়িত, বরাবর সেটা আমার উপর দিয়াই যেত। প্রসাদ কদিনই, আপন মনে নিজের ঘরটার মধ্যে একলা থাকে। কি একটা নাকি ছবি আঁকিতেছে,—কি ছবি সেই জানে। চির দিনই, ওর একটা ঐ স্বভাব—যখন যে-টা খেয়াল ধরে, তখন সেটা পূরণ করতে বড় দেরী করে না। আবার এমনিই খেয়ালের চোট—সেটা শেষ করতে ও কোন দিন দেখিনে। তাই, তার কোন কাজের কৈফিয়ৎও কোন দিন যেমন চাইনি, কৌতূহল দৃষ্টি নিয়েও সে কি কচ্ছে না কচ্ছে দেখিনে।

আজও সে নিজের ঘরেই বসিয়া ছিল। ক'দিনই, আমি লক্ষ্য করে আসছি, আমাদের সান্নিধ্য থেকে সে দূরে সরে থাকতে চায়। তারও হেতু—কমল যতই আমাদের নিকট সরিয়া আসিতেছে, প্রসাদ ততই নির্জ্জন নিরালায় নিজেকে লুকাইতে চায়। কেন কে জানে, প্রথম দিন থেকেই প্রসাদ নিজের সন্দেহ-পূর্ণ দৃষ্টিটা নিজের প্রচেষ্টাতেও সরাইতে পারে নাই! এমন কি, তাহার সেই দৃষ্টিটা কমলের কাছেও ধরা পড়েছিলো! এ আমি চক্ষেই দেখে এসেছি। দেখে খুবই লজ্জিত হয়ে উঠে ছিলাম। অপ্রস্তুত মুখে কমলের দিকে চাহিতেই, কমল তার সরলতা মাখা মুখটি লুকিয়ে ফেলে ছিলো। সে কোন দিনই ঘুণাক্ষরেও তার মনের ভাবটা আমাদের জানতে দেয়নি। কিন্তু সেইদিন থেকে অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠল—প্রসাদ।

এতটা বাড়া-বাড়ি আবার আমার কোন দিনই বরদাস্ত হয় না। দুদিন হলো কমল আর আসেনি—কেন কে জানে। বাড়ীতেও তার কতবার

খোঁজ নিয়েছে নির্ম্মল, দেখা পায় নাই। কোথাও গেছে কি না তাহাও কেহই বলতে পারে না। হঠাৎ তার এমন অদৃশ্য হবার কারণ কি? এই সব কথাই এতক্ষণ বসে ভাবছিলাম। নির্ম্মল দুদিন তার খোঁজ না পেয়ে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলো, এবং সেই দিকটা ভেবেই বোধ হয় তার মন প্রসাদের উপর এমন বিরক্ত হয়ে গেছিল।

নির্ম্মলের কথার ঝাঁঝে কয়েক মুহূর্ত্ত আমারও অন্তরটা সেই দিকে ঝুঁকে পড়ল, হয় ত হবেও বা! মানুষের অন্তরের কথা সব সময় কে বুঝতে পারে। প্রসাদের বিরক্তিতেই যে সে ক্ষুব্ধ হয়ে সরে পড়েছে—তার বা আশ্চর্য্য কি!

কথাটা ভাবিতেই, অমনি সমস্ত অন্তরটা আমার মাতৃত্বে আঘাত করিয়া, টন্‌টন করিয়া একটা ব্যথা এই বুকের মাঝে বাজিয়া উঠিল। জানি না কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দেশ থেকে কোন অসামান্য শক্তি নিয়ে এ মাতৃহীন ছেলেটি করুণ মূর্ত্তিতে অন্তরটা আমার ভরাট করে দিয়েছিলো। যেন নিশ্চিন্ত নির্ভরেই তাকে এই বুকের মধ্যেই আঁকড়ে নিয়ে সুপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোন দিন যে হারাতে পারি, এ ধারণাটা মনের অগোচরেই বাস করছিল; অর্থাৎ সুপ্ত মনটা একটা খোঁচায় জাগিয়ে দিয়ে—বিরাট হাহাকারে ডুবিয়ে দিলে। আজ বুকের উপর সেই যে একান্ত নির্ভরশীল শিশুটিকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, কে যেন সবলে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে,—তাকে কোন দিন পাবার আশাটুকুও বুঝি কোন অজ্ঞাত অজানার পথেই মিশে গিয়েছে।

আমি ব্যথিত দৃষ্টিটা নির্ম্মলের মুখের উপর তুলতেই, নির্ম্মল করুণ উদাস স্বরে বললে—"কমলটা বড় ভাবিয়ে তুল্লে দিদি!"

আমার দৃষ্টিটা তারই দৃষ্টির অনুসরণ করে মৌন ভাষায় তার কথারই

সমর্থন করিলাম। তখন বুঝি কথা বলিবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন কে জানে, ঐ মায়াবী ছেলেটা যেন এক দণ্ড আমাদের ছেড়ে থাকতে চাইত না। আমারও সমস্ত অন্তরটা দিয়ে কাণ দুটো খাড়া হয়ে থাকে তার মা ডাকের আশায়, প্রতীক্ষায়! হায় রে দুর্ব্বল এই যে নারী চিত্তের মাতৃত্ব; এখানে রাগ অভিমানের কোন খেলা কিছুই যে খাটে না! এখানে সকল দোষ সকল দর্প অহঙ্কার চূর্ণ করে ভাসিয়ে দিয়ে জেগে থাকে শুধু মায়ের মাতৃত্বটা! একবার বুঝি মা বলে ডাকলে তার হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ, সমস্ত দুঃখটা, মিলিয়ে কখন যে কোথায় লুকাইয়া পড়ে তার উল্লাস, বুঝি সে নিজেই আর খুঁজেই পায় না।

তাই মাঝে মাঝে যখন প্রসাদের ঐ সন্দেহ পূর্ণ ইঙ্গিত মনের মধ্যে এক একবার উঁকি মারিত, ভাবতাম হয় ত হবেও বা! মানুষের প্রবৃত্তি কখন কোন দিকে থাকে, প্রসাদের কট যুক্তির তর্কের মাঝে তাহার নজির গুলোতে হারি মানিয়া নির্ম্মল যখন একদম তার কথার উত্তর না দিয়ে চুপ চাপ হয়ে যেত, তখন বিরক্ত চিত্তে আমিও মনটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইতাম, শুনে শুনে মনের মধ্যে ঐ ভাবের সন্দেহ থাকিলেও কোন দিনই আমি কমলকে অপচ্ছন্দ করতাম না। আসলে যখন তাকে আমার ভালোই লেগেছিল, তখন যে দুর্ব্বল নারী চিত্তের মাতৃত্বটাই ফুটে উঠত,—প্রসাদ ছেলে মানুষ তার কি বুঝবে।

কতক্ষণ কেটে ছিল জানি না, হঠাৎ জুতার শব্দে চোখ মেলতেই, দেখি সম্মুখে কমল! রৌদ্রে উত্তপ্ত মুখখানা তার আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঘামে সমস্ত দেহটাই সিক্ত।

হঠাৎ এমন ভাবে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া একটা সম্ভাষণেও সম্ভাষিত করিতে পারিলাম না! বিস্মিত দৃষ্টিটা তুলিয়া চাহিয়াছি, সে স্বেদাসক্ত মুখখানা রুমালে মুছিতে মুছিতে বলিল—এখানে ছিলুম না মা, এই আসছি, এসেই একেবারে এখানে, আপনাকে প্রণাম করতে এলুম, বলিয়া পায়ের কাছে মাথা নত করিল।

একান্ত মনে তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বলিলাম—ক-দিন না দেখে বড়ই ভাবছিলাম যে, ছেলে আমার না বলা না কওয়া হঠাৎ গেল কোথা?

কমল তার শুষ্ক মুখে খানিকটা হাসি টানিয়া আমার পায়ের গোড়ায় ঢিপ করিয়া আর একটা প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, ছিলুম না মা!

নির্মল বলিল—কোথা গেছলে হে? বিদেশে না কি?

কমল তখন জামার বোতামগুলা খুলিয়া দিয়া রুমাল শুদ্ধ হাতখানা ঘুরাইয়া দেহের নানা স্থানে মুছিতেছিল; বলিল—না বিদেশে নয়, এই কলকাতা।

বলিলাম—জামাটা খুলে ফেল না বাবা! গামছা দিয়ে গা টা বেশ করে মুছিয়ে দিই।

না মা আর দরকার নেই।—বলিয়া সে একটুখানি হাসিয়া রুমালটি পকেটে পুরিতে পুরিতে বলিল—কলকাতা জায়গাটা বেশ……

নির্মল কৃত্রিম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—সত্যি?

কমল হাসিয়া বলিল—নিছক সত্যি! কেবল একটু বেশী ভিড় এই যা! তা' হোক্, তবু এই ত ক'দিন কাটিয়ে এলাম, বেশ সুখে

কেটে গেল।··· সে এক মুহূর্ত থামিয়া আবার বলিল—এখানে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, আর দু'দিন থাকলে ক্ষেপে যেতাম—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বলিল—তা হলে তোমার মতে এই দাঁড়ায় যে, যারা এখানে বাস করে আছে এবং ক্ষেপে নি তারা তোমার চেয়ে ঢের বেশী মানুষ। কি বল?

কমল এক গাল হাসিয়া বলিল—তা আর বলতে! আমি ত ক'দিন শুধু এই কথাই ভেবেছি যে, মা'র আমার কি অসাধারণ ধৈর্য্য! এত সয়েও মা ঠিক আছেন! সত্যি বলছি মা, এ ভারি আশ্চর্য্যের কথা······

কি আশ্চর্য্য কমল?

এই আপনার কথাই বলছি মা। এই সব বিশ্রী কাণ্ডের মাঝখানে কি করে যে আপনি আছেন, তা ত আমি ভেবেই পাইনে। কিন্তু মা, এও আমি বলে দিচ্ছি, বাস এখানে করা চলতে পারে না; বেশী দিন থাকা আপনার উচিত নয়! একে ত নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজো আর্চ্চা এ সব কিছুই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'বার আশা নেই, তার উপর আবার এই সব কদর্য্য আলোচনায় থেকে থেকে মন প্রাণ দুইই কলুষিত করা! না মা, আপনি এখান থেকে চলে যান।

যে সঙ্কল্পটা ক'দিন হইতেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁক দিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশের মত আমার মনের মাঝে উঁকি মারিতেছিল, কমলের কথা শেষ না হইতেই আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা একেবারে তাহারই সমর্থন করিয়া বসিল। কিন্তু নির্ম্মল উত্তরটা শুনিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া মুখের পানে

চাহিয়া আছে জানিয়াই আমার মনে পড়িয়া গেল, এ প্রস্তাবটাই তার কাছে ব্যথার, বেদনার! নির্ম্মল এই পল্লীটির স্নিগ্ধ শ্যামলতার সঙ্গে নিখুঁত করিয়া আপনাকে মিলাইয়া দিবার এতটা প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছিল যে, এ স্থান ত্যাগ করিবার কথা উঠিলেই তাহার মনটি ভার ভার এবং মুখটি অপ্রসন্ন হইয়া যাইত বলিয়াই, আমি কমলের কথার উত্তরটা তখনি দিতে পারিলাম না। কয় মুহূর্ত্ত পরে বলিলাম—যেতে ত চাই বাবা, কিন্তু এই অভাগাদের ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হয় কমল। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কতদিনের জান ত?

কমল উত্তর দিল না দেখিয়া আমিই বলিলাম, এদের মধ্যে অনেকেই আমার সেই ছোটবেলাকার সঙ্গী, কমল।

তা বটে মা! কিন্তু কি করে এত অনাচার, অত্যাচার, কুৎসা গ্লানি সয়ে থাকতে পারবেন, তাও ত বুঝি নে মা?

ঠিক যে কথাটা আমার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, শুনিলাম, নির্ম্মল সেই কথাই বলিল। বলিল—ওহে কমল! তোমাকে যখন পেয়েছি, আর কিছুই ভাবি নে। এই তোমাকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে দিচ্ছি শোন—অতঃপর এখানে আর কোন কারণেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ঘটবে না। বুড়োটি আমার এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে জমিদারের চোখ্ খুলে গেছে, আর তার নাম নিয়ে, তাকে ভুলিয়ে তাঁর অসাধ্য সাধন করা চল্‌ছে না। ছোট খুড়োই যখন বিষহীন নাগরাজ হ'য়ে পড়লেন, তখন আর কিসের ভাবনা?

এবারে কমলের মুখ আরো শুষ্ক হইয়া গেল। নত মুখে সে ধীরে ধীরে বলিল—কিন্তু আমি ত আর এখানে থাকতে পারছি না।

সস্নেহে জিজ্ঞাসিলাম, সে কি কমল ?

কমল বলিল—না মা, আমারও আর এখানে থাকা হবে না। কলকাতায় থাকব স্থির করেছি।

একেবারে স্থির হয়ে গেছে ?

তা স্থির বৈ কি ! বাড়ীর ভাড়াটে উচ্ছেদ করে' সাজাবার গোজাবার যখন ব্যবস্থা করে—তবে এসেছি, তখন স্থির না বলি কেমন করে ?

কমল চুপ করিল। নির্ম্মল অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। সেও কথা কহিল না। আমি বলিলাম—তাই ত বাবা, তোমার ভরসাতেই এই যমপুরীতে থাকা। তুমিই যদি না রইলে আমরা আর কার ভরসাতেই বা থাকি ? কিন্তু......

কার ভরসাতে বা এসেছিল মা ?

ফিরিয়া দেখি প্রসাদ !

প্রসাদ দ্বারের বাহিরে বসিয়া ছুরীর সাহায্যে একটা শুষ্ক কঞ্চি ছুলিতেছিল। কথা কয়টি বলিয়া সে আপন মনে কায করিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসিলাম—কি বলছিস্ প্রসাদ ?

প্রসাদের চক্ষুলজ্জা বলিয়া কোন একটা জিনিষ ছিল না। অথচ সেটার দরকার যে মাঝে মাঝে সংসারে বাস করিতে গেলে প্রায়ই হইয়া থাকে, এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন যে সেদিকে নজর দিত না, জানি না। চট্ করিয়া বলিয়া বসিল—যখন এখানে এসেছিলে তখন ত কেবল আপনাদেরই ভরসা করে এসেছিলে। তখন ত এখানকার কাউকে চিন্তেও না।

অই 'কাউকে' যে কে—বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। দৃষ্টিটাকে

যতদুর সম্ভব বিরক্তিপূর্ণ ও ক্ষুদ্র করিয়া চাহিতেই দেখি, কমলের অমন রক্তাভ সুন্দর মুখখানি একেবারে শ্বেত বিবর্ণ হইয়া গেছে। ক্ষিতিতলন্যস্ত নেত্রে সে নীরবে বসিয়া!

প্রসাদের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু ভৎর্সনার স্বরে কহিলাম —তোদের কি বল্! অর্দ্ধেক দিন তো তোরা থাকিস্-ই না। এই সব অত্যাচার অনাচার হবে—আমাকে শুনতে হ'বে, দেখতে হ'বে—আমার পরকালের কাজ কর্ম্ম চুলোয় যাক্—আমি ঐ করি!

প্রসাদ আর একটি কথাও বলিল না। তবে সে-যে আমার মৃদু ভৎর্সনাতেই উদ্যত রসনা সংযত করিয়া ফেলিয়াছে বুঝিয়া, মনের মধ্যে আরাম অনুভূত হইতে লাগিল। বলিলাম, তুমি ঠিক বলেছ বাবা কমল! জমিদার-শূন্য গ্রামে বাস করার চেয়ে অধর্ম্ম আর নেই। কিন্তু এ-যে ভাবতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বাবা, যে, এই স্বল্প ক'দিনের শান্তির পরই আবার গ্রামটা অরাজক হ'য়ে উঠ্‌বে! আবার অসহায়ের আর্ত্তনাদ, বিধবার ক্রন্দন, আবার সেই সব......

কমল কথাগুলায় বোধ করি বড়ই ব্যথা পাইল, বলিয়া উঠিল—আমি কি করতে পারি বলুন মা!

পুত্র না হইয়াও গর্ভজাত সন্তানের মতই মায়ের কাছে কর্ত্তব্য জানিতে চাহিল, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার মত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে মনে কেবল জগৎ পিতার নিকট তাহার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, বাবা, তোমার কর্ত্তব্য—তুমি করবে! এরা ত তোমার সন্তান, এদের মঙ্গল অমঙ্গল ত তোমাকেই দেখতে হ'বে। এরা যাতে সুখী হয়, এদের যাতে কষ্ট ঘোচে—সবই তোমায় করতে হ'বে। তুমি যদি সহরে

গিয়ে এদের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য তা ভুলে যাও, সে ত মহা অন্যায় হ'বে বাবা। তাই আমি বলি কি, তোমার উচিত, এমন একজন লোক রেখে যাওয়া, যে ঠিক তোমার মতন করেই তোমার প্রজাদের পিতার মত হ'য়ে জমিদারী চালায় এমন একজন লোক থাক্‌লে ..

তেমন লোক যে পাওয়া যায় না। আমি অনেক চেষ্টা দেখেছি। ·· আচ্ছা, আমি তা হ'লে এখন উঠি— আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। তবে আমার মনে হয় এ গ্রামে বাস করা আর কোন ভদ্রলোকেরই উচিত নয়। দিন দিন যা হ'য়ে উঠছে, ছিঃ ছিঃ—সঙ্কুচিত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমল ছড়িটা বার দুই মাটিতে ঠুকিয়া পুনশ্চ কহিল—ক'টা দিন ছিলাম না, তারই মধ্যে কত কাণ্ড হ'য়ে গেল!

আবার কি ?— নির্ম্মল জিজ্ঞাসিল। আমরা তিন জনেই কমলের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

কমল কুণ্ঠিতস্বরে কহিল—ঐ রমণ নাপতের একটা বৌ ছিল, জানেন কি ? ক'দিন থেকে তা'কে আর দেখা যাচ্ছে না!

নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিল—কমল, ছোট খুড়ো.

এখন কিছুই বল্‌তে পারিনে। ষ্টেশনে নেমেই শুন্‌লাম শুধু! শুধু তাই নয়, হরি রক্ষিতের আই বুড়ো মেয়েটা...

আমি আর পারিলাম না। মানুষের সহ্য করিবার ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। অনেক দিন হইতেই নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনীগুলি আমার সীমার রেখা স্পর্শ করিয়াই ছিল, আজ এই মুহূর্ত্তে এই কথায় একেবারে ধৈর্য্য হারা হইয়া পড়িয়া বলিলাম - কমল। তবু তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও ?

কণ্ঠস্বরটা যে অত্যন্ত রুক্ষ পরুষ হইয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কমলকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সেটা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিয়াই মাতৃ হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু তার চেয়েও এই অভাগা দেশের দুস্থ দুর্ভাগ্য-পীড়িতদের ব্যথা বুকের মধ্যে উষ্ণ দুধের মত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল, কমলকে স্নেহ জানাইবার কোন সুযোগ মিলিল না। তবে স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া বলিলাম—তোমার উচিত নয় বাবা

কমল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—আমি জানি মা! কিন্তু আর আমি পারছিনে! বলিয়া সে ওদিকে মুখ ফিরাইল।

তাহার দুঃখক্লিষ্ট হতাশার স্বরটি এত বেশী করিয়াই আমার বুকে বাজিয়াছিল যে, আমি আর অনেকক্ষণ একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছিল, এই যে থাকিতে পারিবে না এবং এই যে অত্যাচার অনাচার বাড়িয়া যাইবে, ইহা কল্পনা করিয়া এই ছেলেটী সুখী নয়, তাই সে আমাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নির্ম্মল বলিল—সত্যি তা হ'লে যাচ্ছ কমল?

কমল এ দিকে না চাহিয়াই বলিল—হ্যাঁ যাচ্ছি।

নির্ম্মল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দিদি...

তাহার কথা শেষ না হইতেই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তাই ত ভাই, আর ত কোন ভারসাই দেখিনে।

প্রসাদ বাহিরেই ছিল, বলিয়া উঠিল, মামা, তোমাদের যেতে ইচ্ছে হয় যেতে পার, আমি যাচ্ছিনে সে নিশ্চয় জেনো। বলিয়া সে থামিল। একবার তীব্র দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিয়া লইয়া আবার বলিল—এই

ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই মামা, যে ঠিক যে সময়টিতে মানুষের একটা কাজ করবার সুযোগ এসে পড়ে, ঠিক সেই সময়ই সে পিছিয়ে যায়। অথচ কাজ করব করব করে বুক চাপড়ানী, সে সাজ সজাই বা কত! . ধিক্!

প্রসাদ বাহির হইয়া যাইতেই কমল নির্ম্মলকে বলিল—আমি হয় ত কালই চলে যাব। যদি পার একবার দেখা করো। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলিল—করব।

আমার পায়ের কাছে মাথাটা একবার ঠক্ করিয়া ঠুকিয়া কমল কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেল! নির্ম্মল বোধ হয় তাহাকে খানিক দুর আগাইয়া দিতেই তাহার সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল। একা ঘরে বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম কোন দিক ধরি? কোন চিন্তা করিবার আগে ভাগে হৃদয় আমার তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া দিল, প্রসাদ যাহা বলিয়াছে তাহাই একমাত্র পথ! সেইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব অপেক্ষা করিয়া আছে এবং সে ছাড়া যে পথ নাই!—অপথ আছে!

প্রসাদের কথা

আমি যাব না, যাব না, যাব না! এদেশ ছেড়ে, এদের ফেলে কোথাও যাব না, যেতে পারব না। মা যান, মামা যান, আমি থেকেই যাব। আমার যাওয়া হ'বে না! আমার কেমন মনে হয়, হঠাৎ আমাদের গ্রাম ছাড়া কর্বার এই যে বিরাট চেষ্টা কমলের মনে জেগে উঠেছে, তার নিশ্চয়ই এমন কোন গূঢ় কারণ আছে, যা সাধারণ লোকে কেউ-ই ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি, সে যে দেশ ছেড়ে কলকাতায়—এমন সব মজাদার আমোদ প্রমোদ ছেড়ে সহরে গিয়ে উঠবে, এ হতেই পারে না। এটি একটি চাল; আর হয় ত সেই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই এই রকম একটা চালের প্রয়োজন তার হ'য়েছে। কি যে চাল এবং কি উদ্দেশ্যেই যে সেটার অভিনয় করা হচ্ছে, তা আমি জানি নে—কিন্তু একদিন তা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে বলেই আমার ধ্রুব ধারণা।

আজ সকালে মা'কে বলে দিয়েছি, যেতে হয় তাঁরা যান, আমি যাব না, যেতে পারব না। কেন পারব না তা বলিনি, বলতে পারিনি—কারণটা তখন পর্য্যন্ত নিজেই জানি নি। মানুষের মনের মধ্যেও এমন কতকগুলো গোপন বৃত্তান্ত থাকে যে, মানুষ অনেক সময়ে নিজেই তা জান্তে পারে না। আমিও জানতাম না। তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দেখেই যে আমার মনটা এ-রকম হ'য়ে গিয়েছিল তা নয়! কিন্তু সে যে সেই বার দুই বিহ্বল দৃষ্টিটা ফেলে—যে তার বিপদের সময় তারই হিতচেষ্টায় অনেকখানি করেছে, তাকে লক্ষ্য করেছিল বলেই আমার মনটা এমন হ'য়ে উঠেছিল, তাও নয়। তবে

হ'য়েছিল! কি হ'য়েছিল জানিনে, কেন হয়েছিল বল্‌তে পারি নে, তবে প্রাণের মধ্যে কষ্ট অনুভব করেছিলাম। আর এ ক'দিন ধরে যখনই মনে পড়েছে যে তার আত্মীয়জন তাকে ত্যাগ করেছে, কদিনই সে সেই গোয়াল ঘরখানার এক কোণে না খাওয়া না দাওয়া পড়ে পড়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, তখনই আমার চক্ষের উপর ভেসে উঠেছে সেই করুণ চোখ দু'টি, সেই অসহায়, আর্ত্তের ব্যথা-ক্ষুব্ধ মুখখানি! আর জলে দু'টি চক্ষু ভরে গেছে।

আজ যদি আমার আঁকা এই ছবিটা গয়লা বৌ দেখতে পায়, সে চমকে যাবে তখন আমি তাকে এমন ক'রে দাঁড় করিয়ে এই প্রতিকৃতি তার তুলে নিয়েছি! সে হয় ত বুঝবে না যে আমার বুকের মাঝখানে বেদনার রঙে, ব্যথার তুলিতে যে ছবিটা আমার মন তুলে নিতে পেরেছিল, সেই এক মুহূর্ত্তে—এটা তারই নকল মাত্র।

৬

লেখক—শ্রীঅজয়কুমার সেন

প্রসাদের মার কথা

তাই ত কি করি—কমল কেন এমন অসময়ে এই বিপুল বিপদের মাঝখান থেকে হঠাৎ চলে যেতে চায়? এর মধ্যে কোন কারণ নেই ত? এ সব কথা ছেলের বিরুদ্ধে ভাবতেও যে কষ্ট হয়! যাকে নিজ-সন্তানের মত কোরে দেখ্ছি—যার সুকুমার কান্তি এবং স্নিগ্ধ-নেত্র-পল্লবদ্বয় দেখ্‌লে এই গ্লানিভরা মন ও শরীর এক নিমেষে জুড়িয়ে যায়—তার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের বিরুদ্ধভাব পোষণ করা ভারী অন্যায় ও অশোভন! তবে এখন কি করি? চারিদিকে যে সব বিষাক্ত বাতাস মেঘের মত স্তরে স্তরে জমাট বাঁধ্‌তে আরম্ভ করেছে—তা' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দেখ্‌ছি এক মহাদায়!

কমল দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে—তার আর এই আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ স্থান ভাল লাগ্‌ছে না—সে দিনকে দিন হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে। কমলের এই সব কথা কি সবই সত্য—না এর মধ্যে খুড়োমশায়ের কোন গূঢ় চাল আছে। আমি মেয়ে মানুষ—একলা কতদিক আর দেখ্‌ব?

কমল যখন বল্‌ল, কলকাতায় থাক্‌ব স্থির করেছি—তখন আমি যেন কি রকমের হয়ে গেলাম। এই যে বিরাট গগনভেদী আর্ত্তনাদ গ্রামের মধ্যে

দিন্‌কে দিন উঠ্‌তে আরম্ভ কোরেছে—এর একটা বিধি-ব্যবস্থা না কোরেই সে চলে যাবে? আমরা আব কতদিক থেকে তা' রক্ষা কোর্‌ব? গ্রামের জমিদার যদি শাসকের আসন না নেয়—তা'হলে দেশ যে উচ্ছন্নর দিকে চল্‌তেই থাক্‌বে। এ থেকে কি রক্ষা পাওয়া যায় না?

প্রসাদের কথা আমার মনের মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধেছে। যে সব গ্লানি মনের মধ্যে স্তুপাকার হয়ে উঠ্‌ছিল; সে সব ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হোয়ে গেল। সে যখন আমাকে উদ্দেশ করে বল্‌ল, তোমাদের যেতে ইচ্ছা হয়—যেতে পার, আমি যাচ্চিনে, সে নিশ্চয় জেনো—তার এই দৃঢ়তাপূর্ণ কথা শুনে অবধি আমার মন তারই দিকে আকৃষ্ট হোয়ে পড়েছে। তাই ত বলি—আমার পুত্রের কথা এই রকমের হওয়া চাই। যখন সমূহ বিপদ এসে দুয়ারে দাঁড়ায়, তখন যদি কেউ তা' থেকে পেছ-পাও হোয়ে যায়— তা' হলে তার চরিত্রের বিকাশ হবে কি কোরে? প্রসাদ আমার মানুষের মতন মানুষ! তার প্রাণ যে এমন মুক্ত ও উদার এবং সহানুভূতিপূর্ণ, তা ত আগে জানতাম না;—যতই তার তেজোপূর্ণ কথা শুন্‌ছি আর ভাবছি, ততই যেন আমার মন পুত্র স্নেহে দোদুল হোয়ে উঠ্‌ছে। এমন পুত্রকেও গর্ভে ধারণ করা সফল, বাবা দেশের জন্য, সমাজের জন্য, নিয্যাতিতা ও উৎপীড়িতাদিগের উদ্ধার করবার জন্য বদ্ধপরিকর। আমার প্রসাদের মতন যদি দু'টা কোরে ছেলে প্রত্যেক গ্রাম থেকে জেগে ওঠে, তা'হলে এই সোণার বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ হোয়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে, এ কথা আমি হলপ্‌ কোরে বল্‌তে পারি।

আজকাল দেশ-প্রীতির যে একটা বিরাট, বিপুল ঢেউ দেশের মধ্যে জেগে উঠেছে—এতে নারী-সমাজ শিক্ষিত-সমাজ এবং অন্যান্য সমাজের লোকেরা বিস্ময়ে চকিত হোয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে।

দেশে বন্যা এলে গ্রামে গ্রামে যেমন বিরাট ক্রন্দনের রোল উঠে অসীম আকাশকে ছাপিয়ে দেয়—তেমনি এই ঢেউএ সমস্ত সমাজের লোক বিশুদ্ধ হোয়ে যাবে। এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এটা আমার প্রাণের কথা—মনের কথা, এ নিষ্ফল হ'বার যো নেই।

কমলের কলকাতায় চলে যাবার কথা শুনে নির্ম্মল যেন কি রকমের হতাশ হোয়ে পড়েছে; কিন্তু প্রসাদ—সে আছে অটল, অচল, হিমাদ্রির মত স্থির, ধীর, শান্ত।

আমি কেবলই শুনতে পাচ্ছি—প্রসাদের কণ্ঠে সেই বিরাট ভৈরাট ধ্বনি। নির্ম্মলকেও আমি উত্তেজিত কোরে তুলব। কমল যায় একান্ত যাক্, কিন্তু নির্ম্মলের যাওয়া হ'বে না! একা প্রসাদ পারবে না,—নির্ম্মলকেও চাই! আবার ভাবছি, নির্ম্মল যে সেই কমলকেই তার সব কাজের মধ্যে শিরা, মেরুদণ্ড ভেবে রেখেছিল, তার বিহনে তার উৎসাহ, উদ্যম, শক্তি থাকবে ত? সে যে এখন থেকে সব আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে বম্ ভোলানাথ হ'য়ে বসে গেছে! আবার তা'কে রুদ্র মহেশ্বর করে' জাগিয়ে নিতে পারব না! আবার ত্রিশূল নিয়ে ক্ষেপা ভোলা যদি না দাঁড়ায়, আমাদের কাজ যে মধ্য পথেই আটকা পড়ে গেলো!—সেই ত ভাবনা!

কমলের কথা শুনে মন যেন আরও দমে গেল। একটার কুল-কিনারা শেষ হোতে না হোতেই—আবার ছুটো! যদি এমনি কোরেই দেশের মধ্যে প্রবল অত্যাচার ও অনাচার হোতে থাকে, তা' হলে সমাজ কি কেবল চুপ কোরে নাকে তেল দিয়েই ঘুমুবে। তার সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কি আর ভাঙ্গবে না? যদি তাই-ই হয়—তবে আর এ সমাজের দরকার কি, এ সমাজের থাকাতেও যা ফল, না থাকাতেও সেই ফল।

আমার কিন্তু মনে হয়, খুড়োমশায়ের এই সব কাজ। কারণ নির্ম্মলের হাতে বিষম নিগ্রহ ভোগ করার পর থেকে—তাঁর মন আরও উত্তেজিত হোয়ে উঠেছে। আবার এও মনে হয়—খুড়োমশায় একা আর কি কোর-বেন—তাঁর সে ক্ষমতাই বা কোথায়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন একজন নায়ক আছেই আছে—তা' না হোলে এমন বিসদৃশ একটা কাণ্ড ঘট্‌তেই পারে না।

এই সব বিরাট দুঃখের কাহিনী আপন মনে নিভৃতে বসে বসে ভাবছি, এমন সময় রুক্ষবেশে গয়লা-বৌ এসে হাজির হোল। এ কয়দিন তাকে না দেখে এখন আর চেন্‌বার উপায় পর্য্যন্তও নেই। এমন সুশ্রী ও সুগঠিত গঠন কালীবর্ণ হোয়ে গিয়েছে দেখে—আমার মনের মধ্যে যেন কি রকম কোরে উঠলো। ওমা—এই কি আমাদের সেই গয়লা-বৌ না কি? এ কথা মনে আন্‌তেও যে দুঃখ হয়—সবই অদৃষ্টের ফল!

অতি দুঃখেই বল্‌লাম, ও বউ—বোস্, দাঁড়িয়ে রইছিস্ কেন; কিছু কি বল্‌বার আছে?

গয়লা বৌ ফুঁপিয়েই বল্‌লে,—আমার আজ দু'দিন ধরে কিছু খাওয়া হয় নি পিসিমা। বাড়ী থেকে তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই নিদারুণ কথা শুনে আমার মন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের মত সহসা চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লাম,—বউ, আমাকে কেন এ কথা জানাস্ নি?

গয়লা-বৌ কেঁদে বলে উঠ্‌ল, জানিয়ে আর কি হবে পিসিমা! এই বলে কিছুকাল চুপ কোরে থেকে আবার বল্‌লে, আমি ভাব্‌ছি—এ পোড়া প্রাণ আর রাখ্‌বো না।

গয়লা-বৌএর এই দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত কথা শুনে আমি অত্যন্তই দমে' গেলাম—আগে থেকেই আমি জান্‌তাম যে এই রকমের একটা কাণ্ড হবে গয়লা-বৌকে নিয়ে। বল্‌লাম—তারা কি বলেছে ?

তারা আর কি বল্‌বে পিসিমা ? এই বলে কিছুকাল চুপ কোরে থেকে গয়লা-বৌ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, তারা বলে, এই যে একরাত্রি তুমি জমিদারের বাগানে আটক ছিলে—তখন তারা তোমায় নিয়ে কি কোরে'ছল না কোরেছিল—তা' আমরা বুঝ্‌বো কেমন কোরে ? তারা যে তোমাকে বেইজ্জৎ করেনি—তারই বা এমন প্রমাণ কি ? এই কথা কয়টি বলে গয়লা-বৌ মাথা হেঁট কোরে রইল—তার চক্ষু দিয়ে শ্রাবণের অজস্র ধারা অঝোরে ঝর্‌তে লাগ্‌ল।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লাম, বউ আর কাঁদিস্‌ নি—তোর অদৃষ্টে ছিল তাই আজ এমন হোল। গয়লা-বৌএর কথা শুনে যারা এই রকমের কথা বলে, তাদের ওপর বিষম রাগ হোল। বলি, এই রকমের কাণ্ড তাদের কোন এক ঘরের ছেলে কর্‌ত, তা'হলে কি তারা তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিত, না আদর কোরে ঘরে তুলে নিত ? এ ত তাদেরই ঘরের বৌ—আপনার জন। এ মেয়ে মানুষ—প্রমাণ কোথা থেকে পাবে ? যদিও বা সে তার চরিত্রের দোষ প্রমাণ দিয়ে স্খালন করতে চায়—তা'হলে তোমরা তাকে অসতী বলে উড়িয়ে দেবে। তোমরা যে প্রবল—তোমাদের উদ্যত হস্ত দুর্ব্বলের উপর যে সদাই ন্যস্ত—এ কি আমরা জানি না বা বুঝি না ?

আচ্ছা, আমরা কি চিরকালই প্রবলের অসহ্য অত্যাচার নির্ব্বিঘ্নে সহ্য কোরেই আসব ; আমাদের কি জেগে উঠ্‌বার কোনই ক্ষমতাই নাই—এতই কি আমরা নির্জ্জীব ? আমরা যদি না জাগি—এ পোড়া সমাজ

যে দিন্‌কে দিন নির্ম্মম ও কঠোর হোয়ে উঠ্‌বে। কেন সমাজের একমাত্র অধীশ্বর হোয়ে থাকবে পুরুষেরা—আর আমরা কি কেউ নই? আমাদের কি কোন বিচার করবার ক্ষমতা ভগবান দেন নাই—আমরা কি গার্গী, খনা প্রভৃতি আর্য্য মহিলার বংশধর নই? ভগবানের এই সুন্দর রাজ্যে পুরুষের নৃশংস অত্যাচার কি সমান ভাবেই চল্‌বে—এব কি বাধা দিবার কোন উপায় নেই—হা ভগবান!

যখন এই সব কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছি, এমন সময় প্রসাদ "মা" বলে কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে প্রসন্ন মূর্ত্তিতে দেখে আমার সর্ব্ব-শরীর জুড়িয়ে গেল—প্রাণে একটা স্বস্তির বাতাস পেলাম।

হঠাৎ গয়লা-বৌকে বসে থাক্‌তে দেখে চম্‌কে গিয়ে প্রসাদ ফিরলো। কি বল্‌তে এসেছিল না জানিয়েই চলে যেতে উদ্যত দেখে জিজ্ঞাসা করলুম —কি বাবা?

প্রসাদ অতি কষ্টে বল্লে—কি খবর মা?

খবর আছে বাবা!—যা শুনেছি, বল্লুম।

প্রসাদ বল্লে—গয়লা বৌ বলেছে?

হাঁ বাবা, তার মুখেই এ কথা শুনেছি। এই বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম উত্তরের প্রতীক্ষায়।

মুখখানাকে ধীরে ধীরে মাটী থেকে তুলে নিয়ে বললে, এখন কি কোর্‌বে মা গয়লা-বৌকে নিয়ে? তাকে ত তারা· ··

তুই-ই বল্ না প্রসাদ কি করি?

কিছুকাল গুম্ হোয়ে বসে থাক্‌বার পর, প্রসাদ বললে, আমি একবার গয়লা পাড়ায় যাব মনে মনে ঠিক কোরেছি—দেখি গিয়ে কিছু কোর্‌তে

পারি কি না। এই বলে সে মুখখানিকে আষাঢ়ের জল-ভার-মন্থর মেঘের মতন করে নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রসাদকে গম্ভীর-মূর্ত্তিতে চলে যেতে দেখে—আমার প্রাণ শঙ্কাকুল হোয়ে উঠ্‌লো।

পরক্ষণেই গয়লা-বৌ কাতরস্বরে বল্‌লে, পিসিমা, ওঁকে বারণ করুন ও পাড়ায় যেতে। কি জানি ছোট জেতের লোক—শেষকালে কি তারা কিছু করে বোসবে, তারা গোঁয়ার—বুদ্ধি-সুদ্ধি বড়ই কম।

বৌকে আশ্বস্ত করে বললাম, বউ, তোকে ওর জন্যে কিছুই ভাব্‌তে হবে না—আমার কি সেই ছেলে প্রসাদ যে, যেখানে সেখানে গিয়ে হাঙ্গাম-হুজ্জুক বাধাবে। তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি কিছু কোর্‌তে পারে—তা দেখুক না কেন বৌ?

তারা এমন লোকই নয় যে কথা শুন্‌বে—ভারী গোঁয়ার মা, ভারী গোঁয়ার। মূর্খ রাগী লোক তারা পিসিমা।

অনেক বেলা হোতে চল্লো দেখে, গয়লা-বৌকে বল্লুম, যা বৌ তেল মেখে ঘাট থেকে নেয়ে আয়—আজ আমাদের এখানে···

গয়লা-বৌএর মুখে প্রসন্ন হাসি দেখে আমার মন আনন্দে দোদুল হোয়ে উঠ্‌ল।

অনেককাল পরে আমিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

প্রসাদের কথা

গয়লা-বৌকে মার কাছে বসে থাকতে দেখে, আমার প্রাণের মধ্যে এক বিষম দোলা লাগ্‌ছিল। না জানি—কত দুঃখের কাহিনী সে কেঁদে কেঁদে মাকে বল্‌ছিল। এই যে নির্য্যাতিতা নারী সমাজ থেকে তাড়িতা হোল, এর এখন উপায় কি? এ এখন যায়-ই বা কোথায়? সমাজের কর্ত্তারা কি কেবল নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে—আর বিপদের সময় সকলে মিলে ঘোঁট্ পাকাবে—যাতে তার অনিষ্ট হয়। বলিহারী—সমাজের ব্যবস্থা!

কমল কেমন সাদা কথায় মাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল—কি করে এত অত্যাচার, অনাচার, কুৎসা, গ্লানি সয়ে থাকতে পার্‌বেন; তা ও ত বুঝিনে মা?

আমার মার অন্তঃকরণ বলে যে জিনিষটা আছে সেটা বড়ই সাদা। তিনিও কমলের সব কথাই সাদা ভাবেই বুঝ্‌লেন। তিনি বুঝুন, কিন্তু আমি—আমি ত সাদা কথায় বুঝ্‌বার ছেলে নই যে সাদা কথায় ভুল্‌বো? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কমলের কোন কারসাজি আছেই আছে; না হোলে কাউকে না বলে-কোয়ে হঠাৎ ক'লকাতায় চলে গেলই বা কেন, আর ফিরে এসেই ভাল মানুষটির মতন বলে কি না—আমার ত আর এখানে থাকা হবে না। কলকাতায় থাক্‌ব স্থির করেছি। এ হোচ্ছে বিরাট এক অভিযানের পূর্ব্বসূচনা মাত্র।

মাকে অনেক কোরে বলে-কোয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানেই থাক্‌ব তার ঠিক্ করেছি। দেখি কিছু কোর্‌তে পারি কি না।

গয়লা পাড়ায় গিয়ে কোনই ফল হোল না কেবল বচসা করাই সার হোল মাত্র। তারা বলে কিনা—গয়লা-বৌ জমিদারের ভোগ্যা পত্নী। এত বড় একটা মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনে আমার মন অত্যন্তই দমে গেল। তাদের কথার জবাব মাথামুণ্ডু আর কি দেব। যতই তাদের বুঝাবার চেষ্টা করি না কেন, ততই তারা অবুঝ হোয়ে বসে। এই ত হোল তাদের অবস্থা। ছোটলোক কি না—কত টুকুই বা তাদের শিক্ষা।

কলকাতা থেকে কমল এসে বস্‌লে, রমণ নাপতের বৌ আর হরি রক্ষিতের আইবুড়ো মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সব দিন্‌কে দিন হোতে চল্‌ল কি ? এটা কি অবাজকের রাজত্ব হোয়ে পড়্‌ল না কি ? তা হবেও বা। শেষকালে হয়ত' আমিও একদিন কোথায় অদৃশ্য হোয়ে যাব।

আচ্ছা, যত খবরই কি কেবল ঠাকুর্দ্দা ও কমলের কাছেই আসে। যারা ঐ সব খবর দেয়—তারা কি আর ঐ দুটো শয়তান ছাড়া অন্য লোক খুঁজে পায় না ? এ ত বড় আশ্চর্য্য ! এর কি কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় না ? ব্যবস্থা ত কোর্‌ব—কিন্তু কাকে নিয়ে ? সবাই ত কমলের মত লোক— বিশ্বাস করি কাকে ?

মা যেন মেয়েলি বুদ্ধিতে কমলকে বিশ্বাস কোরে ফেলেছেন—আমি ত তাকে চিনি। কমল কি কম ধড়িবাজ—সে এক মস্ত খেলোয়াড়। কলকাতায় যে বাসা করা হোল—সেটা হবে তার লীলাভূমি। এ আর আমি বুঝি না—এতই অবুঝ আছি ! সে ছেলে আমাকে পাওনি চাঁদ !

এই যে রমণ নাপতের বৌ, আর হরি রক্ষিতের বিবাহযোগ্যা মেয়েটাকে

পাওয়া যাচ্ছে না—এটা কি তাদের দ্বারা হয় নি ? নিশ্চয়ই তারা এর মধ্যে আছেই আছে—নচেৎ আস্ত জল-জ্যান্ত ছুটো মেয়ে মানুষ ঘর থেকে দিন-ছুপুরে উধাও হোয়ে যায় ? আমাকে কি এতই বোকা ঠাওরেছে তারা, যে, যা তা দিয়ে বুঝিয়ে দিবে, তখনই তা' সব জলের মতন বুঝে যাব ?

আমি মনে মনে যা ঠাওরেছি তাই-ই ঠিক। এ গ্রাম থেকে একবার আমাদের তাড়াতে পার্‌লে, ওদের কার্য্য-সিদ্ধির পথে কোন ব্যাঘাতই ঘোট্‌বে না। তা কি হয়—রাখে হরি মারে কে ?

এই সব বিচ্ছিন্ন চিন্তার মাঝখান দিয়ে যখন মন্থরপদে চল্‌ছি, এমন সময় মা ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, ওরে প্রসাদ, কি কোর্‌ছিস্‌ বাবা একলা ঘরে বসে ?

চম্‌কে গিয়ে বল্‌লাম, কি আর করব মা—এমনিই বসে আছি।

মা গয়লা-বৌএব ছবিখানা দেখে ফেলেছেন না কি—তা' হলে ত বড়ই কেলেঙ্কারীর কথা ? কি করি এবং কোথায়ই বা এ খানাকে রাখি। এ যে আমার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা। হৃদয়ের রক্ত তিল তিল কোরে দিয়ে তবে এই অশ্রুপ্লাবিতা ও উৎপীড়িতা নারীর ছবিখানা এঁকেছি। এত ছবি নয়—এ যে গয়লা-বৌএর হুবহু নকল মাত্র।

যখনই গয়লা-বৌএর অশ্রুবিচলিত-নয়ন মুখখানির কথা মনে পড়ে, তখন আমার মনের মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের মতন তীব্র জ্বালার উদয় হয়। হায় অভাগিনী, সমাজতাড়িতা, পরপদলাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতা নারী—তোমাদের পাদস্পর্শে কি ধরণী জেগে উঠ্‌বে না—তোমরা কি কেবলই ধর্ষণের মধ্য দিয়েই তোমাদের জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাবে—তোমরা কি জাগ্‌বে না—তোমরা না জাগ্‌লে এ বাংলাদেশ পুড়ে ছাই হোয়ে যাবে।

অনেকদিনের পর ছবিখানাকে নিয়ে বসেছিলুম, আঁকতে নয়, ভাবতে। যে এত কাছে, দিন রাত মায়ের পাশে এই ঘরেরই একটি বধূর মত আছে,—যাকে চোখে দেখ্‌ছি, তার ছবিটা অসম্পূর্ণ রাখ্‌লেও চল্‌ত। কিন্তু তার ছবি অসম্পূর্ণ রাখা চলে না, যার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখবার জন্যে নিয়ত অন্তরের মাঝখানে একটা আকুলতা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল। সে ত গয়লা বৌ নয়, সে কোন নারী, সমাজ পরিত্যক্তা, গৃহ বিতাড়িতা, লাঞ্ছিতা, পরগৃহাশ্রিতা নারী! ইদানীং গয়লা বৌ-এর চোখ শুষ্কই থাকৃতো; কিন্তু আমার মনের পাতায় তার যে দু'টি চোখ সে দু'টি দেখি, সততই জল-ভরা পদ্মের মত! আজ কাল মা'র-কথাবার্ত্তায় সে একটু আধটু হাসে দেখতে পাই। কিন্তু আমার মনে যে একখানি তার ফোটো আছে, সেই ফোটোর মুখে আমি হাসি খুঁজে পাই নে। ব্যথায় ভরা, বেদনায় ম্লান, আর্ত্ত, আর্দ্র! চোখের সামনে তা'কে অল্পই দেখ্‌তে পাই, যেদিকে থাকে সে, যেতে পারি নে, যেতে চাই—অথবা চাই-নে ঠিক বুঝি নে, যাই না। যাওয়াটা যেন দোষের নয়, তবুও দোষের; চাওয়াটা অসঙ্গত নয়, তবু যেন সঙ্গত নয়—এমনি মনে হয়। অথচ তা'কে না দেখেও থাকৃতে পারি না, তাই আমাকে নির্ভর করতে হয় আমার মনটির উপরে—যেখানে তার ছবি নিখুঁত করে এঁকে গেছে—এঁকেছে কে—কে জানে! সেই ছবিটা থেকেই এই ছবিটা আঁকৃছি। ছবিটা শেষ হ'লে যেন বাঁচি। প্রতি কথায়. প্রতি মুহূর্ত্তে আর মন হাঁতড়াতে পারি নে, এই ছবিটা দেখেই কাটাতে পারি।

তুলিটা ধুয়ে প্লেটে গোলা রঙে ঘস্‌তে ঘস্‌তে মুখ তুলেছি, দেখি, আম-বাগানের মাঝের সরু পথটি দিয়ে সিক্ত বসনে, সিক্ত কেশে, কলস কক্ষে সে-ই আস্‌ছে। তখনো অনেক দূরে ছিল, আমাকে সে দেখতে পায় নি,

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে আপন ভরে আসছে—আমি জানি—না, জানি—না কেন জানি, অন্যায়—তবুও পারলুম না সেটুকু লোভ সম্বরণ করতে—সিক্ত বসন স্নেহে আদরে তা'কে এমন করে বেষ্টন করে আছে, এমন আত্মহারা হ'য়ে তারই সঙ্গে আত্ম গোপন করেছে না দেখে আমাব এত কালের তুলি ধরাই বৃথা মনে হ'ল। চকিতে বিফল চিত্র-খানার দিকে চেয়ে চোখ তুলেছি, গয়লা বৌর চোখ মিলে গেলো!—তখনি বঙ্গ রমণীর স্বভাবসিদ্ধ সে কি সুগভীর লজ্জায় তার দেহটি কেঁপে উঠ্‌লো যে আমারই চোখ মুদে এলো! অপকর্ম্মটা যে কত বড়, ঠিক তখনই বুঝ্‌তে পারলুম, যখন গয়লা বৌ কলস নামিয়ে আপন বসন ঠিক ক'রে নিয়ে, অবগুণ্ঠন আব একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার অগ্রসর হ'তে লাগলো।

কি ভাবলে আমায়—কে জানে, মোড়াটা ঘোরবার আগে আর একবার সেই দৃষ্টিটা তুলে আমাকে দেখে চলে গেলো।

অপকর্ম্ম যত বড়ই হোক্; তাব জন্য যতখানি পাপই আমার ভাগ্যে সঞ্চিত হয়ে থাক্, তখন আমার সে কথা আর মনে রইল না। আমার মনে শত উজ্জল দৃশ্যের মত সেই চোখ দু'টিই ভাস্‌তে লাগলো, আর মনে হতে লাগলো যে, যা'কে দেখে সর্ব্বস্ব দান করে নিঃস্ব হ'তে ইচ্ছা হয়, তারই সর্ব্বনাশ করতে পারে যারা, তারা কত বড় হৃদয়হীন, কত বড় অমানুষ!

৭

লেখিকা—শ্রীলীলাদেবী

প্রসাদের মার কথা

গয়লা বৌকে স্নান ক'রতে পাঠিয়ে দিয়ে, নিত্য পূজার খানিকটা সেরে মনে হ'ল প্রসাদ কেন আজ এখনও আমার জল খাওয়ার তাড়া ক'রতে পূজার ঘরের চারধারে তার সেই ভক্তি আপ্লুত চক্ষু দুটীর আবেদন জানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না? তার আবদারে পূজো ছেড়ে উঠ্‌তেই হয়; সাম্‌নে ব'সে আমায় জল খাইয়ে তবে সে ছাড়ে। অন্যদিন তার জন্যে কত বিরক্ত হই। সংসারের মোহ, ছেলের মায়া, একমনে ঈশ্বর আরাধনার বাধা, এই সব ভাবি, আর স্নেহ পূর্ণ বিরক্তিতে ছেলেকে ধমক দিই। সে এক অপূর্ব্ব ভর্ৎসনা ও ভালবাসা, আনন্দ ও মিনতির ব্যাপার! আমার বকুনি খেয়ে প্রসাদের প্রশান্ত ওষ্ঠ বেয়ে কি সরল হাসির রেখাই না ফুটে ওঠে! তখন আমার মনে হয় যেন আমার সেই ২০ বছর আগের ৬ বৎসরের শিশুটী। যে পূজার ব্যাঘাতে অন্যদিন বিরক্ত হই, আজ কিন্তু সেই ব্যাঘাত টুকুর অভাবে একেবারেই পূজোয় মন ব'সছিল না। কতক্ষণে তার সেই মা ডাক, চোখ দিয়ে নীরব আহ্বানের মিনতি—সে আমায় দরজার পাশ থেকে জানাতে আসবে? হে ভগবান্! বাধা, বাধা, ব্যাঘাত, ব্যাঘাত করে অস্থির হই; কিন্তু তুমি যখন অবাধ অবসর, অব্যাহত জীবন দাও

তোমাকে ডাকবার জন্তে, তখন যে তোমায় ডাকার মতন মন একটুও হয় না আর! তার চেয়ে বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তোমায় ডাকা বরঞ্চ হয়, কারণ যেটা পাই না সেটা পাওয়ার তৃষ্ণা, যেটা হয় না সেটা হওয়ার ইচ্ছা—মানুষের মনে স্বভাবতঃই বলবতী! আর আসনে ব'সতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি প্রসাদের ঘরে ঢুকে দেখি...

এ-ও যে কখনও দেখ্তে হ'বে, তা যে ভাবি-নি, ভাবতে পারি নি। ধ্যানমগ্ন যুবা ও কার ছবির সামনে বসে হৃদয় ঢেলে অঞ্জলি ভরে ও কি ঢেলে দিচ্ছে? ছবিখানা—গয়লা বৌ-এর! হঠাৎ একটা বেদনা যেন ভূতল থেকে উঠে অকস্মাৎ আমার সকল অঙ্গ জড়িয়ে ধরলে! যে কথা ভাবতে যাই, পারি নে; যা-নয় ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে যাই, ভুলে যাই, খেই হারিয়ে যায়,—পারি নে; যা হ'তে পারে না মনে করে, দৃঢ় হ'তে চাই, মন থেকে সে কথা আপনা থেকেই দূর হ'য়ে যায়—আর মনে হয় সত্যি সত্যি! চোখের সামনে যা দেখছি—তাই সত্যি! চোখের দেখা জিনিসটাকে মিথ্যে করতে যা আমি ভাবতে চেষ্টা করছি—সে'টা সত্যি নয়—সত্যি এইটে! চোখের সামনে যা রয়েছে, অগ্নি তেজে যা জ্বলছে! উঃ প্রসাদ! প্রসাদ! আর কেউ নয়? প্রসাদ? তবু-তবু-পারছি না! এ যে নিজের ছেলে! এর দোষ চক্ষে দেখেও কালোকে সাদা বলার মত সুস্পষ্ট মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রছি—তবু প্রসাদ যে এমন তা ভাবতে পারছি না! প্রসাদ—প্রসাদ—আমার সেই এতটুকুনি প্রসাদ সে-কি কখন এমন হ'তে পারে, না হয়? গয়লা বৌ-এর ছবি এঁকেছে ব'লেই কি-সে গয়লাবৌকে আটক করার ষড়যন্ত্রে ছিল? গয়লা বৌএর ছবি এঁকেছে ব'লেই কি প্রসাদ আমার খারাপ ছেলে? যা সুন্দর তাই মানুষ আঁকে। গয়লা বৌএর

ওই যে ব্যথাতুর অসহায়, স্নিগ্ধ লাবণ্য ভরা যৌবন-উজ্জ্বল রূপ—এ যে আঁক-বারই মত। তা হ'লে কি দরকার ছিল পরস্ত্রী নিয়ে আঁকা আঁকির। মাথার মধ্যে যেন কেমন ক'রছিল—কিন্তু অত বড় ছেলের সাম্‌নে চক্ষুলজ্জাও তো বড় কম নয়—তাই আর কিছু না ব'লতে পেরে শুধু ব'ল্লুম—"কি ক'রছিস্ প্রসাদ?" সে ব'ল্লে—"কিছু না মা!" আমি আর সেখানে দাঁড়াতেই পারলুম না, হন্ হন্ ক'রে একেবারে নিজের শোবার ঘরের জানালার কাছে যেখান থেকে আম বাগানের খানিকটা দেখা যায় সেইখানে পাতা মাদুরীর উপর মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লুম—তাই কি প্রসাদ দেশ ছেড়ে যেতে চাইছে না? পল্লী সংস্কার, সমাজ হিতৈষণা, পরোপকার এ সব কি শুধু তার দুষ্প্রবৃত্তির ঢাক্‌না? উঃ, এতটা যে ভাব্‌তেও পারা যায় না! পাপের নগ্ন রূপ দেখিয়ে দিয়ে যখন মানুষ পাপ করে, তখন তা তত বীভৎস হয় না; বরঞ্চ তা শিক্ষাপ্রদ হ'তে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের আবরণে শুভ্র পবিত্রতা দিয়ে মনোমুগ্ধকর ভাবে সাজিয়ে যখন সে পাপকে গোপনে প্রশ্রয় দেয়, তখন তা কি ভীষণ, কি ভয়ঙ্কর! কাল যাকে আদর্শ স্থানীয় ভেবে পুত্র গৌরবে বুক আমার পূর্ণ হ'য়েছিল, আজ তা' কি আঘাতেই না চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে ধূ ধূ শূন্যতায় ভ'রে উঠ্‌লো! সবাই দেশ ছেড়ে যেতে চাইলে,—আর ঐটুকু ছেলে সহরের অনায়াস-বাসের লোভ অনায়াসে দমন ক'রে পল্লীর মঙ্গলের জন্যে যখন দৃঢ়কণ্ঠে কাল ব'লেছিল—"না মা, আমি কিছুতেই এ দেশ ছেড়ে যাবো না।" তখন যে আমি "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থং" করার মতন ছেলেই তাকে ভেবেছি। আজ কি না একেবারে এই? ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ বাগানের দিকে নজর প'ড়ল, দেখি গয়লাবৌ স্নান ক'রে ফিরছে—ভিজে কাপড়ে তার রূপের অপ্রকাশ

ঐশ্বর্য্য এমন ভাবেই ফুটে উঠেছে, যা শিল্পীর আদর্শ, কবির কবিতা হতে পারে—! পুত্র পরনারীর চিত্র এঁকে অন্যায় করলেও, তার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ চোখে পড়তেই আমার আনন্দ হ'লো! গয়লা বৌ র রূপ দেখবার এবং হৃদয় থাকলে তা বোঝবার মত!

আর কবি বা শিল্পী, যে সে রূপ বর্ণনার প্রলোভন এড়াতে পারবে না, তা সেই মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল। যে মুহূর্ত্তে সিক্ত জলপদ্মটির মত সিক্ত বসনে টল-টল চোখে ধীর পায়ে বাড়ীর দিকে তাকে আস্‌তে দেখ্‌লুম। আমার ছেলে না এঁকে অন্য কেউ ঐ তরুণীর ছবিটি এঁকে কোন মাসিক কাগজে ছাপাতো, শিল্পীর সুখ্যাতি বেরিয়ে যেতো, আমিও করতুম, এ নিশ্চয়! কিন্তু এ যে চোখে দেখ্‌ছি, কেমন-কেমন ঠেক্‌ছে, কেমন যেন বিসদৃশ ভাব আপনা থেকেই পাপ মনে জমে উঠ্‌ছে!

হঠাৎ গয়লা বৌ কাকে দেখে. অমন ক'রে গায়ের কাপড় টেনে মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে—অমন ক'রে কার দিকেই বা চাইলে সে? ওঃ বুঝেছি আমারই—আমারই—ছেলের! প্রসাদ যে তখনও সেই জানালার সামনেই ছবি নিয়ে বসেছিল, চোখে দেখে এসেছি। ভাবতেই চোখের পাতা মুদে গেলো, আর মনে হ'লো সর্ব্ব অঙ্গ অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে।

ভিজে কাপড় ছেড়ে পিঠের উপর চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে গয়লা বৌ এসে ডাক্‌লে "পিসি মা!" আমার মনটা তখন এমন হ'য়েছিল, তার দিকে না চেয়েই ব'ল্লুম "মা, জল খেয়ে আয়। ঐ বারাণ্ডায় ঢাকা দিয়ে রেখেছি!"

সে চলে গেল, আমার সেই ভাবনা, আর কিছুই নয়। শুধুই সেই! শুধুই! শুধু মনে হয়, প্রসাদ! প্রসাদ। আর কিছু নয় প্রসাদ! প্রসাদ কি করেছে, কত বড় অন্যায় কাজ করে কি ভীষণ অপরাধ সে করেছে—

কিছু না, শুধু ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌লো—প্রসাদ ! প্রসাদ ! আর কিছু না ! স্নেহ দুর্ব্বল হৃদয় মাতৃ হৃদয়ের সবটুকু কোমলতা নিঃশেষ করে' সেই যৌবন-দৃপ্ত দৃঢ়চিত্ত যুবককে বুকের মাঝখানে টেনে আনে, আবার কারা তা'কে ঠেলে ঠেলে বার করে দেয় ! জানি নে, তারা কে। কত তাদের শক্তি, কেমন তারা যে মা'র বুক থেকে ছেলেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় ! আর যে সে ছেলে ! সেই ছেলে ! রূপে, গুণে, মহত্ত্বে, চরিত্রে—যার তুলনা নেই ! আর সেই ছেলে, যার গর্ব্ব এই মার বুকখানায় ভরে আছে, কানায় কানায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে ! কোথায় একটুকু স্থান ফাঁক নেই—আমার সেই ছেলে ! এমন ছেলে !

ভাবতে ব্যথা লাগে, প্রসাদ অন্যায় করেছে ! আবার নিমেষের দেখা সেই ছবিটাকেও ভুল্‌তে পারি নে। সেই ক্ষণিকের দেখা ছবিখানার মধ্যে যে এত গ্লানি, এত লজ্জা লুকিয়ে ছিল বা থাকতে পারে—হয় ত প্রসাদও তা জানে না, তাই সে এঁকেছে। অভাগিনী গয়লা-বৌ এর ব্যথায় তার কোমল কবি হৃদয়টি ব্যথা পেয়েছে, তাই তার তুলির মুখে সেই ছবি বেরিয়ে এসেছে, প্রসাদ তা'তে দোষ দেখে নি। তার মা আমি—আমারও দেখা উচিত ছিল না। কিন্তু—আমি বাগান দিয়ে আসবার সময় গয়লা বৌ-এর সেই যে সলাজ সানুরাগ চাহনিটা দেখেছি, সেটা যে ভুল্‌তে পারি নে। সেটাই যে লজ্জাকে গাঢ় করে তুল্‌ছে ! অমন করে চাইবার তার কি উদ্দেশ্য এবং চাইতেই বা লজ্জার ভাবটা অমন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর ত নেই—তাই ত ভাবছি—এ কি !

প্রসাদ খেতে আস্‌ছে শুনেই উঠে পড়তে হ'ল ! মন থেকে মুহূর্ত্তের সব অবসাদ ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। গয়লা বৌএর গুড়-মুড়ি যেমন

ঢাকা, তেমনি পড়ে ছিল, সে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে মুগ না কলাই কি বাচছিল, বল্লুম—জল খাও নি কেন বাছা ?

গয়লা বৌ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—তুমি জল খেয়েছ পিসি মা ?

না—না—ঐ কণ্ঠে পাপ নেই—নেই ! ঐ চক্ষের দিব্য দৃষ্টিতে আবিলতা থাকৃতে পারে না ! মনে হ'তেই আবার স্নেহে বুক যেন ভিজে গেল, বল্লুম—আমি খাচ্ছি, তুই খা-না মা !

বল্লে—খাই পিসিমা !

গয়লা বৌ এর কথা

যাঁকে সেবা দিয়ে শ্রম দিয়ে ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে দিনরাত পূজা ক'রতে ইচ্ছে করে, যদি তাঁরই কলঙ্ক ও অপবাদের হেতু হ'য়ে দাঁড়াতে হয়, তাহলে সে ব্যথা যে কতখানি বাজে, তা আর ব'লে কি ক'রে বোঝাব! আমার স্বামীকে আমার মনেই পড়ে না। এমন কোন মানুষ এতদিন দেখিনি, যাকে বুকের ভিতর বসিয়ে পূজো ক'রতে ইচ্ছে হ'য়েছে। কিন্তু যেদিন পাষণ্ড জমীদারের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেরিয়ে এলুম— সেদিন আমি নিরাশ্রয়। পতিতা ব'লে ঘরের লোকে ঘরে ঠাঁই দিলে না। কোথায় যাই? আশ্রয় দিলেন তাঁরই মা। যিনি নিজে বিধবা! আমাকে ঘরে রাখলে লোকে তাঁর নিন্দে রটাবে, এ ভয় তাঁর এতটুকুও হ'ল না। এত ভালো, এত মহৎ তাঁর অন্তঃকরণ। তিনি কেমন আর তাঁর ছেলে কেমন, তা আমি ব'লে শেষ ক'রতে পারি, সে সাধ্য আমার নেই। তবে এটুকু ব'লতে পারি, এমন মা এমন ছেলে, আমাদের এত বড় গাঁ-টায় আর ছিল না। কমলবাবুর আচরণ দেখে পুরুষ জাতির উপর আমার এমন একটা ঘৃণা এসেছিল,—যদি এঁর দেখা না পেতুম, তাহলে বোধ হয় এ জন্মের মত পৃথিবীর বাস তৃষ্ণা মিটে যেতো। যেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে প্রথম চোখোচোখী হ'য়ে গেলো নূতন, সেদিন থেকে আমিও নতুন! জগৎও চোখে চোখে মিলে গেলে যে এত সুখ—কে তা জানতো—কেমন ধারা সুখ? তা তো ব'লে বোঝাবার নয়, কেমন করে বোঝাতে হয় আমি জানিনে। বুকের ভিতর কেন যে থেকে থেকে কাঁপে, তাঁর চলা ফেরার

শব্দে গলার আওয়াজে কেন নেশা করার মত মুগ্ধ হ'য়ে থাকি, তাই বা কে বলতে পারে! এ যে কি—কিসের অনুভূতি, তা জানিনে শুধু এই জানি, এমন আর এ জীবনে হয়নি কখন! এত ভালো লাগে নিজেকে এই ভাবনাটার সঙ্গে মিশিয়ে রাখত! এতে যে কোন দোষ আছে, তা আমি বুঝতে পারি না। মনে হয়, কেন তিনি সমস্ত দিন কথা ক'ন্ না। তা'হলে আমি সারাদিন সেই ধ্বনি শুনি। কেন তিনি দিনরাত ঘরের মধ্যে না থেকে বেড়িয়ে বেড়ান না, তা হ'লে ত আমি সেই শব্দ বুক পেতে নিই। সারা দিনটা মনের মধ্যে কেন সেই কথা, কেন সেই চিন্তা—বুঝতে পারিনে।

কাল যখন দুধ জাল দিচ্ছি, তিনি সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। পিসীমা মালা জপ্‌ছিলেন—এমন সময় ভগবতী দিদিমার মেজ মেয়ে এসে মুখের উপর ব'লে ফেল্লে—"তা ভালো, তোমারও যে এমন কলিকেলে বুদ্ধি, তা জানতুম না বৌ। আচ্ছা, তুমি কি ব'লে তোমার ঐ সোণার চাঁদ ছেলেকে ঐ নষ্ট মাগীর সাম্‌নে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ ভাই? এত বড় গাঁ খানার কেউ যা সাহস করলে না, তুমি—তুমি মেয়েমানুষ, ভদ্র ঘরের বিধবা, তুমি ঠাঁই দাও বা কেমন ক'রে পোড়ার মুখীকে!"

পিসীমার তখন মালা জপ শেষ হ'য়েছে। শান্ত ভাবেই তিনি ব'ল্লেন "এতে তোমাদের মাথা ব্যথা কেন ঠাকুরঝি! জমিদার যদি দোষ ক'রে থাকে, তাকে শাস্তি দাও। গয়লা বৌএর দোষ তাতে কিছু নেই। লোকে ব'ল্লেও আমি তা বিশ্বাস করিনে। ধরো আমাকেই যদি জমীদার তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আটক্ ক'রে রাখে- তাতে আমার কি দোষ?"

হাত মুখ নেড়ে পিসীমার ঠাকুরঝি ব'ল্লেন--"কে জানে বাপু, ও সব বিচের টিচের জানিনে; তোমার ভালোর জন্মেই আমার ব'লতে আসা। তোমার নামে ধর একটা কুকথা লোকে ব'লছে বৌ, সেটা কি আর আমার শুনতে ভালো লাগে ?"

হাসি মুখেই পিসীমা ব'ল্লেন—"কি কুকথা আমার নামে ব'লেছে, সেটা ব'লেই ফেলো না ঠাকুরঝি ?"

জিভ্ কেটে ঠাকুর ঝি ব'ল্লেন—"ছি ছি, সে কথা কি মুখে আনবার, যে মুখ দিয়ে বের ক'রব ? তোমাকে আমি যতটা ছেদ্ধা করি বৌ, লোকে কি আর তা বোঝে ? তবে কি না তোমার বিয়ের যুগ্যি ছেলে রয়েছে ঘরে, তাই ব'লছি প্রসাদের নামে যদি কেউ কোন কথা বলে, তোমারও তো সেটা শুনতে তৃপ্তি হবে না।"

পিসীমা কিছু বলবার আগেই পিসীমার ছেলে ব'ল্লেন—"প্রসাদের নামে নিন্দে রটুলে কিছু ক্ষতি নেই,—তার বদলে যদি একজন অনাথার প্রাণ ও মান বাঁচে, তাতেই আমরা তৃপ্তি বেশী পাবো।"

বিধবা বেশ করে নাক সিঁটকে বল্লেন—আমার বলা তোমাদের ভালোর জন্মেই বাছা!

পিসীমা বল্লেন—"তুমি তো ব'লছ ঠাকুরঝি! কিন্তু গয়লা বৌএর যে আর স্থান নেই, এটাও তো ভাবতে হবে। ওকে আর গয়লা পাড়ায় নেবে না। আমি যদি ওকে যেতে বলি তা'হলে ওকে পথে গিয়েই দাঁড়াতে হবে। নিরাশ্রয় পশু পাখীকেও মানুষ আশ্রয় দেয়, আর এই ছেলে-মানুষ মেয়েটাকে মেয়েমানুষ হ'য়ে, গেরস্থ হ'য়ে আশ্রয় দিতে পারবো না ? এত নিষ্ঠুর এখনো হ'তে শিখিনি ভাই।"

—"তা বলে নিজের ছেলের সর্ব্বনাশ, নিজের কলঙ্ক মাথা পেতে নেবে বৌ? স্বামী ছেলের সুনামের চেয়ে কি ঐ নষ্ট ছুঁড়িটাকে আশ্রয় দেওয়া বেশী হ'ল গা?"

"তোমাদের বিচারে না হ'তে পারে, আমাদের বিচারে তাই বটে! বিচার বুদ্ধি ত সকলের সমান হয় না ঠাকুর ঝি!"

হঠাৎ চেয়ে দেখি, তাঁর ছেলের মুখে যেন সহসা আকাশের অনেকখানি আলো এসে পড়ে জল্ জল্ করে দিলে। পিসিমা-ও ছেলের দিকে চেয়ে বল্লেন—ঠাকুরঝি, যারা নিন্দে রটায় তাদের বলো, যে কাজ আমি করেছি, তার ফল, ভাল বা মন্দ, ভোগ আমিই করব, আর কেউ করবে না বা করতেও আমি কাউকে ডাকব না—এটা ঠিকই!

রাগে গর্গর্ ক'রতে ক'রতে পিসীমার ঠাকুরঝি চ'লে গেলেন। পিসীমাও আর কোন কথা না ক'য়ে উপরে উঠ্লেন। আমিও দুধের কড়া নামিয়ে তাড়াতাড়ি জল আনতে চ'ল্লুম। তাঁর ঘর থেকে পুকুর ঘাটের খানিকটা পথ দেখা যায়। যাওয়া আসার সময় আবার চোখাচোখী হ'য়ে গেলো। এইটুকু চাহনির মাঝে যে কি সুখ, কি আনন্দ পাই, তা তাঁর পায়ে প'ড়ে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু এ সুখের লোভে তাঁকে কষ্ট দিতে পারবো না, আর তাঁর মাকেও নিন্দের ভাগী ক'রতে চাইনে। ঐ যে পিসীমার ঠাকুরঝি ব'লে গেলেন—"পরের মেয়ের জন্য সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে নিজের ছেলের"—সত্যই তো, আমি কে তাঁদের, যে, আমার জন্যে তাঁরা এত অপবাদ মাথায় করে নেবেন শুধু শুধু। তাঁরা ভালবেসে দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, এইটুকু ভেবেই তাঁদের এখান থেকে আমার চ'লে যাওয়া উচিত। যাঁরা আমার উপকার ক'রলেন—তাঁদের

আমি অপকার ক'রছি! ছি! এত নীচ কেন হ'তে যাবো? তা ছাড়া, তাঁর গায়ে যে একটিও আঁচড় লাগ্‌বে, তা আবার আমার জন্যে, এ আমি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারবো না। আমি চ'লে যাবো। কিন্তু কোথায় যাবো? পথ চিনিনে, লেখাপড়া যা জানি, তাতে ক'রে কোন কাজ হয় না। হাতে পাঁচটা টাকা আছে, ক'দিনই বা চ'লবে তাতে। কান্না পায়, লোক দেখলে বলতে ইচ্ছে হয়, ওগো, তোমরা কেউ ব'লে দাও না, কোথায় যাবো আমি? আমার যে কেউ নেই আর! কোথায় যাবো, তা জানি নে; কিন্তু যেতে যে হবেই তা জানি। কেউ দাও না গো বলে,—কোথায় যাই; কোথায় গেলে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই মেলে! কিন্তু কে বলে দেবে? দিক্ আর নাই দিক্ আমি যাবো। আমি এখানে থাকলে তাঁর নিন্দে, তাই আমি দূরে চলে যাবো—যেখানে গেলে তাঁর ও আমার মধ্যে অমন কত শত ক্রোশের পথ আড়াল হ'য়ে দাঁড়াবে। আর থাকতে পারলুম না—দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। রান্নাঘরের রোয়াকে মস্ত একটা অশথ গাছ ছিল, হাওয়ায় দু'লে দু'একটা শুখ্‌নো পাতা আমার কোলের উপর প'ড়তেই চেয়ে দেখি, গাছের ওপাশে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় দেখছেন। একবার ক'রে আমায় দেখ্‌ছেন—আর ছবি আঁকছেন। হাতে তাঁর একটা কাটের তক্তা,—তাতে কাগজ আঁটা, আর এক হাতে রঙের তুলি। কি লজ্জা! এই অভাগীর ছবিই আঁকছেন না কি?

আমি যে ওঁর ছবি দিনরাত, মনের পাতায়, চোখের কলমে, ভক্তির রঙে, আঁকছি। আমার নজর প'ড়েছে বুঝতে পেরে তিনি কাছে এসে বল্লেন—তোমার নামটি কি আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে—

সরে গিয়ে বল্লুম—আমার—নাম ?—মালতী।

কি ক'রে যে নামটা গলা থেকে বার করেছি, তা আর ভেবেই পাই না! কিন্তু সেখানে একদণ্ডও দাঁড়াইনি! আর, এখন মনে হয়, কেন দাঁড়ালুম না! -মরতে ইচ্ছা হয়!

বিকেল হ'তে না হ'তে ওপাড়ার বিন্দুমাসী এলেন—তাঁর গুণের কথা তো জান্‌তে বাকী নেই। এমন নিন্দুক আর ঝগড়াটে মেয়েমানুষ আমাদের গ্রামে আর দ্বিতীয় নেই। তাঁকে দেখেই আমার বুকটা ধড়াস্‌ ক'রে উঠ্‌লো। তিনি যে কি ব'লতে এসেছেন, তাও আমার বুঝতে বাকী ছিল না। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—কি রে বৌ, কাপড় চোপড় কাচা হয়ে গেছে না-কি?

ভয়ে ভয়ে বল্লুম—হয় নি মাসী। এই যাচ্ছি।

বলেই রোয়াকের কোণ থেকে পেতলের ঘড়াটা তুলে নিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম।

খিড়কীর দিক দিয়ে যেতে তাঁর ঘরটা বাঁ দিকেই পড়ে। এ সময়েও একবার সেদিকটায় না চেয়ে পারলুম না। ঘরের জানালা বন্ধ একটাব সরু ফাঁক দিয়ে রেখার মত কি একটা দেখা যাচ্ছিল,—বোধ হলো, সেটা আলো! এরি মধ্যে আলো জ্বেলেছেন! আলো জ্বেলে কি করছেন— কে জানে! এ পোড়ামুখীর ছবিখানিই সামনে ধরা আছে কি-না তাই বা কে জানে!

সেই ছিদ্র পথে চোখ রেখে দেখলে হয় ত তাঁকে দেখতে পেতুম,—কি কর্চ্ছেন তা'ও জান্তে পারতুম; কিন্তু সাহস হ'ল না। ক'পা এগিয়েছিলুম জানালার দিকে, ভয় হো'ল। এ বিজন পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেউ

আস্‌বে না জান্তুম, তবুও কেমন ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো। কাকে যে ভয়—তা জানি নে। বুঝি নিজেকেই নিজের ভয় হ'তে লাগ্‌লো। আর সেখানে দাঁড়াতে পার্‌লুম না—এগিয়ে চলিছি—

কি রে বৌ! বলি, আছিস্ কেমন? বলে বিন্দুমাসী ডিঙ্গি মেরে একটু তফাতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কথার কি যে উত্তর হ'তে পারে, তা আমি ভেবেই পেলুম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, মাসী বল্লেন—কথা কচ্ছিস নে কেন বৌ? বলি, ভালো আছিস ত? এখানেই থাক্‌বি না কি?

বল্লুম—কোথায় আর যাব মাসি! তবে তুমি যদি কলকেতা যেতে, তাহ'লে আমি তোমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানটা ক'রে আসতুম একবার।

আমার দিকে চেয়ে, মুচ্‌কি হেসে, বিন্দুমাসী ব'ল্লেন তা তুই যদি যেতে চাস্ তো সঙ্গীর ভাবনা কি? এই কালই ভোরে আমার নাতি হরেকেষ্ট কলকাতায় যাচ্ছে। আমি আগে থেকেই জানি, তুই এখানে থাক্‌তে পারবিনে। সেদিন জমিদার কলকাতা গেছে, সেদিনই বুঝেছি। এমন রূপ—চেয়ে দেখবার লোকই বা কে এখানে? কি বলিস্ মালতী বৌ?

মনে হ'ল, এ কথা শোনবার আগে মরণ হওয়াই ভালো ছিল। কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে ব'ল্লুম—তা আমি যদি যাই, তোমার নাতি কি নিয়ে যাবে আমায়?

তা কেন যাবে না। সে ভোর চারটেয় খিড়কীর দরজায় এসে হাজির হবে—তুই ঠিক্ থাকিস্। থাকবি তো?

হ্যাঁ পারবো। তুমি তাকে ব'লো। আমার কিন্তু পাঁচটি টাকা সম্বল—তাতে রেল ভাড়া কুলোবে তো?

তা ব'লবো—ব'লেই বিন্দুমাসী চ'লে যাচ্ছিল! হঠাৎ কি ভেবে আবার

ঘুরে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্লে—দেখিস, মন বদলায় না যেন। এখানে থাক্লেই ওই ভদ্রলোকের বিধবার মিথ্যে নিন্দে—বেচারী একটী ছেলে নিয়ে ঘর করে—এটা বুঝিস্ তো? আর সেখানে গেলে তোর ভাবনা কিসের? তিনতলা অট্টালিকা হবে, গা-ভরা গয়না হবে, দশটা দাস দাসী সেবা ক'রবে। আদর সোহাগ যত্ন আত্যি কিছুরই অভাব হবে না বুঝলি তো?

ঘাড় নেড়ে, চোখ বুজে, তেতো ওষুধ গেলার মত জানালাম—বুঝেছি। মনে হ'ল, অমন সুখের চাইতে জন্ম জন্ম যদি এখানে, এই মাতা ও পুত্রের ক্ষুদ্র গৃহে অতি বড় দুঃখেও জীবন কাটে, সেও ভালো।

পিসিমার মুখ এত গম্ভীর এর আগে দেখি নি। জলের কলসী নামিয়ে, ভিজে কাপড়খানা বাঁশের আলনায় টাঙিয়ে দিয়ে, রান্নাঘরের চৌকাঠের উপরে বসে বল্লুম—পিসিমা, বিন্দুমাসীরা কলকাতায় যাচ্ছেন,—আমাকেও তাঁরা নিয়ে যেতে চাইছেন।

পিসিমা একটিবার ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে, আবার যেমন উনানের কড়ায় খুন্তী দিয়ে তরকারী নাড়ছিলেন, তেমনি নাড়তে লাগলেন।

বল্লুম—পিসিমা, তুমি যদি বল...

পিসিমা এদিকে না ফিরেই বল্লেন—তোমার কি ইচ্ছে, মালতী?

হা জগদীশ! আমার কি ইচ্ছে? এই তীর্থ ছেড়ে যেতে পারব আমি! কিন্তু না গিয়েই বা কি করব! বন্যার মত, মড়কের মত, অভিশাপের মত, এঁদের সংসারটাকে নষ্ট করব বই ত নয়! তবুও—তবুও,—প্রাণ স্বীকার করে না,—যেতে হ'বে তা যে মান্‌তে চায় না!

পিসিমা আমার মুখপানে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যেতে চাও মালতী? একটুখানি চুপ করে' থেকে বল্লেন—তোমার ইচ্ছের ওপর ত আমার জোর নেই মা! তবে যার সঙ্গে যাবে বল্‌ছ—তার সাথে ত আমার প্রাণ তোমাকে ছাড়তে বল্‌ছে না।

বিন্দুমাসীর স্বভাবটা কারই বা অজানা ছিল! তিনি এই গাঁ-খানার কত লোকেরই যে সর্ব্বনাশ করেছেন, তা আর না জানে কে? তবে জমিদার আর সেই বুড়ো খুড়োমশাই—এর জন্যেই কেউ কিছু করতে পারত না,—তাঁরাই ছিলেন তার সাহস, তার বল, প্রতিপত্তি—যা কিছু!

পিসিমা বল্লেন—সেখানে কোথা থাক্‌বে, কি করবে—কিছু ঠিক হ'য়েছে?

না।

তবে?—পিসিমা কথাটার উত্তর আমার মুখের দিকে চেয়ে জান্তে চাহলেন বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, ঐ তবের দ্বারাই তিনি সব কথার শেষ করে দিলেন।

বল্লুম—পিসিমা, আমি নিজের জন্যে যেতে চাই নে। কিন্তু আমার জন্যে আপনাদের পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে যাবে, আপনাদের নামে নিন্দে রটাবে, সেই ভেবেই—

পিসিমা বল্লেন—আমরা তা'তে ভয় পাই নে, মালতী! তার জন্যে তুমি ভেবো না।

চুপ করে বসে রইলুম। হঠাৎ মনে হ'ল, পিসিমা আজ আমার নাম ধরে ডাক্‌ছেন কেন? আর আমার নাম—তিনি জানলেনই বা কেমন করে? আমি ত কোন দিন বলি নি—তবে? হঠাৎ ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেলে

বন্দুক যেমন ছড়াৎ করে ওঠে, তেমনি মনে হ'লো—নাম আজই আমি একজনকে বলেছি—তিনিই কি বলেছেন? অথবা পিসিমা আমাদের দু'জনকে দেখেছেন?—কথাটা মনে হ'তেই গা কেমন করে উঠ্‌লো। পিসিমা গম্ভীর মুখে রান্নার কাজ করছিলেন, মনে হ'ল ভূমিকম্প হ'চ্ছে—উঠে গেলুম।

প্রসাদের মার কথা

হঠাৎ চম্‌কে গেলাম শুনে, গয়লা বৌ কথা কচ্ছে—কার সঙ্গে? উঠে দেখবার আগেই শুন্‌তে পেলাম, নাম বল্লে – মালতী। তখনই বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। প্রসাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তে বুঝতে বাকী রইল না,—গয়লা বৌ কার সঙ্গে কথা কচ্ছিল, কাকেই বা তার নাম বল্লে।

যে ভাবনাটাকে মন থেকে বিদূরিত করে দিয়ে, অভাগিনী, স্বজন-পরিত্যক্তা, আশ্রয়হীনা নারী বলে যার প্রতি করুণায় মন প্রাণ ভরে রেখেছিলাম—তা'কেই নিভৃত প্রসাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেখে আবার মনের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। এবার আর কোন সান্ত্বনাই পেলাম না।

সমস্তক্ষণই মনটা জ্বলতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যের পরই গয়লা বৌ বল্লে, কলকাতা যাবে। ভাবলুম, যায়—যাক্। আবার ভাবলুম, বিন্দির সঙ্গে যাবে! বিন্দি কোথায় নিয়ে যাবে, কি করবে—কে জানে। ভেবে মতও দিতে পারলুম না। যে তলে তলে আমার পুত্রের গায়ে কালি মাখাবার চেষ্টা করে, আমার মুখও পুড়িয়ে দিতে চাইছে, তাকেও সর্ব্বনাশের কবলে তুলে দিতে নারী-চিত্ত সম্মতি দিতে পারলে না। বল্লুম—আমি নিন্দের ভয় করি নে।

কথাটা মিথ্যে বলি নি। মিথ্যা নিন্দাকে ভয় করতুম-ও না কোন দিন। কিন্তু এবারে যেন মনের কোন এক স্থানে একটু সন্দেহ

ছিল ; যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাসে কথাটা বলিতে পারি নি। যেন কোথাও খানিকটে ফাঁক থেকে গেছে।

রাত দশটা হ'বে—এখনই ছেলেরা খেতে আস্‌বে—দালানে কম্বলের আসন পেতে বসে আছি, প্রসাদ ডাক্‌লে—মা !

বল্লুম—কি প্রসাদ ?

একবার ঘরে আস্‌বে না ?

যাই।

গয়লা-বৌ কোথা মা ! তা'কেও ডেকে আনো না !

গয়লা বৌ পান সাজ্‌ছিল—প্রসাদের স্বর কাণে আস্‌তেই চম্‌কে উঠ্‌লো। তার দিকে চেয়ে আসতে বল্লুম—কথা কয়ে নয়—ইঙ্গিতে।

ঘরে যেতেই প্রসাদ সেই ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—তোমাকে একটা জিনিস দেব মা !

আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছ্‌লো।

প্রসাদ, ছবির উপরে যে চাদর ঢাকা ছিল, সেটা সরিয়ে দিয়ে, আমার পায়ের কাছে মাথা নত করে বল্লে—মা ! আমার হাতের এই প্রথম ছবি—মা-আমার, তোমাকে দিলাম !

চোখে জল এ'লো ! সে জল চেপে ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখি, ছবির নীচে লাল রঙে লেখা—মালতী !

গয়লা বৌ ঘরে ঢুকেছিল ; তার পায়ের শব্দে ফিরে চাইতেই, সে চোখে কাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত ছবিখানার দিকে চেয়ে বল্লাম—প্রসাদ ! গয়লা-বৌ কলকাতা যাচ্ছে—কালই।

প্রসাদ বল্লে—সেখানে ওর কেউ আছে—বুঝি! তা যাক্ না! দেখ মা, আমিও ক'দিনই ভাবছিলুম, ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ও যেন এখানে স্বস্তি পাচ্ছে না। তার চেয়ে আপনার জনের কাছে যায়, বেশ ত!

আমার মাতৃহৃদয়! সব মেঘ কেটে গিয়ে যেন একেবারে কি হ'য়ে গেলো! কি চমৎকার এঁকেছিস্ প্রসাদ! বলে তাকে স্নেহে জড়িয়ে ধরছি, সে আমায় প্রণাম করলে।

৮

লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কমলেশের কথা

কাল সারা নিশি জাগরণে গিয়েছে। ভোরের দিকে গা'টা কেমন একটু ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল। বিছানা ছেড়ে উঠ্বারই ইচ্ছা ছিল না। কাল রাত্রে গিয়াছিলাম রমেশদের বাগান বাড়ীতে,—নিমন্ত্রণ ছিল। আমোদের পর যে অবসাদ—স্বাভাবিক শরীরের ও মনের এই রিম রিম, ঝিম ঝিম অবস্থা সেই আমোদেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। রাত্রে আমি যখনি শুই না কেন, ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙ্গবেই। বড় লোকের ছেলে হয়ে, আরও সহস্র কু-অভ্যাসের দাস হয়েও, আজও ঘুমটা কেমন ভেঙ্গে যায়। এ অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারি নি।

ঘুম ভেঙ্গে—খুব গরম গরম ছ'কাপ চা খেয়ে, হাত মুখ ধুয়ে বসতে, শরীরের ঝিম ঝিম ভাব যেন অনেকটা কেটে গেল। আজ সকালে অমলের আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা—ধূমপান করতে করতে তারই প্রতীক্ষা করছিলুম। অমল আমার বাল্যবন্ধু—জীবনে বহু বন্ধু পেয়েছি—বহু বন্ধু হারিয়েছি। যার সঙ্গে একদিন গলায় গলায় ভাব ছিল, যাকে না দেখলে একদিনও থাকতে পারতুম না, যাকে একবার দেখবার জন্য—ছ'টি কথা কইবার জন্ত সহস্রবার কাজে অকাজে ছুটে গিয়েছি—তেমন বন্ধু সব আজ

অজানা হয়ে গেছে,—কদাচিৎ কখনো দেখা হলে, অনেকক্ষণ মুখপানে চেয়ে তবে বাল্য-পরিচয়ের সে কথা স্মরণ-পথে যেন আসে। তার পর ক্ষণিকের জন্য ভাষা ভাষা দু'টো কথা হয়। জীবনে কত বন্ধু এল, আর কত বন্ধু গেল! কিন্তু অমলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভাব বাল্যকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে আছে।

ছেলেবেলা স্কুল থেকে বরাবর দু'জনে এক সঙ্গেই পড়েছি; তার পর কলেজেও দু'জনে এক সঙ্গেই পড়েছিলুম। তার পর আমার ঘাড়ে কি ভূত চাপলো, আমি কলেজেব পড়ায় ইস্তাফা দিয়ে—মা সরস্বতীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে বসলুম। অমল একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পাশ দিয়ে কোন কলেজের প্রফেসার হয়ে বস্‌ল। আবার শুনছি, অমলচন্দ্র নন্-কো-অপারেশন করে, প্রফেসারি ছেড়ে দিয়ে, স্বদেশী প্রচার কচ্ছে। এবার কলকাতায় এসে অমলের সঙ্গে একদিন মাত্র মিনিট কয়েকের জন্য দেখা হয়েছিল। দেখলুম, মোটা আট হাতি খাদি একখানি তার পরণে, হাত-কাটা খাদির একটা জামা তার গায়, জামার উপর খাদিব একখানা চাদর, পায়ে জুতো নেই। আমি তাকে দেখে হেসে বললুম, এ যে একেবারে 'অল খাদি'—অমলও হেসে বললে, 'এর বেশী যে আর সাধ্য নেই।'

আমিও তাড়াতাড়ি কাজে বের হচ্ছিলাম—রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশী কথা কইবার সময় ছিল না। অমল বললে, আমার বাড়ী এসে কথা কইবে। পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে সে কি আলাপ করবে, তারও একটু আভাস আমায় জানিয়ে গেল। আজ তার আসবার দিন। অমল আসবে বলে তার আশায় বসে আছি,—এমন সময় চাকর রামাইত এসে বললে, একটা বুড়ো গোছের বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রামাইতকে বললুম, উপরে নিয়ে আয়। বুড়োলোকটী উপরে আসতেই দেখলুম, ইনি আমাদের গ্রামের সেই খুড়োমশাই! উঠে খুড়োমশাইকে মামুলি ধরণে প্রণাম করতে, খুড়ো বললেন, জয়স্তু, বেঁচে থাক বাবা, কীর্ত্তিমান পুরুষের মত কীর্ত্তি রাখ।

খুড়োকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, খুড়ো বললেন, আর ভায়া, বল কেন! এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের মুখখানা না দেখলে কি আর থাকতে পারি—তাই গ্রাম ছেড়ে মুখখানা একবার দেখবার জন্য ছুটে এলুম। সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে যা ঠাণ্ডা—আর দুর্ভোগ গেছে, ভায়া, সে কি আর বলবো!

আমি 'বলিলাম, খুড়ো একটু চা খাবেন কি—চা আনতে বলবো?'

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, হাঁ বাবা, হাঁ—চা অতি উত্তম পদার্থ,—দেশ গাঁয়ে কটা লোকে অমন মূল্যবান তেজকারী পদার্থ খেতে পারে বল দেখি বাবা! সেই যে সেবার গাঁয়ে গিয়ে ক'দিন চা খাইয়েছিলে—দেহটা বেশ পোষ্টাই ছিল। সুন্দর পদার্থ! খেলেই শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠে। আর এই বুড়ো হাড়ে উত্তেজক পদার্থ না খেলে শরীর যেন বইতে চায় না ভায়া!

এই বলিয়া খুড়ো খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তার পর, সুখবর আছে ভায়া—সুখবর আছে! বলি, তোমাদের জন্য তো আমরা ভেবে ভেবে সারা—কোথা থেকে কি ভাল জিনিষটা এনে ভায়াদের মুখে তুলে দেব, সেই ভাবনাতেই আমাদের দিন যায়—ভায়াদের বুঝি বা চোখের আড়াল হলে আর আমাদের কথা মনে পড়ে না!

খুড়োর সুসংবাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমি বলিলাম, তা নয় খুড়ো, মনে আমাদের খুবই থাকে—আপনাদের স্নেহের কথা কি আর ভোলা যায়।

খুড়োর সঙ্গে কথা হইতেছে, এমন সময় অমল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই যে, বাবুদের চা খাওয়া হয়ে গেছে না কি! আস্‌তে একটু দেরী হয়ে গেছে ভাই—অনেকক্ষণ বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তা পথে আবার বিমল, অরুণ ওদের সঙ্গে সব দেখা—তাই দেরী হয়ে গেল।

আমাদিগের গল্প চলিতেছে—খুড়োমহাশয়ের সুসংবাদ দান অর্দ্ধপথে স্থগিত পড়িয়া আছে। খুড়ো মহাশয় হাঁ করিয়া অমলের বিদেশী বর্জ্জন স্বদেশী-প্রচারের কাহিনী শুনিতেছিলেন। এমন সময়ে চাকর ট্রেতে করিয়া তিন পেয়ালা চা ও টোষ্ট, রুটি, মাখন প্রভৃতি লইয়া আসিল। আমরা দুইজন—আমি ও অমল ট্রে হইতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম, খুড়োমহাশয় ফ্যাল ফ্যাল চোখে চা ও রুটি মাখনগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার উদ্যত হস্ত আর অগ্রসর হইল না।

অমল হাসিয়া বলিল, খান না ঠাকুর মশায়, চা খাবেন না?

খুড়ো একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, এগুলি—ওগুলি—

খুড়োর মনের ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম ওতে দোষের কিছু নেই; ওগুলি পাঁওরুটি, ও আজকাল সকলেই খায়—আর এ গুলি বিশুদ্ধ মাখন।

খুড়ো সতৃষ্ণ নয়নে মাখন ও রুটির পানে চাহিয়া কহিলেন, রুটিতে মুরগির ডিম নেই তো!—

অমল ঠাকুর মহাশয়ের ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'না—না সে ভয় আপনার নেই—আপনাদের পাড়াগাঁয়ে সস্তা মুরগির ডিম—সেখানকার রুটিতে মুরগির ডিম দিলেও দিতে পারে; এখানে ডিম বেজায় আক্রা—এমনি মুরগির ডিম দিলে তো আমরা বেঁচেই যেতাম।

এইবার খুড়ো মহাশয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ও রুটি মাখনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, বড় উপাদেয়—বড উপাদেয় পদার্থ বাবা—মুড়িও আমাদের ভাল খাদ্য বটে—তবে সে আর এখন এ দাঁতে যেন সয় না। এ অতি নরম মোলায়েম পদার্থ—খেয়ে তৃপ্তি আছে।

অমলের সঙ্গে খুড়োমহাশয়ের গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। খুড়োর সঙ্গে অমল পল্লীর সুখ, সুবিধা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির আলাপে মত্ত হইয়া গেল। খুড়ো মশায় যেন এ সব আলাপ তেমন হৃষ্টচিত্তে পরিপাক করিতেছিলেন না। তিনি বোধ হয় আমাকে যে সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছিলেন, তাহাই শুনাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিলেন। অমলও পল্লী-সংস্কারের কথা ছাড়িয়া এই পল্লীবৃদ্ধের সঙ্গেই সরল হাস্যামোদে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। খুড়োমহাশয়ের প্রকৃতি অমল দুদণ্ডের আলাপেই বেশ ধরিয়া লইয়াছিল।

খুড়োমহাশয় চা পানান্তে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলিলেন,—কি হে ভায়া, তোমাদের এখানে ধূমপানের ব্যবস্থা নেই? আমি হাত দিয়া সিগারেটের কৌটাটা আগাইয়া দিয়া, নিজেও তাহা হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলাম। অমল সিগারেট না ধরাইয়া পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল। সিগারেট ও বিড়ির ধূমের পানে তৃষিত নয়নে চাহিতে চাহিতে খুড়ো মশায় কহিলেন, এ বুড়ো বয়সে আর ও সব অনাচার কেন ভায়া—একটা থেলো হুঁকো টুকোর যোগাড় হবে না তোমাদের বাসায়? এ বয়সে ও সব সাহেবী ধূমপান আমাদের ধাতে সইবে কেন?

অমল কহিল, 'খান নি বুঝি কখনো খুড়ো—আচ্ছা, বিদেশী অনাচার

সিগারেটগুলো নাই বা খেলেন, আমাদের দেশী জিনিসের তৈরী বিড়িই এক-আধটা খেয়ে দেখুন না।

খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, তা ভায়া, তোমরা খাচ্ছ যখন, তখন আমাদের খেতে আর আপত্তি কি থাকতে পারে? শাস্ত্রেই আছে—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা—অর্থাৎ কি না মহাজনের পথই সব সময় গ্রহণ করতে হবে। তা তোমরা হচ্ছ বিদ্বান্ পণ্ডিত, সর্ব্বোপরি দেশের রাজা; তোমরা যা করবে, সেইটাই হবে দেশাচার—তাই চলবে, তাই দেশের সকলে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই বলতে বলতে খুড়ো মশায় একটি সিগারেট কৌটা হতে বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। খুড়ো মশায় সিগারেটের ধূমপান কচ্ছেন, এমন সময় তামাকও এসে উপস্থিত হোল। খুড়ো বাম হাতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি ধরে দক্ষিণ হস্ত হুঁকোর জন্য প্রসারিত করে—এ্যাস-ট্রের উপর সাবধানে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটির অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ধীরে ধীরে হুঁকো টানিতে টানিতে বলিলেন, তা যাই বল তোমরা, হুঁকো টেনে —তামাক খেয়ে যে শান্তি, তোমার অনেক দামের সিগারেট খেলেও সে শান্তি নেই।

এমনি নানা গল্প চলিতে চলিতে বেলা অনেক হইয়া গেল। অমল অন্য দিন আসিবে বলিয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া পড়িল। খুড়ো মহাশয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অমল উঠিয়া যাইতে, খুড়ো মহাশয় বলিলেন, এ ছেলেটি কে ভায়া—বেশ রসবোধ আছে। তবে পাড়াগাঁয়ের দিকেও খুব ঝোঁক দেখলুম।

হাঁ খুড়ো মশায়—অমল খুব ভাল ছেলে, আমাদেরই বাল্যবন্ধু। এম-এ পাশ, আর সেও যে সে পাশ নয়, একেবারে প্রথম পাশ। পাশ করেই

আবার বড় কলেজের প্রফেসর হয়েছিল। এখন স্বদেশী হুজুগে কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে, কি করে দেশের উন্নতি করবে, তাই ভাবছে। দেশে আমাদের অনেক জমি জমা অমনি-অমনি পড়ে রয়েছে,—তাই অমলের ইচ্ছা, দেশে গিয়ে যদি কোন একটা ভাল কাজ করা যায়।'

খুড়ো বলিলেন, সে তোমরা ইচ্ছা করলে দেশে অনেক কাজই করতে পার ভায়া। তোমাদের দ্বারা যা সম্ভব, তা আর কি কারো দ্বারা সম্ভব হবে? ও নির্ম্মলে আর প্রসাদ ছোঁড়া যতই যাই কেন না করুক, ওরা তাল সামলাবে কোথেকে? স্বদেশেই বল, আর বিদেশেই বল, অর্থ-বলই এখন মহাবল। অর্থ বিনা মুখের কথায় আর এখন চিঁড়ে ভিজবার জোটি নেই।'

খুড়োর কথায় হঠাৎ যেন হৃদয়-তন্ত্রীতে কেমন একটা আঘাত লাগিল। আমরা ইচ্ছা করলে দেশের অনেক কাজই যে করতে পারি—এ ধারণা তা হলে খুড়োও রাখেন।—আমাদের দ্বারা যা সম্ভব, সে কি আর কারো দ্বারা সম্ভব হবে! নির্ম্মল, প্রসাদ যা কচ্ছে—গ্রামের জন্ম তারা যে ভাবে স্বার্থ-ত্যাগ করে দিন-রাত খেটে মরছে, সে কি তবে আমাদের মত অর্থশালী লোকের একটু সহানুভূতি পেলেই সার্থক হয়? কোন সৎ চেষ্টাই যে সার্থক হয় না—অর্দ্ধ পথেই যত্ন চেষ্টা উৎসাহ নিভে যায়—এও কি, যাদের ক্ষমতা আছে, সেই সব দেশবাসীর শৈথিল্যেই? ভাবিতেছিলাম, এমন সময় খুড়ো বলিলেন, ভাবছ কি হে ভায়া—সুসংবাদ—সুসংবাদ! কি খাওয়াবে বল, তবে সংবাদ বলবো।

খুড়োকে বলিলাম, খাওয়ার জন্ম ভাবছেন কেন খুড়ো—যা চাইবেন তাই খাওয়ান যাবে—সংবাদটা কি বলুনই না।

খুড়ো আরও কিছুকাল টানিয়া তুলিয়া নানা ভূমিকা করিয়া কহিলেন, আরে ভায়া, সেই গুমোরভরা ছুঁড়িকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

আমি সাগ্রহে বলিলাম, কোন ছুঁড়ি খুড়ো মশাই ?

খুড়ো বলিলেন, সেই যে গয়লা বৌ—দেমাকে মাটীতে যার পা পড়ে না, আমাদের দিকে যে ফিরেই চায় না।

আমি বলিলাম, তাকে কি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন—না পিছনে আসছে ? কার সঙ্গে আসছে—নিজে ইচ্ছে করেই আসছে এবার, না জোর করে নিয়ে আসা হচ্ছে ?

খুড়ো বিজলির হাসি হাসিয়া কহিলেন, জোর করে কি আর এতদূরের রাস্তা এমন সোমত্ত বাজখাঁই মাগীকে আনা যায়! সে ভায়া অনেক কারসাজী করতে হয়েছে—অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তবে তো মাগীকে সুজুৎ করা গিয়েছে। হুঁকায় সজোরে দু'টি টান দিয়া শীতের শিহরণ দূর করিয়া খুড়ো কহিলেন, আমি যে খুড়ো, আমায় গ্রামের কে না চেনে বল। বেটী আমাদের কথা এড়িয়ে গিয়ে ভেবেছিলেন যে, বড় আশ্রয় পেয়েছেন ; তার পর তুমি চলে আসবার পর এমনি অবস্থা করে তুললেম যে, যাঁদের বাড়ী রয়েছেন, তাঁরা পর্য্যন্ত আর চোখে পথ দেখতে পান না। এখন সামাল-সামাল রব উঠে গেছে—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছ অবস্থা। নির্মলে আর পেসাদ ছোঁড়ার যা অবস্থা করেছি—বাছাধনদের এখন গাঁয়ে থাকাই কষ্টকর—সমাজে বন্ধ হব-হব অবস্থা। আরে ভায়া, এত কাল আমরা গাঁয়ে কাটিয়ে, গাঁয়ের ভাল মন্দ সব অবস্থার ব্যবস্থা করে, উঁচু মুখে চলে এলাম,—আজ কিনা দুটো ছোঁড়া এসে মাতব্বরী ফলিয়ে আমাদের সেই উচ্চাসন কেড়ে নেবে! এ কি হয়, না হ'তে পারে ?

খুড়ো মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়া কহিলাম, তার পর, গয়লা বৌ এখন আছে কোথায়?

সে এই এলো বলে ভায়া—দেখো, এবার এসে পায়ে কেমন করে লুটে পড়ে সে! ঘুঁটেকুড়ুনির রাজরাণীর অবস্থা করে দিচ্ছি, সে সইবে কেন? আরে আমরাই না হয় বুড়ো হাবড়া লোক, আমাদের দিকেই না হয় তোদের নজর না পড়ল। কিন্তু আমাদের কমলবাবু হেন বাবু— তিনি যে অনুগ্রহ করে তোর দিকে নেক নজর দিয়েছেন, সেই না তোর কত ভাগ্যের কথা! তাও যেন ছুঁড়ির মন ধরে না! এইবার দেখা যাবে! এই ভায়া, বিন্দু তাকে নিয়ে এল বলে। আমি সব ঠিক করে এসেছি—বিন্দু আর হরেকেষ্ট তাকে নিয়ে আসছে। দু' চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

খুড়োর কথায় বুঝিলাম, আমি গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার পর থেকে তাদের উপর যতটা অত্যাচার করা সম্ভব হতে পারে, তা খুড়ো করেছেন। আমি যে খুড়োর পাপকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা, সেও হয় ত আরো রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। আমি এ ব্যাপারের মধ্যে আছি—এমন জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে আমার নাম সংশ্লিষ্ট, এতে আমার যেন একটা ভয়ানক লজ্জা বোধ হতে লাগল। নিজের কাছে নিজের লজ্জা, নিজের এতকালের শিক্ষা-সংস্কারের বিরুদ্ধ কার্য্যে সে লজ্জা তো আছেই; তার উপর মা—যাঁকে মা বলে ডেকেছি, যে প্রসাদের মার কাছে মাতৃস্নেহ পেয়েছি, যে স্নেহরসে বঞ্চিত হয়ে অন্তর আমার শুষ্ক কঠোর মরুভূমির মত হয়ে গিয়েছিল, যাঁকে পেয়ে হৃদয়ের সেই শুষ্ক উৎসে আবার আমার স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই মা—আমার এই দুর্ব্বলতার জন্য আমার কি ভাবছেন! কত না—কত কি তিনি তাঁর পুত্রদের দিয়ে আশা করেন,—তাঁরই পুত্রস্থানীয় হয়ে, তাঁর গর্ব্বের

কারণ হয়ে, আমিই তাঁর হেঁট মুখ করাবো। নির্ম্মল, প্রসাদ যখন এ কথা শুনে তাদের দিদির কাছে—মায়ের কাছে যাবে, তখন তাদের মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে যে সব কথা উচ্চারিত হবে, মায়ের আমার অন্তর কি তাতে ফেটে যাবে না!—চিত্ত কেমন যেন বড় চঞ্চল—উন্মনা হয়ে উঠল।

খুড়ো আমার উন্মনা ভাব দেখে বললেন, ভায়া, কিছু তুমি ভেবো না—এমন ভাবে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, কাকে কোকিলেও কিছু জানতে পারবে না।'

গয়লা বৌর কথা

গভীর নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। এত অন্ধকার যে কোলের মানুষও চেনা যায় না। আজ রাত্রে বিন্দুমাসীর বোন-পো হরেকৃষ্টের সঙ্গে আমার নিজ গাঁ ছেড়ে দূর অজানা দেশে যাত্রার দিন। আমার ভাবনার যে অন্ত নাই—আজ আশ্রয় ছাড়িয়া আমি নিরাশ্রয় অকূলে ভাসিতে যাইতেছি! কেন—কেন! এই কেনই শতবার শত প্রশ্নরূপে আমার মস্তিষ্কে উদিত হইয়া সমস্ত দেহকে কাঁপাইয়া শরীর মন অবসন্ন করিয়া দিয়া যাইতেছে।

কাহার কাছে কি জিজ্ঞাসা করিব! যাঁহাদের সস্নেহ আবরণ আমাকে সর্ব্ব বিপদ উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া আজ আমাকে আশ্রিতা করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের কাছে কোন মুখ লইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইব যে, তাঁহাদের ছাড়িয়া আমি অকূলে ভাসিতে যাইতেছি—তাহাতে তাঁহাদের মত কি! আশ্রয়দাত্রী ও আশ্রয়দাতাদের মত আমি জানি—আমাকে এরূপ অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে দিতে তাঁহারা কখনই মত দিবেন না।

নারী যে কত অসহায়—কত নিরাশ্রয়, কত ক্ষমতাহীন, কত তুচ্ছ—বার বার করিয়া আজ সেই কথাই আমার মনে হইতেছে। হায়! যদি নারী হইয়া জন্মগ্রহণ না করিয়া পুরুষ হইয়া জন্মিতাম, তবে তো আর এ দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা আমায় সহিতে হইত না! যেথায় ইচ্ছা সেথায় চলে যেতে পারতেম। লজ্জা, ভয়, গ্লানি, পদে পদে আর এমন নির্ম্মম ভাবে অন্তরের ইচ্ছাকে সবলে আঘাত করে মুষড়ে দিতে পারতো না।

পোড়া রূপ না কি আমার বড়ই উজ্জ্বল; কিন্তু রূপের যে প্রভায় অন্ত-

রের আকাঙ্ক্ষারাশিকে জাগ্রত করে তোলে, বাসনায় ঘৃতাহুতি দেয়, এ রূপের তেমন দাহিকা শক্তি এ পর্য্যন্ত আমি কোন দিন তেমন ভাবে অনুভব করি নাই। বাল্যে—অতি শিশুকালে বিয়ে হয়েছিল; বিয়ের বছর খানেক পরেই—ধর্ম্মতঃ যিনি আমার স্বামী হয়েছিলেন, তিনি ম্যালেরিয়া প্লীহায় ভুগে ভুগে মারা যান। শিশুকালেই স্বামীহারা আমি। যে বয়সে মেয়েরা সব পুতুল খেলা খেলে, সেই বয়সেই সংসারের খেলা—স্বামী-স্ত্রীর খেলা আমার সাঙ্গ হোল। নারীর মাতৃত্বের সহজাত যে প্রবৃত্তি, সে প্রবৃত্তি আমার বিকশিত হ'তে পারল না। শ্বশুর ঘর করতে এলাম,—ছেলেখেকো বেটার বৌকে আর কবে কোন শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ভাল নজরে দেখে থাকেন! তাই আমি হলুম তাঁদের সবাইকার একটা আপদ—চক্ষুশূল মাত্র। এখন আমি সংসারের একটা বোঝা মাত্র—বোঝাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেল্লেই যেন সংসারের সকলে বাঁচেন। বোঝা সত্যি, ভারও সত্যি,—কিন্তু প্রাণ-হীন জড়পদার্থের বোঝা তো নয় যে, নামিয়ে ফেললেই তার ভারের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবেন।—তাই আমার ভার নামাবার উপায় আবিষ্কারের চিন্তায় তাঁদের যে মাথা ব্যথা ও মুখ ব্যথা হোত, তাতেই আমি হাঁপিয়ে উঠতাম।—মনে হয় কেন আবর্জ্জনা—সকলের জঞ্জাল হয়ে এ ভাবে অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করি! কি সার্থকতা, কি লাভ এ জীবনে। এ জীবনপাতে, এ সংসারে একটি প্রাণীও নেই যে, এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করে—এক বিন্দু চোখের জল ফেলে! নিজের কাছেও এ জীবন কবে থেকে যে একটা বিষম অসহনীয় ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে আজ ভাল করে মনেই পড়ে না।

জ্ঞান হবার সময় থেকেই দুর্ব্বহ জীবনের এই ভার বোঝা বইছি।

গলগ্রহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার কোন সহজ ও বৈধ পথ আছে কি না তাই খুঁজছি—কিন্তু পথ আর মিলছে না! কোন ফাঁকে দেহ ও মনের আর একটা উপসর্গ এসে জুটেছে—সেটি হচ্ছে যৌবন। বামুন পাড়ার হরিমতি সই একদিন হাস্তে হাস্তে বলেছিলেন—সই লো সই—যৌবন বড় বিষম কাল—সখী সাবধান।''

হাঁটতে দোষ, বসতে দোষ, চলতে দোষ—পদে পদে দোষ! যে দোষের জন্য বাড়ীর লোকের কাছে পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতেম, যে দোষ আর করবো না—মনে মনে হাজারো বার এই সঙ্কল্প করতুম, আবার হয় তো তেমনি আর একটা দোষই করে বসতুম। বুঝতে পারতুম না নিজে কোথায় কি ভাবে কি দোষ করে ফেলেছি। যৌবন আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য যতটা ব্যস্ত অধীর হয়, তার চাঞ্চল্য ভেতরে বাইরে যতটা সুপ্রকাশ হয়ে পড়ে, তা ছাড়া তার চেয়ে বেশী কিছু আমার ভেতরে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল কি না, সে আমি জানি না। চঞ্চল যৌবনের চাঞ্চল্য যৌবন আপন প্রভাবেই আমার উপরে আমার অজ্ঞাতসারে বিস্তার করে যাচ্ছিল। চারিদিকে ছিঃ ছিঃ—ছ্যা ছ্যা,—চারিদিক হতে অসংখ্য নিন্দা গঞ্জনা, যৌবনকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা—ইহার মধ্য দিয়াও এই অনিচ্ছার জিনিষটি যে কি করিয়া নিজ রাজত্ব ছড়াইয়া যাইতেছিল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। যে বস্তুর আগমন নিজে বুঝি না ও জানি না, যাহার উপর নিজের কোন হাত নাই, যাহার প্রভাব এড়াইবার সামর্থ্য আমার কোন মতেই নাই, সে উপদ্রবের জন্য—আধিপত্যের জন্য আমার দুরদৃষ্টে এত লাঞ্ছনা ভোগ কেন?

এত দিন তবু ঘরে ছিলাম,—শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়েও মাথা গুঁজবার একটুকু স্থান ছিল,—এইবার পোড়া যৌবন আমায় সে স্থানটুকুও হারা করলে। এই পোড়া আগুনে ভরা দগ্ধ দেহটার উপর যে লোকের এত লোভ কেন পড়ে, তার কারণ তো আমি কিছু বুঝতে পারি না। কি আছে এতে, কিসের লোভে লোকে পাগল হয়ে এর পানে এমন করে ছুটে আসে?

ভাগ্যে যা ছিল তা হয়ে গেল। এই লজ্জাকর ঘটনা ঘটবার পর আমি আরও ভাল করে বুঝতে পারলুম যে কত অসহায় নিরাশ্রয় আমি নারী! যে নিরাশ্রয়, আশ্রয়-হারা নির্য্যাতিতা, সহস্রভাবে অন্তর-বেদনায় সদাই কাতরা, লোকে যেন তার উপরেই অত্যাচার করে, তাকেই আরো বেদনা দিয়ে সুখ অনুভব করে। নইলে জগতে এত থাকতে—এত সুন্দরী থাকতে আমার উপরেই বা এদের এত লোভ হবে কেন- আমার সহস্র লাঞ্ছনায়, আশ্রয়টুকু হতে আমায় দূর করে পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্তই বা এরা এত ব্যাকুল হয়ে উঠবে কেন?

দেহের বিনিময়ে—পুরুষের সম্ভোগের জন্ত এ ছার দেহ ছেড়ে দিলে, যে, দেহের আরাম যথেষ্ট মিলতে পারে, তা প্রথম শুনতে ও বুঝতে পারলুম সেইবার বাবুদের বাগান-বাড়ীতে গিয়ে। আমার তৃপ্তির জন্ত—আমার আরামের বিলাসের জন্ত কত রকমই যে আয়োজন হোল। তেমন আয়োজন যে আমার আরামের জন্ত কেউ কোন দিন করে দিতে পারে, ঐ ধারণা আমার কোন দিন ছিল না। এর ওর কাছে মাঝে মাঝে শুনতে পেতুম আমি সুন্দরী—যুবতী। এত দিন নিজ সৌন্দর্য্য কোন দিন আয়না দিয়ে দেখি নি—দেখবার সুযোগও হয় নি—! সেই বাগান বাড়ীতেই বড়

আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখেছিলুম—নিজের রূপ নিজে প্রথম দেখেছিলুম—যে রূপ যে যৌবন আমায় নিত্য লাঞ্ছনা দিচ্ছে --সে রূপ দেখে লোকে জ্বলতে পারে বটে!

তার পর আমার গ্লানি আমার লজ্জা এঁরা মাথায় করে নিয়ে, আমায় তাঁদের স্নেহময় কোলে টেনে আপন করে নিয়েছেন। যে হাসিমুখের আদর-কথা জীবনে কোন দিন লাভ করি নাই, আজ এঁদের কাছে তা অজস্র অফুরন্ত পাচ্ছি—তার উপর আর একটি জিনিস যা পেয়েছি—তা আমার পক্ষে সব চেয়ে নূতন—সব চেয়ে গর্ব্বের! কি এ বস্তুটি—এ কথা মুখে বলবার সাহস আমার নেই—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিভৃতে নিরালায় এ কথা—সে মূর্ত্তি গোপন রেখেই আমার সুখ। আমার ছবি—এই হতভাগিনীর ছবি এঁকে তিনি তাঁর মাকে দেখাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর ঘরে গিয়ে পড়েছিলুম আমি। লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল—ভাল করে আমার নিজের ছবির পানেই আমি চাইতে পারলুম না। ছেলে মায়ের হাতে এই হতভাগিনীর ছবিখানি তুলে দিচ্ছেন, আর মা ছেলের হাতের আঁকা সেই ছবি হাসি মুখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ কচ্ছেন।

একবার—একবার মাত্র—পলক পড়তে না পড়তে ছবিখানি দেখে নিলুম। নিজের ছবি দেখে বিশ্বাস হলো না যে, আমি অভাগিনী এত সুন্দরী! এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য যে আমার আছে, সে আমার বিশ্বাসও হল না। এ যিনি ছবি এঁকেছেন তাঁরই স্নেহের পরিচয় এ চিত্রে শত ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে—তাই ছবিখানি এত সুন্দর দেখাচ্ছে। নইলে সুন্দর দেখাবার মত আমার মধ্যে তো কিছুই নাই!

দেখি—প্রাণভরে দেখবার সাহস নাই—যতটুকু দেখি—ততটুকু দৃষ্টিতেই প্রাণের সমস্ত আবেগ একত্র ক'রে দু'চোখ ভরে তাকে দেখেনি! কিন্তু এ যে মুক্ত—দেখে দেখে বাড়ে কেবল দেখারই পিয়াসা! মনে হয় অনন্তকাল ভরে তাঁকে এমনি দেখি—। মনের সাধ, মনের ইচ্ছা—কিন্তু এ তো পাপ নয়—এ ইচ্ছা তো মনের দুর্ব্বলতা নয়।

আবার ভাবনা—যাব কি যাব না। রাত্রি ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে—সব নিঝুম নিশুতি! মাঝে মাঝে শুধু ক্ষুধিত শৃগালগুলি এক একবার ডেকে উঠছিল—তাদের সেই শব্দ শুনে কুকুরগুলিও সাড়া দিয়ে উঠছিল। কি একটা বন্য পাখী যেন মাঝে মাঝে ভীষণ চীৎকার করে উঠছিল, সে শব্দে প্রাণ আমার শিউরে উঠছিল। কত রাত্রি—কত রাত্রি বা হয়েছে এখন—বিন্দু আর তার বোন-পো বোধ হয় এতক্ষণ আমার অপেক্ষায় এসে পুকুর ঘাটে যাবার পথে গাছের তলায় এসে লুকিয়ে রয়েছে। আমায় আশ্রয় ছাড়া করে নেবার জন্য ওদের এত আগ্রহ কেন? কিসের লোভে ওরা আমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে! সেও কি আমার এই পোড়া দেহ আর রূপের জন্য। এ দেহ নিয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে এই দেহ বিক্রয় করে খেতে হবে না কি! একেবারে দুর্দ্দশার চরম পঙ্কে গিয়ে পড়তে হবে! কি উপায়—কি করবো আমি।

ভাবতে ভাবতে কেমন ঘুমের মত হয়েছিল—জেগে দেখলুম, পিসিমা আমার পাশে বসে, আমার মাথায় হাত রেখে আমায় ডাকছেন! আমায় চোখ মেলে চাইতে দেখে পিসিমা বল্লেন 'মালতী—ঘুমের ঘোরে অমন করছিলে কেন মা?'

পিসিমার সস্নেহ বচনে আমার চোখের অশ্রু যেন আর বাধা মানিল

না ! হৃদয় আমার যেন পাষাণ ভারের চাপে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল—এতক্ষণে জমাট পাষাণ চাপের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম !

পিসিমা আমার গায় মাথায় তেমনি করে হাত বুলোতে বুলোতেই বললেন 'লক্ষ্মী বাছা আমার, এমন করে কাঁদছিল কেন ? কোন দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলি বোধ হয়। ছিঃ মা—স্বপন দেখে ছেলে মানুষের মত কাঁদতে নেই—এই ত আমি তোর পাশেই শুয়ে আছি। কি দুঃখ, কি অভাব তোর—কোন চিন্তা নাই—শুয়ে ঘুমো। কাল তোর স্বপন শুন্‌বো !

পিসিমা উঠে গিয়ে শোবার পরেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একে শীতের রাত, তার উপর টিপ টিপানি বৃষ্টি—মনে হয় পাহাড় ভেঙ্গে যেন শীত নেমে আসছে। এই শীতের রাত্রে আমি আমার এই পরম স্নেহময় আশ্রয় ছেড়ে কোন অজানা অচেনা রাজ্যে গিয়ে পড়বো। তারা চাইবে শুধু আমার দেহ নিয়ে ছিনি মিনি খেলতে, আমার হৃদয়ের ব্যথা এঁরা যেমন বোঝেন, এঁরা যেমন ভাবে আমার স্নেহ করেন, এমন স্নেহের ধন এমন ব্যথার ব্যথী আর আমি কোথায় পাব ! শুয়ে ভাবতে ভাবতে—কখনো ঘুমে কখনো জাগরণে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল।

সকাল বেলায় পিসিমা বললেন 'মালতী বাছা—কাল কি স্বপন দেখে কেঁদে উঠেছিলি মা ?'

বিন্দু মাসীর সঙ্গে যাবার প্রস্তাবের পর থেকে যত কথা আমার মনে কাল রাত্রে জাগছিল, সব কথা—একটিও গোপন না করে, পিসিমাকে আমি খুলে বললুম। শুনে পিসিমা একটিও কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখ পানে চেয়ে রইলেন। আমার চোখ ভরা জল দেখে পিসিমার

চোখও শুষ্ক ছিল না। কিছু কাল এমনি নীরব থেকে পিসিমা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন বাছা—তোমার ভার ভগবান আমাদের হাতে দিয়েছেন। যদি আমরা দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারি, সংসারে টিকে থাকতে পারি—তবে লক্ষ্মীটি, তুমিও আমাদেরই একজন হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে। অবশ্য তোমার নিজের যদি তাতে অমত কিছু না থাকে!

আমার আবার অমত কি হবে! নিজের স্বতন্ত্র মত বলে কোন দিনই তো আমার কিছু নাই। চিরদিন পরানুগ্রহে পরাশ্রয়ে পালিত, পরের ইচ্ছাকেই চিরদিন নিজের ইচ্ছা জেনে সযত্নে তা পালন করে এসেছি! আজ আশ্রয় পেয়ে করুণাময়ী আশ্রয়দাত্রীর ইচ্ছাকে অবহেলা করে নিজের কি স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিতে যাব আমি! আর আমার ইচ্ছার মূল্যই বা কতটুকু! যার ক্ষমতা আছে—সংসারে ইচ্ছার মূল্য তারই থাকতে পাবে। যার নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নাই, তার ইচ্ছার ক্ষমতা কতটুকু সংসারে! আমি সংসাবের যে কিছুই জানি না—নিজে স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে চলতে গেলে, পদে পদে সহস্র বিড়ম্বনা আর নূতন নূতন লাঞ্ছনা ছাড়া হয় তো আমার ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না!

পিসিমার কথা শুনে আমি তাঁর পা দু'খানি ধরে বললুম, মা—আমার নিজের জন্য কিছু না, আপনাদের আমার জন্য পাছে কোন কষ্ট হয়, সেই ভাবনাতেই আমি শান্তি পাই না।

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, পাগলী মেয়ে কোথাকার—সে যার ভাবনা সেই ভাববে। মাথায় উপর নির্ম্মল, প্রসাদ রয়েছে, আমি আছি—

আর সবার উপর নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রয়েছেন—ভাবনা কি লো তোর !

ভগবান ? ভগবান ? তবে দেবতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়রূপে তুমি আছ —তবে তোমার অনুগ্রহেই আমি এঁদের আশ্রয় পেয়েছি ! এ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাব আমি !

প্রসাদের কথা

মার কাছে আজ মালতীর কলকাতা যাত্রার প্রস্তাব শুনলুম। অসহায়া নারী আমাদের নিন্দার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছিল। আমি মনে ভাবি, যাদের এতটুকু ভাল কিছু করবার সাহস বা ক্ষমতা নেই, তাদের মন্দ করবার এতটা প্রবৃত্তি আসে কোত্থেকে। যত সব নিষ্কর্ম্মার দল বসে বসে দিবানিশি জোট পাকাচ্ছে, কি করে কাকে সমাজে বন্ধ করবে—কার ঘরে কটা সুন্দরী মেয়ে ছেলে আছে! পেটে এদিকে হয় তো অন্ন নেই—ঘরে হয় তো মা, বোন, পরিবার অন্ন বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ পরের ঘরের খুঁত বের করবার বেলায় এরাই দু'হাত দশ হাত করে এগিয়ে আসেন।

শক্তিমানের শক্তির হাত থেকে অসহায় দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমাদের মোটেই,—অথচ লাঞ্ছিতাকে আরও লাঞ্ছনা দেবার জন্য তাকে সমাজের বাইরে ঠেলে ফেলে দিতে, আমরা সকলের আগে ধেয়ে যাই। গ্রামের যাঁরা মুরুব্বি, যাঁরা মাথা, তাঁরাই গয়লা বৌকে ঘর থেকে ছিনিয়ে নেবার পাণ্ডা হলেন,—অথচ তাকে আশ্রয়টুকু দিয়েই যত পাপ করলুম আমরা! ইচ্ছা হয়—যদি ক্ষমতা থাকতো, সমস্ত গ্রামখানিকে কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়ে দিয়ে, আবার নূতন করে গ্রাম পত্তন করতুম। নীচতা হীনতা এদের সব অঙ্গের ভূষণ হয়ে গিয়েছে,—কোন উচ্চ ধারণা উচ্চ কল্পনা নেই এদের ভেতরে। নিজেদের সর্ব্ব-

নাশ এরা নিজেরা করবার জন্য অধীর আগ্রহে ছুটে চলেছে। যে বাধা দিতে যাবে,—এদের সর্ব্বনাশের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ভাল পথ দেখিয়ে দিতে যাবে,—সেই এদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে! গাঁয়ে এসেছিলুম কত আশা ক৩ কল্পনা নিয়ে,—এখন দেখছি, সব বুঝি পণ্ড হয়ে যায়, সঙ্কল্প বুঝি বা শেষ পর্য্যন্ত আর স্থির রাখতে পারি না। যে কাজে যাই, সেই কার্য্যেই পদে পদে পাই বাধা—উপকার ছাড়া অপকারের চেষ্টা কারো কোন দিন করি না—তবু সব্বাই মনে করে শত্রু। হিতৈষী যাঁরা, তাঁরাও বলেন 'ছেলে গুলো ক্ষেপেছে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ওদের প্রয়োজন কি।'

আজ যদি—কমল আমাদের সঙ্গে থাকতো, এই সব সৎকার্য্যে যদি তার একটু উৎসাহ পেতাম, তবে অনেক কাজই আমরা দুটি মামা ভাগ্নে মিলে করতে পারতেম। সে গ্রামেব জমিদার—তার অবস্থা ভাল—হাতে যথেষ্ট লোকজন আছে। তার কাছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কিছু না পেলেও, অনেকেই অনেক রকম প্রত্যাশা রাখে। তার মুখের যে কথায় কাজটা সহজ হয়ে যায়-- আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা করতে অযথা বেগ পেতে হয়। আশা ছিল, তাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে পারবো। সে শিক্ষিত যুবক, আমাদের সম-বয়সী, তার উপর তাব মনও ভাল। কিন্তু গ্রামের দুষ্টবুদ্ধি লোক গুলি যে কি মন্ত্রে তাকে বশ করে তাদের দলে টেনে নিয়েছে—সে আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না।

.মা বলছিলেন, বিন্দু কুটনীটাই গয়লা বৌকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য ফোঁসলাচ্ছে। গ্রামের খুড়ো মশাইও গ্রাম ছেড়ে ক'দিন

হল স্থানান্তরে গিয়েছেন। এই কলকাতা নিয়ে যাবার মধ্যে কমলদের কোন যোগ সাজস নেই তো ?

মা বলছিলেন, তিনি দিন কয়েকের জন্ম কলকাতায় যেতে চান আমারও সেই মত। মামা মাকে ও গয়লা বৌকে নিয়ে কলকাতা চলে যান, আমি বাড়ীতেই থাকবো। এর একটা শেষ না দেখে আমি যাব না—যেতে পারবো না।

মাকে আজ যখন মালতীর ছবিখানি দেখালুম—তাঁর হাতে তুলে দিলুম—মার কিন্তু তাতে বিরক্তির কোন ভাব দেখিনি। মা স্বচ্ছন্দ চিত্তে হৃষ্ট মনেই আমার হাত থেকে সে ছবি গ্রহণ করেছিলেন। আমার মাকে আমি জানি—মা এতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন না। মালতী কিন্তু আমার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ছবিখানি দেখে কেমন লজ্জিতা হয়ে ফিরে গেল। আমি কে, মালতীর কেউ তো নই—সম্পর্ক তো নেই,—তার উপর সে এক জাত, আমি এক জাত, তার উপর আমি পরপুরুষ! তার ছবিখানি আমি এঁকেছি—এতে তার লজ্জিত হবারই তো কথা! আমারই যেন এখন কেমন লজ্জা লজ্জা কচ্ছে!

অসহায় জেনে, আশ্রয়হীনা জেনে, মালতীকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম। তার থেকে কত কুৎসারই না রটনা হয়েছে! শুনেছি, আমার নামের সঙ্গে তার নাম রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। গ্রামের লোকের খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নেই,—একটা না একটা বাজে কাজ নিয়ে তারা থাকতে চায়। এ কুৎসায় আমি ভ্রূক্ষেপও করি না।

কিন্তু—কিন্তু-আমার অন্তর কি চায়—আগে তো এমন ভাবে অনুভব করিনি। একটি নির্য্যাতিতা রমণীর ছবি আঁকতে গিয়ে—হৃদয়ের

সৌন্দর্য্য দিয়ে সেই ছবিকে ফুটিয়ে তুলে, যখন ছবিখানি সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন মনে হোল, এ ছবি যেন আমার কতই নিজস্ব, কতই আপনার! ছবির সঙ্গে সঙ্গে ছবির সজীব প্রতিমাখানিকে পাবার জন্য, তাকে লাভ করবার জন্য অন্তর আমার এত ব্যাকুল হয়ে উঠছে কেন! এমন ভাবে কোন দিন তো কোন জিনিষ পেতে চাই নাই—আজ যেন সমস্ত হৃদয় তাকে একান্ত আপনার ক'রে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে!

আমি যদি সত্যিই তাকে চাই, তবে সেও কি আমায় চাইবে! তাকে পাবার জন্য আমার যেমন ব্যাকুলতা, আমাকে পাবার জন্য তার তেমন কোন ব্যাকুলতা আছে কি।

মা এসে বললেন, তা হলে প্রসাদ—আমরা কলকাতা যাব, তোর বাড়ী থাকাই ঠিক?

হাঁ মা। কবে যাওয়া হবে।

পরে বলিলাম, মামাকে বল, একটা ভাল দিন ঠিক করে নিতে। দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমরা চলে যাও।

মা'দের যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। যাবার সময় মাকে ও মামাকে প্রণাম করবার সময় মালতী এসে প্রণাম করলে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের মধ্যে যে এমন মাধুর্য্য থাকতে পারে, এ ধারণা আমি কোন দিন করতে পারি নাই। প্রণাম করে উঠতে, তার আর আমার চোখো-চোখি হোল। সে চোখ দু'টি যেন আমায় কি কথা জানাতে চায়,—হৃদয়ের কি ব্যথা যেন সে আমায় প্রকাশ করে বলতে চায়।

আমি মার দিকে ফিরে বললুম, মা, সব সময় আমায় চিঠি পত্র

লিখো, নইলে একা বাড়ীতে আমার মন মোটেই টিকবে না। আর দেখ মা, তোমার নূতন ছেলেটির সঙ্গে দেখা হোলে তাকে বোলো—সে যদি গ্রামে এসে আমাদের কাজে একটু সাহায্য কোরত, তবে এত দিন কত কাজ আমরা করতে পারতুম।

মা হেসে বললেন, কার কথা বলছিস্ রে তুই প্রসাদ ?

মামা বলিলেন, প্রসাদ কমলবাবুর কথা বলছে দিদি।

মা বলিলেন, কমল তোর সঙ্গে কথা কইবার জন্য তো কত চেষ্টাই করেছে,—তা তুই তো তার সঙ্গে কথা বলিস নি! বেশ, যদি কমলের সঙ্গে দেখা হয়, তবে তোর কথা বোলব!

মা'রা সব কলকাতা চলে গেলেন। শূন্য বাড়ী ঘরে যেন এক দণ্ড আর আমার মন তিষ্ঠোতে চায় না।

যাবার সময় মা'কে সব চেয়ে বেশী আনন্দিতই দেখেছিলাম,—বুঝেছি, সে কমলের আশায়! সারাক্ষণ মনে হয়, সত্যই যদি কমল মার কথা শোনে! তা হ'লে কি-না আমি করতে পারি এখানে! কিন্তু সে কি হ'বে—এই ভাবি।

৯

লেখিকা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

কমলের খেয়াল

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাল করে চোখ চেয়ে তখনও অমলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি,—মনে হ'ল, সে যে স্বপ্ন! সে তো স্বপ্নেই দেখা দিয়ে লুকিয়ে গ্যাছে। জেগে আর আমি তার কোথায় দেখা পাব! কি মধুর সে স্বপ্ন! সমস্ত প্রাণখানি জুড়ে বসে আছে। প্রাণখানি যেন সে মধুরতার স্পর্শে ডুবে গেছল,—টেনে তুলেছি, —এখনও তা থেকে মধু ক্ষরে পড়ছে।

স্বপ্নটা এমন কিছু না। অমল যেন আমার সঙ্গে আমাদের দেশে গেছে। না মানে সে রোদ, না মানে অন্ধকার, না বাছে সকাল-দুপুর। আমার হাত ধরে সারা গাঁ-টায় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যেথায় ছিল যত আতুর, দুঃখী,—সবাইকে ডেকে ডেকে জমিদার বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে; আর তাদের বলে দিচ্ছে—যাও, জমিদার সবাইকে আশ্রয় দেবে, আহার দেবে, বস্ত্র দেবে, রোজগারের পন্থা বলে দেবে। ব'লে আমার বাড়ীতে এসে, আমাকে দিয়েই খাজনাখানার তবিল থেকে টাকা নিয়ে, দু'হাতে তাদের দিচ্ছে আর বলছে, জমিদার তোমাদের এখনকার অভাব মিটিয়ে দিলেন,—ভবিষ্যৎ তোমাদের নিজের হাতে। তোমরা গড়তে থাক, তখন কারুর সাহায্যই তোমাদের আর দরকার হবে না। বলছে, আমি

তোমাদের চরকা গড়া শেখাব, কেমন করে' তুলোর গাছ জন্মাতে হয়, তা বলে দেব। সেই তুলো থেকে কেমন করে সূতা কাটতে হয়, নিজের হাতে তা দেখিয়ে দেব। ঘরে ঘরে স্ত্রীপুরুষকে তাঁত চালাবার উপায় দেখিয়ে দেব—তার পর তোমরা! তোমরা নিজেরা! আর কিছু বলতে হ'বে না, তোমরা আপনা থেকেই সুস্থ সবল হ'য়ে উঠ্‌বে!

শুনে সেই সব অভাগাদেরই বা কি উল্লাস! অমলের পাশে আমি চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আছি,—প্রজারা আমারই জয় গান করতে করতে যাচ্ছে,—অমলের তাতেই সে কি উৎসাহ!

বল্লে—কমল! আমি চোখের সামনে কি দেখ্‌ছি জানো?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি অমল?

সে বল্লে—আমার চোখের সামনে আমি দেখ্‌ছি, তোমার এত বড় জমিদারীর মধ্যে একটি দুঃখী নেই,—একটি অসুখী নেই! সব ভোর-পেট খাচ্ছে,—আপন আনন্দে আপনার ঘরে কাজ করছে,—হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। সকলের অবস্থাই সচ্ছল, কেউ কারু হিংসা করছে না, দ্বেষ করছে না,—সবাই সুখী। অল্প তাদের অভাব,—যা পায় তাইতেই সে'টা মিটে যাচ্ছে। দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে না,—যে যতটুকু পেয়েছে, সে তাতেই সুখী। চাষী যে যেখানে ছিল, সব লাঙ্গল ধরেছে। তাঁতি তাঁত চালাচ্ছে। আপন আপন পিতৃ-পিতামহের ব্যবসাতে সবাই আবার মন দিয়ে লেগে পড়েছে। গোলামী করতে, পরের জুতোর তলায় ধূলো মাখ্‌তে কেউ আর রেলের পথে ছুটে যাচ্ছে না। মাস-কাবারের দিন গুণে আর কোন অভাগাই দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে না। কমল, বাংলা দেশের মাঝখানে তোর এই রাজ্যটুকু অমরাতে পরিণত হ'য়েছে।

বেড়াচ্ছিল। স্বীকার করছি, সে দৃশ্য অতি মনোহর; কিন্তু সে আমি দেখ্‌তে চাইনে,—জন্মে অবধি কোন দিনই চাই-নি,—আজ-ও না। কি হবে দেখে! কার কি হল-না হল, ভেবে আমার লাভ?

[illegible] হোক্—উঠে পড়ি। রাত থাকে একটু থাক্, না-হয় ঘুম একটু কমই হ'ল একদিন;—জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার হাত থেকে ত নিস্তার পাব! শুনেছি, শরীর খুব খারাপ না হ'লে এমন জেগে-জেগে কেউ স্বপ্ন দেখে না,—এ না-কি ভারি অসুস্থতার লক্ষণ।

অসুস্থতার লক্ষণ—মনে হতেই সর্ব্বাঙ্গ যেন ভয়ে চমক দিয়ে উঠ্‌ল। গা শিড়-শিড় করতে লাগল। অসুস্থতার শেষ সীমা ভাবতে গিয়ে দেখি—মৃত্যু। মৃত্যুর পরের অবস্থা যে কি, তা আমি জানি নে। তবে এ আমি যে থাক্‌ব না, তা নিশ্চয়—নিশ্চয়! এই ত আমার মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন, দু'জনেই মারা গেলেন,—আর তাঁরা মা-বাবা রইলেন কি? তাঁরা ও জমিদারী, টাকা-কড়ি হীরা জহরত স্পর্শ করতেও আসেন না। সব পড়ে রইল,—তাঁরা সব সম্পর্ক কাটিয়ে চলে গেলেন। আচ্ছা, এমন যদি হত যে, মরে গিয়ে আবার জন্মে সেই আত্মীয়-স্বজন, সেই বাড়ী-ঘর, সেই সব ফিরে পাওয়া যেত—তা হ'লে কি সুন্দর হত। তা হ'লে বোধ হয় 'মৃত্যু' কথাটা শুনলেই এমন আঁৎকে উঠতে হত না। তা হলে আর অসুস্থতার ভয়েও আমাকে আজ এমন ভয় পেতেও হত না। কিন্তু সে ত আর হবার নয়!

আচ্ছা, আমি যদি মরেই যাই আজ, আমার এত বড় জমিদারী, এত প্রতাপ, এত প্রতিপত্তি—সবই আমাকে ফেলে চলে যেতে হবে! আমার বাপ মা'র আমি ছিলুম,—আমার ত তেমন কেউ নেই—আমার পরে যে এ

সব দেখবে-শুনবে ! তবে এ-সব কি হবে ? গবর্ণমেণ্ট নিয়ে নেবে, না পাঁচ ভূতে যার যেমন ইচ্ছে ভাগাভাগি করে নিয়ে সরে পড়বে !—নাঃ—উঠেই পড়তে হ'ল ! এ সব ভাবনা ভেবে কি শেষটায় মাথা খারাপ করে ফেলবো !

উঠ্‌লুম, খাট থেকে নেমে মাথার কাছেই দেওয়ালের গায়ে ছিল সুইচ-টা, টিপে দিতেই ঘর আলোয় ভরে গেল। দেখি, সবে দু'টো ! তাই ত ! রাত ত এখনও বহুৎ—কি কর্ত্তব্য ? খুড়োর শরণ নেওয়া, না আর একবার ঘুমের চেষ্টা করা ? মনে হ'ল, ঘুমের চেষ্টা করাই উচিত। তবে এমনি বোধ করি আর ঘুম হবে না। এক কাজ করা যাক্ ! চটিজুতোটা খুলে, পাশের স্নান ঘরে ঢুকে, হাঁটু পর্য্যন্ত পা দু'টি ধুয়ে, গোটা কতক কুলি করে, কাণে, মুখে, ঘাড়ে বেশ করে' জল দিয়ে, তোয়ালেতে মুছতে মুছতে খাটে বসে একটু চুরুট ধরিয়েছি,—চোখ দু'টোয় যেন একটু একটু টান পড়তে লাগল। ঘুম এলে এমনি টানই পড়ে।

আবার আলো নিবিয়ে শুলুম এসে ! খানিক পড়ে থাকবার পরই সেই অমল আর তার সেই সোণার বাংলা ! এবারে স্থির—বাধা দেব না,—দেখি না কোথায় গিয়ে ভাবনাটা থেমে যায়। দেখাই যাক্ না, ক্ষতি যখন এতটুকু নেই, মন্দ কি, অমল এলে গল্প করা চলবে। ভেবে,-পাশবালিশ-টাকে বুকের মধ্যে চেপে চক্ষু বুজে রইলুম।

সোণার বাংলার মাঠে মাঠে দেখি ধানের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, আর ঘরে ঘরে খটাখট শব্দে তাঁত চলেছে,—মেয়ে-মদ্দ এক সঙ্গে পথে-ঘাটে বিচরণ করছে। মেয়েদের সে দু'হাত লম্বা ঘোমটা নেই, পায়ে-পায়ে জড়াজড়ি ভাব নেই, খোলা মুখে, স্বচ্ছন্দ পায়ে পুরুষের মতই সোণার বাংলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যে আমি,—আমাকেও পথের এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাদের পথ

দিতে হচ্ছে,—তাদের মুখের দিকে কি দেহের দিকে দৃষ্টি ফেলবার সাহস হচ্ছে না। চোখ দিয়েই ত দেখতে হবে,—চোখ যে ওঠে না! ছেলে মেয়েরা সব পুরু পুরু কাপড় হলদে রঙে ছুপিয়ে প'রে হাত ধরাধরি ক'রে গান গেয়ে বেড়ায়। ছেলেদের চোখের কোলে সে কালো দাগ নেই, গালগুলি নিটোল, মাথার চুলে তেড়ী আছে কি-না দেখা যায় না,—মাথায় সব ছোট ছোট হলদে কাপড় জড়ানো; মেয়েরা—এক একটি যেন পদ্ম। প্রান্তরে গরু চরছে, মন্ত্রবলে হাড়গুলি সব ঢাকা পড়েছে, গাছগুলি ফলভারে অবনত। বাজারে এত জিনিষের আমদানী হয়েছে যে, লোকে কিনে নিয়ে যেতে পারছে না। সোণার বাংলায় পিলে নেই, 'নীবারণ' নেই, দেহে হাড়ের উপর মাংস গজিয়েছে; আর সবার নীচে যে খুব গাঢ় ও শীতল রক্ত প্রবাহিত – তা সোণার বাংলার অধিবাসীদের শুধু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কাছারীতে একটা নালিশ নেই, আদালতের শকুনী গৃধিনী সত্যিকারের ভাগাড়ে যাবার দিন গুণছে। আরও মজা এই হয়েছে,—হাঙ্গামা-হুজ্জোতের নাম না থাকায় স্বল্প-মাহিনায় পুলিসের লোক আর চাকরীতে টেঁকে থাকছে না,—তারাও হাল-গরুর দর যাচিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের লাল পাগড়ী আর সোণার বাংলার ছেলে-মেয়ের হলদে পাগড়ী দু'টোই দেশের লোক এমন-এক চক্ষে দেখছে যে, দু'য়েতে যেন আর একটুও প্রভেদ নেই। সোণার বাংলার দিকে দিকে শান্তি বিরাজিত, মাঠে-মাঠে, ঘরে-ঘরে তার গোলা ভরা ধান, গরুর বাঁটে তার অফুরন্ত সুধার সমুদ্র, বনে-বনে তার পাখীর গান, আকাশে তার নূতন-সূর্য্য চন্দ্র,—সুখ যেন এর থরে থরে মূর্ত্তি ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে!

এই সোণার বাংলা আমার! একান্ত আমারই! আমারই সেই জমী-

দারীকে, আমারই অত্যাচার-দগ্ধ গ্রামগুলিকে মিলিয়ে, যাদুকর অমল কোথা-কার এক যাদু দণ্ড বুলিয়ে এই সোণার বাংলা করে দিয়ে গ্যাছে! কি তার যাদুর প্রভাব, কি থেকে কি করেছে! ধন্য যাদুকর, ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার যাদুমন্ত্র!

স্বপ্ন বটে! যা কখনো হবে না, হতে পারে না, স্বপ্নে তারই একটা ছবি দেখিয়ে আচ্ছা বিব্রতই ত করলে আমাকে! এই স্বপ্নটির মধ্যেও কি কোনো যাদুকরের প্রভাব অবস্থান করে আছে! তা না হলে আমিই বা এ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি নে কেন! এই উদ্ভট সোণার বাংলার জন্যে আমার এ রাত্রি-জাগরণ ক্লেশ বহন কেন?

শেষ দেখতে গিয়ে দেখি, আমার জমিদারী বল্‌তে কিছু নেই, হীরা-জহরত, টাকা-কড়ি কিছু নেই। যাকে জিজ্ঞেস করি সেই দেখিয়ে দেয়—সোণার বাংলার দিকে! সবাই বলে, তোমার বাপ নাই,—মা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র-কন্যা নাই, অর্থ নাই, সম্পদ নাই, লালসা নাই, লোভ নাই, আছে শুধু ঐ সোণার বাংলা! যা তোমার ছিল, তা'ও ঐখানে, যা তোমার ছিল না, তা'ও ঐখানে! ঐ—সোণার বাংলায়! আর একদিন দেখি, আমার অঙ্গে সে সূক্ষ্ম বসন নেই, হস্তে সে অঙ্গুরীয়ক নেই, মণিবন্ধে ঘড়ি নেই—তাদের বদলে সোণার বাংলার এক মোটা কাপড় কটিতে, আর কোথাও কিছু আবরণও নেই, আভরণও নেই! লোকে বল্লে, তোমার সোণার বাংলা! আমার জমিদারী, আমার দেশ—এতক্ষণ যেন আমার ছিল না, তাদের মত নেংটি পরতে তবে 'আমার' হ'ল! শুধু তাই নয়, শুনলুম, আমি তাদের, তারা আমার, আমার ও তাদের সবাইকার এই সোণার বাংলা!

পাড়ায় একঘর মুসলমান ভদ্রলোক থাক্‌তেন, তাঁদের বাড়ীর সেই

পাখীগুলোর শব্দেই জানতে পারলুম, রাত্রি অবসান! বিছানা ছেড়ে উঠলুম, প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতে বসেই কাগজ খুলে দেখি, এ বছরের কংগ্রেসের সভাপতি সি, আর, দাসের অভিভাষণ বেরিয়েছে। হেডিংগুলো এত বড় অক্ষরে ছাপা যে, কেউ না পড়ে আর থাকবে না। আমার শোনা ছিল, এঁর মত বক্তা হাইকোর্টে তখন আর কেউ ছিল না, ইনি নাকি মকদ্দমার সময় জজদের দস্তুর মত ধমক দিয়ে কাজ নিতেন। তিনি যে পক্ষে যেতেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গলায় মালাটি না দুলিয়ে ছাড়তেন না। এদানীং ইনি সব ছেড়ে ছুড়ে খুব নাম কিনেছেন বটে, তার জন্যে আমার কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা ট্রদ্ধা হয় নি বেশী—তবে অদ্বিতীয় বক্তা আর প্রধান আইন-ব্যবসায়ী টিপ-টপ সাহেব বলে তাঁকে আমি চিরদিন একেবারে দেবতা করেই রেখে-ছিলুম,—তাঁর অভিভাষণটা না পড়ে পারলুম না। পড়তে দেখি, এও সেই সোণার বাংলা গড়বার কথা! সেই পল্লীতেই ফিরে যাও, পল্লীজীবনই জীবন…

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছল, দু চুমুক দিয়েই চাকরকে বল্লুম, খুব গরম খানিকটা চা আন্তে! স্বপ্নের নেশাটা কি এখনো ছাড়ল না, তারই জের এখন অবধি চলছে। খানিক গরম চা পড়লেই, ভেবেছিলুম স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে।

কিন্তু কাটল না। অভিভাষণ পড়া শেষ করে চুরুট ধরিয়ে ভাবতে লাগলুম—সত্যি কি সোণার বাংলা বলে একটা কিছু আছে? না

খুড়োমশাই এসে প্রথমেই বল্লেন, দেখ বাবাজী, ঐ সেই পুরুতগিন্নির কথাটা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। মাগী ঘর দোর ছেড়ে বাপের বাড়ী পালিয়েছে……

চাকর বল্লে, অমলবাবু!

পেছনেই অমল! হাতে খবরের কাগজ। মুখখানি যেন হাস্যবিকশিত! খুড়ো মশাইকে নমস্কার করে' আমার দিকে চেয়ে বল্লে—কাগজ পড়লি কমল?

মাথা নাড়লুম, পড়েছি।

অমল বল্লে—কি রকম পড়লি—দেশবন্ধুর...

বল্লুম, ও সব খেয়াল।

অমল চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, না-বসে চেয়ারখানা ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—খেয়াল?

বুঝতে পারলুম, কথাটা অন্যায় বলেছি। অত বড় একজন লোকের বাণী উপহাস করা উচিত হয় নি আমার!

ভয়ে ভয়ে বল্লুম, সবটা পড়ি নি এখনো।

ছিঃ কমল!

আমার মুখ শুকিয়ে গেছ্‌লো। অমলের ধিক্কারে নয়, নিজেরই অপরাধে! অমলের ধিক্কারটা শুধু আমাকে জানিয়ে দিলে, সে-টা কত বড় অপরাধ! কিন্তু ধীরে ধীরে তর্ক শক্তিও আমার জাগছিল, বল্লুম, দেখ, মুখে বল্‌তে পারেন সবাই, পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার আর দলাদলির ঠেলা যাঁরা পুইয়েছেন, তাঁরা কল্পনায় সোণার বাংলা·· হ্যাঁ অমল, ভাই, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি...

অমল বাধা দিয়ে বল্লে—থাক্ স্বপ্ন . .. কমল ম্যালেরিয়া হয় ত সবটা আমাদের করায়ত্ত নয়, তবে দলাদলির কথা যা বল্‌ছ, আমাদের যে মন্ত্র, তাতে দলাদলি হবার সম্ভাবনা কোন কালেই হবে না। যেখানে

সবাই মোটা কাপড় পরবে, মোটা ভাত খাবে, প্রাণপণ খেটে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবে—সেখানে দলাদলি স্থান পাবে না!

আমি বলতে যাচ্ছি, অমল, স্বপ্নেও আমি এই...

অমল বল্লে—শোন। এই কলকাতা সহরে দলাদলি নেই, কেন জান? এখানেও—গোলামীতে হোক, আর যাতেই হোক্, লোককে খেটে খেতে হয়, আপন-আপন অন্ন-সংস্থান করতে হয়, দলাদলি করবার সময় বা প্রবৃত্তি এদের নেই, পাড়াগাঁয়ে এখন পূর্ণমাত্রায় আছে আমি জানি, শুনেছি, অনেক স্থানে গিয়ে দেখেছি-ও, কিন্তু সে কেন আছে জান? কর্ম্মের অভাব আছে বলে! কাজ নেই, প্রচুর অবসর —তাই! আমি জানি, তাঁদের কাজ-ও নেই, অন্নও নেই, তারা এক রকম মরিয়া হয়েই এই সব অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়ে আছে। একবার তাদের কাজের সন্ধান দিয়ে দাও, পথ বাৎলে দাও, তাদের মুখও বন্ধ হয়ে যাবে। কলসীর জল ততক্ষণই ভক্ ভক্ করে, যতক্ষণ সে না পূর্ণ হয়। এদেরও অলস ও শূন্য অন্তরগুলিও কর্ম্ম দিয়ে পূর্ণ করে দাও, কোন গোল থাকবে না। কমল, সেই কর্ম্মের সন্ধানই দিতে হবে, সেই পাড়াগাঁয়ে যারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অ-মানুষ হয়ে পড়ে আছে, তাদেরই অঙ্গে বস্ত্র দিয়ে, উদরে অন্ন দিয়ে, মানুষ করে নিতে হবে। এই এখন আমাদের কাজ, এই আমাদের সাধনা! পূর্ণ করতে হবে, নইলে জীবনই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ভাই!

খুড়ো মশাই বল্লেন—যা বলেছ ভায়া! কাজ, কাজ, কাজ! সেই যে ছেলেবেলায় মেঘনাদবধ কাব্যে পড়েছিলুম,

যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর···

খুড়ো মশাই-এর স্মরণশক্তির নমুনা এর আগেই আমি পেয়েছি। খুড়ো মশাই একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছেন, অমল হঠাৎ আমার দু'টি হাত জড়িয়ে বল্লে, একবার তোর দেশটা দেখিয়ে দে, আর কিছু অর্থ দে,—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।...দিবি ?

আমি ভাবছি, অমল বল্লে,—বেশী না, যা তুই পারিস্, যা দিলে তোর কষ্ট হ'বে না, তাই··

বল্লুম, আমাদের ওখানে কাজ আরম্ভ করবি ?

করবো, করবো, কমল, তুই সহায় হ—যতটুকু চাস্··

তবে একদিন চল ·

অমল বল্লে—একদিন কেন বন্ধু ? আজই...

আজই ?

নির্ব্বিকার অমল—আজই !

গ্রামের পথেই প্রথম দেখা প্রসাদের সঙ্গে। সে কোন দিন আমার সাথে কথা কয় নি। আজ একেবারে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে আলিঙ্গন করে বলে উঠ্‌লো—তোমার কথাই ভাবছি ভাই ! এক মায়ের সন্তান আমরা, অথচ তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ? যাক্ —তুমি এসে পড়েছ ভাই, তোমার দেশ—তুমি নাও ; যা ভাল বোঝ কর। আমি চল্লুম !

কোথায় ?

কলকাতায়, মার কাছে।

মা সেখানে ?

হাঁা।

নির্ম্মল ?

সেখানেই ?

কবে গেলেন ?

পাঁচদিন, গয়লা-বৌকে নিয়ে গেছেন।

এস—বাড়ীতে বসে কথা কইব।

বলে তাকে টেনে নিয়ে গেলুম। অমল তাকে ছাড়বে না, বল্লে—আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

প্রসাদ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্লে—দু'দিন! দুদিনের জন্যে ছুটি দাও, আবার ফিরে আস্‌ব। একবার শুধু ..

বল্লুম—শুধু কি প্রসাদ ?

প্রসাদ গম্ভীরভাবে বল্লে—আজ নয়—আর একদিন বলব।

আর একদিন কেন ভাই ?

বল্লে—কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি নে ভাই। তবে একবার কলকাতা যেতে চাই! জানি নে কেন!

অমল বল্লে—তা মা'র সঙ্গে দেখা করে এস—একবার!

প্রসাদ হাঁপ ছেড়ে বলে উঠ্‌লো - কাল ভোরেই যাব!

আমি ত ভেবেই পাই নে, যে প্রসাদ চিরকাল মা'কে ছেড়ে সহরে পড়তো, হঠাৎ তার এমন ভাবটা হয় কেন ?

১৩

লেখক—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

প্রসাদের কথা

যে কথাটা আজ কয়েকদিন ধরিয়াই ভাবিতেছিলাম, তাহা যে এমন ভাবে ঘটিয়া যাইবে, তাহা তো জানিতাম না। কমলকে আমি কোন দিনই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সে যে তাহার ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মত ছন্ন ছাড়া দেশ-সেবকের সাথে যোগ দান দিবার জন্য হঠাৎ এমন করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিবে, ইহা যে একবারে অপ্রত্যাশিত! নিশ্চয় সে অমলের অনুপ্রেরণায় দেশে ফিরিয়াছে; এটা হয় তো তাহার খেয়াল! আবার দু'দিন পরে সব ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। তাহার দ্বারা যে কোন কাজ হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমার আজিও নাই! কিন্তু আমার নিজের শক্তির উপরেও তো আজ আমার খুব আস্থা নাই! আমি কলিকাতায় যেতে চাই—কেন? কিসের জন্য? আমি নিজেই তো মাকে বলিয়াছিলাম, যাইতে হয় তুমিই যাও মা, আমি দেশে থাকিব। আজ আবার সেখানে যাইবার এ দুর্নিবার ইচ্ছা আমাকে কেন পাইয়া বসিল? মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না বলিয়া? কখন না ছি! ছি! সে কথা ভাবিতেও নিজের উপরেই ঘৃণা হয়! প্রাণের সত্য গোপন

না করিয়া যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে, এ খেয়াল নিশ্চয় গয়লা বৌকে একবার দেখিবার জন্ম! এ হীনতার সঙ্কোচ লইয়া আমি মায়ের কাছে কেমন করিয়া দাঁড়াইব? তা হোক্, তবু যাইতে হইবে।

মামা কলেজ ছাড়িয়া দেশে যাইবার পর, আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। মায়ের চিঠিতে জানিলাম, যাঁহাদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা নাকি এত শীঘ্র কলিকাতায় অন্য বাড়ীর সন্ধান করিয়া লইতে পারেন নাই এবং সেই জন্য তাঁহারা এখন নীচের ঘরগুলা ব্যবহার করেন, উপরের ঘরগুলা আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়াই শুনিলাম, সহরে ট্রাম চলিতেছে না, চালকদল 'ষ্ট্রাইক্' করিয়াছে! ট্রাম থাকুক্ আর নাই থাকুক্, তাহাতে আমার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। খেজুর গুড়ের একটা কলসি সঙ্গে আনিতেছিলাম। এক হাতে লাঠি এবং অন্য হাতে কলসিটা তুলিয়া হন্ হন্ করিয়া পদব্রজেই বাড়ীর দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িতেই আমার মনে হইতেছিল, হয় তো গয়লা বৌ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, কিন্তু যে আসিল, সে একেবারে অপরিচিত। ভাবিলাম, নীচের ঘরের ভাড়াটেদের কেহ হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নির্ম্মলবাবু কোথা?

কবাটের আড়ালে অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়া লোকটা আমার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—নির্ম্মল বাবু কোন ঘরে আছেন বল্‌তে পার?

তথাপি সে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া? ভ্যালা বিপদ! কে এ? উপরের দিকে তাকাইয়া ডাকিলাম, মা!……মামা!

মামা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে রাস্তার গ্যাসের আলো আমার মুখের আসিয়া পড়িয়াছিল, চিনিতে দেরী হইল না! বিস্ময়াহতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে? প্রসাদ! আয়—আয়।

বলিলাম, ঘুমিয়েছেন নাকি মামা?… …এই লোকটাকে এতক্ষণ ধরে' জিজ্ঞাসা করছি, কিছু বল্‌তে পারে না।

মামা হাসিয়া বলিল,—ওকে জিজ্ঞেস করছিলি বুঝি?—লোকটা যে বোবা,—কথা বল্‌তে পারে না।

ততক্ষণে আমি উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলাম! বলিলাম, মা কোথায় মামা?

—তোর হাতে ওটা কি রে?

—খেজুর গুড়। সরসে বেড়ার গাছগুলো লক্ষ্মী পাশীকে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তারা দিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে এলুম।

মা আমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মামার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তাকাইতেই দেখি, সম্মুখে মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পশ্চাতে গয়লা-বৌ!

মা আমার মুখের পানে তন্ময় দৃষ্টিতে কি দেখিতেছিলেন জানি না,—হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন, ভাখ্ দেখি প্রসাদ, তোকে কেমন মানিয়েছে আজ। তোর কি আর 'আর্টিষ্টের' মত ছবি আঁকা সাজে রে। … … হঠাৎ চলে' আস্‌বার কারণ কি, বল্ দেখি?

জানি না কেন, মায়ের কথাটা শুনিয়াই গয়লা-বৌ হেঁটমুখে

সেখান হইতে সরিয়া গেল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ভাবিলাম, ছি, ছি, এ অন্যায় কেন করিলাম?

আমার হাত হইতে খেজুর গুড়ের কলসী লইয়া মা ডাকিলেন,—গয়লা বৌ……আচ্ছা থাক্, আমিই রাখ্ছি।

মা চলিয়া গেলে, মামা আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল গাঁয়ের নতুন খবর কি রে?

মায়ের কথাটা তখনও আমার কানে বাজিতে ছিল। কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছা তখন আমার ছিল না। বলিলাম, খবর ছাই আর পাঁশ। কমল দেশে ফিরে গেছে গ্রামের উন্নতি কর্বার জন্যে।

মামা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সে কি রকম শুনি?

অত শত কিছু জানি ন', মামা, কমল আর এক ছোক্রাকে কল্কাতা থেকে' ধরে' নিয়ে গেছে। বলে পল্লী সংস্কার কর্বার মতলব।……তাও ভালো।… তবে এটা সত্যি কিন্তু মামা, যে, তার সাহায্য পেলে আমরা অনেক কাজই কর্তে পারি। যদিও সেটা পাওয়া দুরাশা। হঠাৎ তার এমন পরিবর্ত্তন কেন হলো বল্তে পারি না।

মামা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কমল যে সেদিন এখানে এসেছিল। ……আমিই ডেকে এনেছিলুম তাকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেন?

দিদি বলেছিল।

তারপর, মা কি বল্লেন?

তা তো আমি শুনি নি প্রসাদ, জানি না, ওঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছে।

বুঝিলাম, মা-ই নিশ্চয় তাহাকে এ কাজে ব্রতী করিয়াছেন।

আচ্ছা মামা, তা'হলে সে আমার কাছে কথাটা গোপন কর্‌লে কেন? ..কিছু তো বল্‌লে না!

কি জানি। বলিয়া মামা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, মা জল খাবারের থালা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কমলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল মা? তাকে কি বলেছ?

মা একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তোকে সে কথা কে বল্‌লে প্রসাদ? —হ্যাঁ, হয়েছিল, কেন বল্ দেখি?

সে গাঁয়ে গেছে তার বন্ধু অমলকে নিয়ে। বল্লে,—কাজ কর্‌বে।

মা একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন, গেছে? গেছে? কমল গেছে সেখানে? আঃ বাঁচলুম।·· নে, খেয়ে নে আগে। অনেকখানি পথ এসেছিস্, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

মা আর কিছু বলিলেন না। আমি জল খাইতেছি, মা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যতবারই চোখ তুলিয়াছি, সে দুটি দৃষ্টির সহিত আমার চোখ মিলিয়াছে। মায়ের দৃষ্টি—জননীর স্নেহভরা, আশীর্ব্বাদভরা, মমতাপোরা দৃষ্টিতে সন্তানের চক্ষে লজ্জা আসিবার কথা নয়, কিন্তু এ কি নিদারুণ দৌর্ব্বল্য, প্রতি বারই চক্ষু নামাইয়া লইতে পথ পাইতেছিলাম না। থাকিয়া থাকিয়া মা'র সেই একটা প্রশ্নই খোঁচার মত হৃদয় কন্দরে জাগিয়া উঠিয়া লজ্জাভিভূত করিতেছিল। মনে হয়

কয়দিনের অদর্শনের পর সন্তানকে কাছে পাইয়া মাতার যে আনন্দের উদ্রেক হয়, মা'র ভাবে ভাষায় তাহা জানিতে পারি নাই। মায়ের কাছে পুত্রের আগমনের কারণ জানিতে চাহিয়া মা আমাকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যত ভাবি, সে একটা কথার কথা ছাড়া আর কিছু নয়, মনের সে খোঁচা দূর হয় না ; যত ভাবি, মা বাস্তবিক প্রশ্নটার কোন কারণ প্রত্যাশা করেন নাই, কিন্তু মন যে সায় দেয় না। সে যে ক্ষণে ক্ষণে সেই দুর্ব্বলতাটুকুকেই জাগাইয়া বলিয়া দেয় মা, সর্ব্বান্তর্যামী মা আমার মনের কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন। মার কাছে সত্য গোপন করিয়া অন্যায় করিতেছি, পাপ সঞ্চয় করিতেছি, দেশসেবাব্রতধারী সন্তানের ইহাপেক্ষা অন্যায় আর যে হইতে পারে না, তাহাও জানি ; তবু কেন যে এই গোপনতাকে আশ্রয় দিয়া এই জ্বালা সহিয়া মরি, তাহারও ত কোন কৈফিয়ত আপনাকেই দিতে পারি না। বিদ্রোহী অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া বলিয়া দিতে চায় সে ভালবাসিয়াছে, গোপনতার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়া এই সত্যই সে প্রচার করিতে চায় যে অন্তর্নিহিত ভালবাসার আকর্ষণই তাহাকে এত দূরে এইখানে টানিয়া আনিয়াছে। হোক অন্যায়, হোক পাপ—আমি পারি নাই ; আর ভালবাসায় যদি পাপ থাকে আমি পাপী ! তবু অস্বীকার করিব না যে ভালবাসিয়াছি।

কিন্তু কৈ, সে কথা ত বলিতে পারি না। কণ্ঠ যে তাহার সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে ! আমি যে মার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে চাই, কিন্তু কোথায় মুক্তি ? সব উৎসাহ কল্পনা—সবই যে লেজ গুটাইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়াছে, আমি যে কিছুতেই পারি না।

রাত্রে আহারাদির পর, বিছানায় পড়িয়া ঘুম কিছুতেই আসিতেছিল

না। এমন প্রাণ পোড়ানী অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলিতে হইবে জানিলে আমি কখনই মালতীর ছবি আঁকিতাম না। ছি! ছি! গয়লা-বৌ কি মনে করিবে, মা যে তাহার সুমুখেই আমায় বলিয়া ফেলিলেন, 'আর্টিষ্টের মত ছবি আঁকা আমার সাজে না।' সত্যই তাই! ছবি আঁকিতে শিখিয়াছিলাম কবে,—সে কোন্ কালে। ভাল লাগিত না বলিয়াই হোক্ বা অন্য কোন দিকের কোন প্রবল আকর্ষণেই হোক্ আমি সে বিদ্যা সমাপ্তও করিতে পারি নাই। তবে সেদিন সেই নিস্তব্ধ পল্লীর অলস মধ্যাহ্নে হাতে কোন কাজ ছিল না বলিয়াই আমার সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। না জাগিলেই ভালো হইত! মালতীর যৌবনশ্রীমণ্ডিত সলজ্জ রূপ-মাধুরী দেখিয়াই হয় তো আমার ভিতরের সুপ্ত শিল্পী মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে সুন্দরের সন্ধানে আমার মন ছুটিয়াছিল। কিন্তু—না, ভালো কাজ করি নাই!...সুন্দর চাই না আমি। আমি চাই যা বীভৎস,—যা অসুন্দর! আমি ভুলিয়া গেলাম কেন,—আমি যে রুদ্রের প্রসাদ! রমণীজন-সুলভ কমনীয়তা আমার মধ্যে থাকিবে না,—আমি শিল্পী নই। আমি লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা পরপদদলিতা মাতার একমাত্র সন্তান,—আমি দেশ-সৈনিক!......

ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিলাম। আমারই ঘরের এক কোণে আমার আঁকা মালতীর ছবিখানা কাপড় দিয়া মা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি ছবিটা তুলিয়া আনিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যেই প্রথমে হাত দিয়া বেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম! মেঝের উপর দিয়াশালাই জ্বালাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইতেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অন্ধকারে প্রথমে দেখিতে পাই নাই—আলোকের শিখায় দেখিলাম, মালতীর স্থির

শান্ত চোখ দুইটি তখনও যেন মিনতি কাতর ভাবে আমার পানে তাকাইয়াই আছে। ধীরে ধীরে সেটুকুও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ছাইগুলা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি যে হইয়া গেল বুঝিলাম না। মনে হইতে লাগিল, কাহার সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম।...বিছানায় শুইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম জানিতেও পারি নাই!

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির পর নিদ্রা বেশ গাঢ় হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। হঠাৎ চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর যে সংবাদটা কাণে আসিয়া পৌঁছিল, তাহা শুনিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। শুনিলাম,—মা বলিতেছেন, পয়লা-বৌ রাতরাত্রে দরজা খুলিয়া কোথায় চলিয়া গেছে—কেহ তাহার সংবাদ জানে না।

কমলের কথা

অমলের মত হাজারটা বন্ধু যদি আমার চোখের সুমুখে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিত, বা দিবারাত্র আমাকে তাহাদের দলে টানিবার জন্য উপদেশ দিত, তথাপি আমি আমার পথ ছাড়িতাম কি না জানি না! যে কলিকাতার প্রলোভন আমাকে একদিন এই পল্লীটির স্নেহ-শীতল কোল হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া নরকের আগুনে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমাকে সে আত্মহত্যা হইতে বিরত করিবার শক্তি এক 'মা' ছাড়া আর কারও ছিল কি না বলিতে পারি না।

আমার মত সর্ব্বস্বহারা স্নেহ কাঙাল রিক্ত ভিখারীর দল পলে পলে নিজেকে ধ্বংস করিতেই চায়;—আমার সেই জাগ্রত বিদ্রোহ-মূর্ত্তিটাই প্রসাদের চোখে পড়িয়াছিল, তাই সে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। মায়ের কোলের ছেলে, স্নেহ যত্নে প্রতিপালিত প্রসাদ, সে তো জানে না,—বাহিরে যাহাই হই না কেন, ভিতরে আমার কত বুক ভাঙা বেদনা—কত দৈন্যের হা-হুতাশ! এই ক্ষুধিত পাষাণের জঠরাগ্নির ক্ষুধা মিটাইতে পারে একমাত্র স্নেহ ভালোবাসা। আমাদের দুনিয়ার ইচ্ছাশক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা শুধু তাহাদেরই আছে, যাহারা হতভাগ্য বলিয়া করুণা করিয়াও কোলে মাথা দিবার একটুখানি স্থান দ্যায়! তাই আমাদের একটু খানিতেই পরাজয়,—শুধু স্নেহ আর ভালোবাসার কাছে। বাইরের ঐশ্বর্য্য সম্পদ দেখিয়া অনেকেই অনেক মিথ্যা দিয়া আমায় ভুলাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমাদের

কাছে মিথ্যা সত্যের প্রভেদ ধরা পড়িতে বেশী দেরী হয় না। এতদিন পরে যাহা পাইলাম,—আঃ! কি অনাস্বাদিত সুখ!……মা গো!

সেদিন মা ডাকিয়া পাঠাইলেন; নির্ম্মল ডাকিতে আসিয়াছিল।

মা বলিলেন,—কমল, এসো বাবা! একটি কথা বল্‌বার তরে আজ তোমাকে এখানে ডেকেছি…আমি দেশ থেকে ছুটে এসেছি শুধু এই জন্যে!

বলিলাম,—কি কথা, মা?

তিনি আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, কথা বেশী কিছু নয় কমল! 'মা' বলে যখন ডেকেছিস্ তখন আজ শুধু আমি জান্‌তে চাই—তুই আমার মত মায়ের ছেলে হতে পারবি কি না!

চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবার বলিলেন, বল্, কমল, হাঁ, বল্ পার্‌বি কি না! আমার পায়ে হাত দিয়ে শপথ কর্।

মায়ের মুখের পানে একবার তাকাইলাম। এমন কখনও দেখি নাই, এমনটি যে হইতেই পারে, জানিতাম না আঃ! সে কি মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি! আমার মাথার চুল হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কোলে লুটাইয়া পড়িয়া পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিলাম, শপথ করছি মা, যা বল্‌বে তাই করব।

মা আমাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, আমরা যে তোদের অনাথিনী মা, কমল! আমাদের চোখের জল আর কতকাল দেখ্‌বি বাবা! …দেশে যাও। স্বদেশের কাজে,—মায়ের কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়্। অনাচার অত্যাচারে দেশ ভরে গেছে, এ জ্বালা যে আর সইছে না বাবা! মায়ের বুকে মুখে পিঠে কশাইএর মত এ চাবুকের আঘাত, ছেলে

হয়ে কতকাল দেখ্‌বি বল!—সিংহী শাবক তোরা—আশীর্ব্বাদ করি, পুরুষের মত পুরুষ হও!

আমি ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিলাম। মা আমার মাথাটা তুলিয়া বলিলেন, দ্যাখ্ কমল, আজ যদি আমি তোর নিজের মা হতুম তাই মনে কর্ বাবা কমল, তাই মনে কর—আমিই তোর গর্ভধারিণী।

দেখিলাম, মায়ের চোখে অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে!

আমি মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিলাম,—তাই চল্লুম মা, মায়ের কাজেই চল্লুম।...কিন্তু প্রসাদকে এখন এ কথা জানাবেন না।

মা গম্ভীর ভাবে সজল চোখে বলিলেন,—যাও, আর কিছু বল্‌বার নাই!

আজিও আমার চোখের সুমুখে জগন্মাতার চোখের অশ্রু টল টল করিতেছে। সম্মুখে মায়ের কঠোর আদেশ;—মা ভৈঃ!

দেশে ফিরিয়া আজ দুদিনে বেশী কিছু করিতে পারি নাই। তবে কার্য্য প্রারম্ভেই যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি, তাহাতেই আশা ও আনন্দে আমার বুকখানা ভরিয়া উঠিতেছে!... মাগো, এ পরশমণির সন্ধান তো এতদিন পাই নি মা! এতদিন মরণের সন্ধানে ঘুরিতেছিলাম। দেখিতে পাই নাই, সম্মুখে আমার অনাগত বিপুলতা—চারিদিকে জীবনের ডাক!

আমার বন্দিনী মায়ের কাতর ক্রন্দন অনুরণিত আহ্বান, শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনায় মিলাইয়া যাইতেছে,—আর সেই সিংহী মায়ের তেত্রিশ কোটি শাবক কোন্ মৃত্যুগহ্বরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

অমল প্রথমেই চায় গ্রামে একটা আদর্শ বালিকা বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করিতে। সে বলে, দেশের জননীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, দুস্থ উৎপীড়িত ভারত তাহাদের নিকটে চায় বলবীর্য্যশালী সিংহ-শাবক। আরও কত কি করিতে হইবে. অমল একটা কাগজে পরের পর লিখিয়া যাইতেছিল, আর আপন মনে গাহিতেছিল,—

দিন আগত ঐ—

ভারত তবু কই ?

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে,

লউক বিশ্ব কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে,

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,

জাগ্রত ভগবান,

হে, জাগ্রত ভগবান!'

এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে খুল্লতাত মহাশয় একটা থেলো হুঁকা হাতে লইয়া মন্থর গমনে আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আঃ। কি বিপদ! এই লোকটার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কি কোন উপায় নাই। খুড়া মহাশয়কে কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম,— আবার কি জন্ত এখানে ফিরিয়া আসিলেন ভগবান জানেন।

তিনি আসিয়া বলিলেন, আমার আর কলকাতায় থাকা হলো না বাবাজী! একটা বিশেষ সংবাদ দিবার তরে আবার ছুটে এলুম, তোমার কাছে। শিকারটা এমন করে ফস্‌কে যাবে, কে জানে বাবা! বিন্দি আর হরেকেষ্ট এখানে না পেয়ে কলকাতা পর্য্যন্ত মালতীর পিছু পিছু তাড়া করেছিল, বুঝলে? তার পর ছুঁড়ি কাল রাত্রে নিজে থেকেই কোথা

পালিয়েছে শুনছি। তা যাক্, কতদিন বাবা, কতদিন,—আবার এলো বলে'।

কথাগুলা আমার মোটেই ভালো লাগিল না। কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে জীবনের এমন এক জঘন্য বৃত্তির মধ্য দিয়া পরিচয় হইয়াছিল, যে, তাহাকে দূর করিয়া দিবার মত কর্কশতাও আসিল না। অত্যন্ত দুর্ব্বল-ক্ষণের যে সঙ্গী, তাহার কাছে রোখ দেখানো অসম্ভব!

আজ মনে প্রাণে তাহার বিদায় কামনা করিতেছিলাম, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবারও সাহস হইল না। অন্তরের পশু আবার ইহার আহ্বানে পাছে জাগিয়া উঠে, আমি তাই ভাবিয়া কাঁপিতেছিলাম—

দরজার নিকট মিলিত কণ্ঠে চীৎকার উঠিল,—বন্দেমাতরম্! বন্দে-মাতরম্! বন্দেমাতরম্!

চাহিয়া দেখিলাম, কয়েকজন স্বরাজকামী স্বেচ্ছা সৈনিক। সর্ব্বাগ্রে প্রসাদ দাঁড়াইয়া আছে। অঙ্গে খদ্দরের উত্তরীয়, মস্তকে বাবুরি চুলের উপর বাসন্তী রঙের ফেটা বাঁধা হাতে এক মস্ত বাঁশের লাঠি! তাহার সৌম্য সুন্দর দিব্য পুরুষের বেশ দেখিয়া আমার দু'চোখ পুরিয়া জল আসিল। ডাকিলাম, ভাই।… ..আমার সিক্ত কণ্ঠে কাঁপিয়া উঠিল!

তাহারা সমস্বরে ডাকিল—এসো ভাই!

যেন কতদিনের পরিচয়, যেন কত আপনার! হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া বলিল, গাও—বন্দেমাতরম্! কমল, বল বন্দেমাতরম্!

ক্ষীণ করুণকণ্ঠে বলিলাম, বন্দেমাতরম্!

একজন বলিল, জোরে, আরও জোরে, কণ্ঠে যত শক্তি আছে—জোরে বল, বন্দেমাতরম্।

মালতীর কথা

লেখাপড়া জানি না, কাজেই ভালোমন্দ কোন্ দিকে গেলে কি হয় কিছুই বুঝি না। সমাজের অনুশাসন মানিয়া তাহাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে অনেক সময় অনেক কঠোর মিথ্যাবাদ মাথা পাতিয়া লইতে হয় বই কি! তবে এটা খুব জানি, মিথ্যার আবরণে প্রাণের সত্য যত দিন না ঢাকিয়া ফেলিব, তত দিন কোন অন্যায় অবিচার, আমার মনোবেদনার সৃষ্টি করিতে পারিবে না!

নারী যে আমাদের সমাজে কত বড় অসহায়া, তাহা আজ আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমায় ঘরে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া পিসিমার নামে ঘরে বাইরে কলঙ্ক রটিয়াছে। আর প্রসাদ?......যাক্, ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না, তাঁহার কি হইয়াছে না হইয়াছে! আমার জন্য যদি তাঁহারা কষ্ট পান, তাহা হইলে সাধ করিয়া তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া বাঁচিয়া থাকায় তো কোন লাভ নাই! আমি যাহাদিগকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসি, তাঁহাদের ক্ষতি হইতে দিব কেমন করিয়া?

পিসিমা তো কাল প্রসাদের সুমুখেই বলিলেন,—তাহার না কি আমার ছবিখানা আঁকা উচিত হয় নাই।... . তিনিই বা কেন এ দুর্ভাগিনীর ছবি আঁকিতে গেলেন?

না, না, আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করিতেই হইবে। বিন্দি মাসির সঙ্গেই তো চলিয়া আসিতে চাহিলাম, কিন্তু পিসি-মাই আসিতে দেন নাই, বরং নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া আমাকে লইয়া

কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রসাদ যে বলিয়াছিল, পিসিমা আসিলেও, সে কখনও কালকাতায় আসিবে না। আবার আসিল কেন?......যাক্, আজীবন আপন পর নির্ব্বিশেষে সকলের বেদনা দুর্ভোগ সৃষ্টি করিবার জন্য যাহার জন্ম, সে তো সুখের প্রত্যাশী হইতে পারে না!

আমি ভাবিতেছি,—আজ আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়া দাঁড়াইব কোথা? সমাজ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, ভগবানও কি এ অভাগীর তরে এত বড় দুনিয়ায় মাথা রাখিবার মত একটুখানি ঠাঁই করিয়া দিবেন না?..... একদিকে সমাজের অত্যাচার, অন্যদিকে আমাদের উপর নৃশংস পুরুষের অত্যাচারও তো কম নয়! একটু রূপ আছে. বলিয়া যে দেশের সহায়-শক্তি-হীনা দুর্ব্বলা রমণী, পুরুষের অত্যাচারের ভয়ে পথে বাহির হইতে পারে না, সে দেশের পুরুষেরা আবার পৌরুষের বড়াই করে কোন লজ্জায়? আমি যদি শিক্ষিতা হইতাম, আজ যদি স্বজন-পরিত্যক্তা বিতাড়িতা গয়লাবৌ না হইয়া অন্য কেহ হইতাম, তাহা হইলে মনে হয়, আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েগুলাকে আজ বিদ্রোহী করিয়া তুলিতাম, সমাজের কঠোর শাসনের নামে অত্যাচারের মুখে লাথি মারিয়া ঘর ছাড়িয়া দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়া এই খোজা গোলামের জাতিটাকে দেখাইয়া দিতাম, আমাদের শক্তি কিছু আছে কি না!...যাক্ কতদূর করিতাম, না করিতাম, সে ভাবিয়া আমার কোন লাভ নাই!

প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিনিদ্র কাটাইলাম। তখন রাত্রি কত ছিল, জানি না। চারিদিকে থম্‌থমে অন্ধকার, আর আকাশভরা অগণিত নক্ষত্র! ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া আসিলাম। ভগবানকে জানাইলাম, এ অভাগীর দোষ লইও না প্রভু!

সদর দরজা খুলিয়া যখন বাহিরে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম,—শ্যামবাজারের পথে তখন জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। রাস্তার পাশে আলোকের শ্রেণী নীরবে নিশা জাগিতেছিল।...কোন্‌দিকে চলিতেছি জানি না,—তবু চলিতে আরম্ভ করিলাম।

ক্রমে প্রভাত হইল, তখন বোধ হয় অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি। ভাবিলাম, পথে কোন বড় গৃহস্থের বাড়ীতে ঢুকিয়া একটা ঝিএর কাজ যোগাড় করিয়া লইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। রাত্রির অন্ধকারে একা একা রাস্তাটা বেশ চলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এই স্পষ্ট দিবালোকে পথযাত্রী অসংখ্য পুরুষের উদ্‌গ্রীব এবং ক্ষুধিত দৃষ্টির মধ্য দিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে পথ চলিতে চলিতে কেবলই পা দুইটা জড়াইয়া যাইতেছিল।

পথের পাশেই একটা বড় বাড়ী দেখিয়া ভাবিলাম, হয় ত' কোন ভদ্র-লোকের বাড়ী। ঢুকিয়া পড়িলাম। নীচে একটি ছোক্‌রার সহিত দেখা হইতেই আমাকে উপরে যাইবার ইঙ্গিত করিল। উপরে উঠিয়া দেখি,—ও মা, চারিদিকেই স্কুল কলেজের ছেলে। আমাকে দেখিয়াই, হয় ত বা নিঃসহায়া নারীর একটুখানি উপকার করিবার সদিচ্ছা মনে জাগিতেই, সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। সাদর সম্ভাষণ বড় কম পাইলাম না।—লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম! আর কোন বাড়ীতেই প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছিল না। পুরুষ গুলাকে দেখিয়া আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিতেছিল!...কিন্তু পুরুষহীন বাড়ী কোথায় পাইব?

মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল,—তবু আমার পথচলার বিরাম নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পথচলার ক্লান্তি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। কিন্তু— কোথায় যাইব? চারিদিকে বিদ্রূপ উপহাস আর লালায়িত প্রখর দৃষ্টি!...মাগো! পথের পাশে একটা কালী-মন্দিরের পাশে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নারীর সংখ্যাই অধিক। ভাবিলাম, ইহাদেরই মধ্যে কাহাকেও বলি,—যদি কেহ দয়া করিয়া একটু স্থান দিতে পারে।

'এক বর্ষিয়সী রমণী প্রণামান্তে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকেই বলিলাম।

তিনি আমার হাতে ধরিয়া আদর করিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিলেন, পাড়াগাঁ থেকে এসেছ? এসো বাছা এস, আমার সঙ্গে এসো! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা, নইলে ত বড় বিপদেই পড়তে বাছা! এসো, এসো।

কি বলিয়া যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব বুঝিলাম না। তিনি তখনও আমার হাতখানা ধরিয়া ছিলেন,—সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, আমরা জেতে গয়লা।

তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তাতে কি হয়েছে বাছা, গয়লা হ'লে বলেই কি ছুঁতেও দোষ! সে সব আচার বিচার তোমাদের পাড়াগাঁয়ে আছে। কলকাতা সহরে ও সব কিছু নেই—এসো।

অনেক গলি ঘুরিয়া তিনি যেখানে লইয়া গেলেন, দেখিলাম, একটা সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর কয়েকটা খোলার ঘর। ছোট ছোট এক একটা ঘর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো। অপরিসর উঠানের পাশেই একটা জলের কলের ধারে একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক একটা মাটির কলসীতে

জল ধরিতেছিল। পুরুষের নামগন্ধ সেখানে পাইলাম না ; ভাবিলাম,—তাও ভালো!

সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিতেছিল। কয়েকজন কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া আমাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিতে-ছিল।

একজন বলিল,—তা ভাই, যেমন সোমত্ত বয়েস আর রূপ, তাতে অল্প দিনেই দু পয়সা হবে। নিস্তারিণী দিদির ঘরেই থাক, ভালোই হবে···

কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল! এ কি! এ আমি কোথায় আসিয়াছি। এসব রূপ ব্যবসায়ী বারবনিতা নয় তো?

আমি ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া, আমাকে যিনি লইয়া আসিয়া-ছিলেন, তাঁহারই উদ্দেশে বলিলাম, আমি দেশে যেতে চাই!

এক প্রৌঢ়া আমার অঞ্চল ধরিয়া সজোরে এক হেঁচকা টান মারিয়া ফহিয়া উঠিল,—যাবি কোথা পোড়ার মুখী?

তাড়াতাড়ি আমাকে টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকাইয়া হড়াৎ করিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। দরজায় আঘাত লাগিয়া কপালের কতকটা অংশ কাটিয়া গেল। উঃ বলিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অন্ধকার ঘরের ভিতর অর্দ্ধ নগ্না-বস্থায় বসিয়া পড়িলাম।

সারাদিন কাটিয়া গেল, কেহ একবার খোঁজও করিতে আসিল না। বাঁচিয়াছি কি মরিয়া গেছি—মরিলেই ভাল হইত—দেখিতেও আসিল না। সন্ধ্যার পরেই নিস্তারিণী দু'টি বাবু গোছের লোককে সঙ্গে লইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটা তীব্র আলো ছিল, সেই আলোয় সারাদিনের অন্ধকার বাসের পর আমার চোখ জ্বালা করিতে

লাগিল, আমি চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কে বলিয়া উঠিল মাসী, আজ থেকে এই দুলাল বেটা তোমার শ্রীচরণের ছুঁচো ! এমন নইলে মাসী ! দাও মাসী, দাও, একটু পায়ের ধুলো দাও! বলিয়া লোকটা সত্যি সত্যিই নিস্তারিণীর চবণ ছুঁইয়া মাথায় হাত দিল।

নিস্তারিণী আনন্দ গদগদকণ্ঠে কহিলেন—কেমন বাবা দুলাল, মনের মত যোগাড় করে দিতে পেরেছি কি-না বল ?

মাসী! সাধে আর তোমার গোলামী করি বাবা! কিন্তু এ যে একে-বারে বন বেড়াল মাসী, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে।

বন বেরালই ঘরে থাক্‌লে ঘর বেরাল হয় বাছা, ভয় কি দুলাল, সাতটা দিন বাবা, তারপর...

আর বলো না মাসী, আর বলো না। এখন থেকে অত আশা করা কিছু নয়! লোকটা বোধ হয় আমাকেই গিলিয়া খাইতেছিল, বলিল—ছুঁড়ী বটে মাসী! সাধে কি আর বলি, মাসী, তোমা বই আর কারো নই।

আর একটা লোক ছিল, সে বলিল চল, চল ওঘরে নতুন মেয়ে মানুষের হেলথ্‌ পান করা যাক্‌ গে। সাতদিন পরেই যখন—এ্যা হ্যাঁ!

চলিয়া গেল! বসিয়া পড়িয়া ভগবানকে কায়মনে ডাকিতে লাগিলাম—প্রভু! এই সাতদিনের মধ্যে এই ঘরের চালে বজ্র ভাঙ্গিয়া দাও, মাটীর ভিত ভেদিয়া সর্প উঠুক, অভাগিনী বাঁচুক।

১১

লেখিকা—শ্রীগিরিবালা দেবী

প্রসাদের কথা

গয়লা-বৌ চলিয়া গিয়াছে। কথাটা বিশ্বাস করিতে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। আমার বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণ অব্যক্ত অসীম যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিতে লাগিল। আশা কুহকিনী কানে কানে কহিল 'সে যাইবে কোথায়? আশ্রয়হীনা গৃহহারার স্থান কোথাও যে নাই! সে আসিবে, আবার ফিরিয়া আসিবে।'

বারান্দায় দাঁড়াইয়া আগ্রহ উৎকণ্ঠা মনের মধ্যে লুকাইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে প্রভাতের চির পরিচিত হাস্যময় রৌদ্র সুউচ্চ তাল বৃক্ষের শীর্ষ হইতে ছাতের আলিসার উপর লুটাইয়া পড়িল। রাস্তার বিরল-পল্লব গাছের ডালে ডালে কাকের মেলা বসিল। নিস্তব্ধ রাস্তায় লোক চলা আরম্ভ হইল। বিচিত্র সকরুণ স্বরে ফিরিওয়ালা 'গরমাগরম' কি যেন হাঁকিতে লাগিল। কত কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা গঙ্গাস্নানে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বাম হস্তে গঙ্গা জল পূর্ণ ঘটী ও ডান হস্তে সিক্ত বস্ত্র, গামছা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সে আসিল না; আয়ত বিশাল নেত্রে মিনতি মাখিয়া, অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডলের কিয়দংশ ঢাকিয়া, রবিকর তপ্ত পুষ্প-মঞ্জরীর মত সলজ্জ মৃদুপদক্ষেপে সে আসিল না। আমার অনিমেষ পথ

চাওয়া বৃথা হইল। আমার আকুল প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি হতাশ হৃদয়ে বারান্দার কোণে বসিয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পর মা আসিয়া বলিলেন "তুই এখানে এমন করে বসে রইলি কেন প্রসাদ, নির্ম্মল গঙ্গার ঘাটে তাকে খুঁজ্‌তে গেছে; তুই অন্যদিকে যা। আমি পাড়ার ভিতর ঝিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কোথাও গয়লা-বৌকে পাওয়া গেল না। 'কোথাও গয়লা-বৌকে পাওয়া গেল না'—মার এই সাধারণ সহজ কথা-টার মধ্যে কি যেন নিহিত ছিল। এ ক্ষুদ্র কথাটি তীরের ফলার মত আমার মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইল। আমি আহত হইয়া বলিলাম, কোথায় আর তাকে খুঁজব মা? আর যদি তাকে না পাওয়া যায়?

পাওয়া যাবে বৈকি! সে তো বেশীদূর যেতে পার্ব্বে না; এখানকার পথ ঘাট ত তার চেনা নয় প্রসাদ!

মার আশ্বাসে ক্ষীণ আশার প্রদীপটি আমার অন্ধকার হৃদয়ে মিটি মিটি জ্বলিতে লাগিল। মরু-শুষ্ক হৃদয় জোয়ারের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল। আমি শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া মোটা চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া লাঠিগাছা হাতে লইয়া বাহির হইতে গিয়া দেখিলাম, আমার বিছানার পাশে কতকগুলি ছাই পড়িয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ রজনীর ঘটনাবলী স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আমি স্বদেশ সেবক, আমি সৈনিক; এই গৌরবে উদ্দীপ্ত হইয়া কাল আপনার হস্তে তাহার ছবিখানি ভস্মীভূত করিয়াছিলাম। হায় তখন কে জানিত, ইহা আমার মিথ্যা বিড়ম্বনা! অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! যাহার চিত্র পোড়াইয়াছি—সে যে আমার অন্তরের সিংহাসনে রাণীর গৌরবে বসিয়া রহিয়াছে। হৃদয় না পুড়িলে হৃদয়ের চিত্র তো মুছিবে না; লুপ্ত হইবে না। যাহার চিত্র পোড়াইয়াছিলাম—আমার হৃদয় সে যে কতখানি

অধিকার করিয়াছে, আজিকার মত কালও বুঝি,—এ সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই ; তখন ভাবিয়াছিলাম, একটি বার দেখিলেই আমার অশান্ত অন্তঃকরণ শান্ত হইবে। তার ম্লান অধরের মৃদু হাসির স্মৃতি বক্ষে পুরিয়া নবীন উৎসাহে নব উদ্যমে আবার আমি দেশের কাজে আপনার শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করিব! হায় কল্পনা,—হায়, আমার পরিণাম। আমার বিলম্ব দেখিয়া মা দ্বারের নিকট হইতে বলিলেন, বেলা হ'য়ে গেল, একটু জল খেয়ে, খাবার খেয়ে যা প্রসাদ, ফিরতে হয় তো দেরী হ'য়ে যাবে।

না, মা এখন কিছু খাব না, ফিরে এসে খাব—বলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় তাহাকে খুঁজিব? এ জনস্রোতের মধ্যে কোথায় তাহার দেখা পাইব? কিন্তু খুঁজিতে যে হইবে—ভিখারীর একটিমাত্র হারানো রত্নের মত, অন্ধের নয়নতারার মত, দুঃখীর সুখের প্রয়াসের মত, চির আঁধার যাত্রীর আলোক দর্শনের আশার মত তাহাতে খুঁজিতে হইবে। পথে পথে বস্তিতে, মন্দিরে, গঙ্গার তীরে তীরে তাহাকে খুঁজিতে হইবে।

আপনার মনে চিন্তা করিতে করিতে ভবানীপুরের পথে অগ্রসর হইলাম। কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে টানিয়া লইতেছিল। কত-লোক, কত রকমের পোষাক-পরিচ্ছদ, কত গাড়ী মোটর, রিক্সর ছুটাছুটি ; কিন্তু ইহার মধ্যে তো সে নাই, প্রতি স্ত্রীলোকের অবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া, বন্ধ গাড়ীর ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বিপ্রহরে আমি কালীবাড়ী উপনীত হইলাম। তখন মায়ের পূজা-ভোগ সমাধা হইয়াছে। মন্দিরে দুয়ার পড়িয়াছে। দোকানীরা দ্বার বন্ধ করিয়া আহার করিতে গিয়াছে। দুই

একটি নিষ্কর্ম্মা লোক কেবল মন্দিরের আসে পাশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছিল, আমি গঙ্গার ঘাটে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলাম। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া মন্দিরের চাতালে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। অবসাদে আমার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ক্লান্তিতে চক্ষু মুদিয়া আসিল। আমি মন্দিরের দেয়ালে দেহভার রক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া মালতীর স্মৃতির ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলাম। কিয়ৎকাল পর কাহাদের হাসির ধ্বনিতে আমায় দিবাস্বপ্ন অন্তর্হিত হইল। সচকিতে আমি দেখিলাম, কয়েকটি স্ত্রীলোক অদূরে খোলার ঘরে বসিয়া হাস্যালাপ করিতেছে। তাহাদের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইতেই চমকিয়া উঠিলাম। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার হৃদয়টি নাচিয়া উঠিল। উদ্বেলিত অন্তর পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল। ভক্তি বিন্যাসে আমি চাতালের উপর লুটাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম। আমার পশ্চাৎ হইতে পুনরায় হাসির ধ্বনি উঠিল। সসঙ্কোচে রমণীদের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম, দুইটি বর্ষিয়সী রমণীর নিকটে একটি অবগুণ্ঠনবতী তরুণী দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এ যে মালতী ছাড়া অপর কেহ একথা আমার মনে আসিল না। তেমনি অবয়ব, তেমনি অর্দ্ধ মলিন সরু পেড়ে কাপড়ে আপাদ মস্তক আবৃত, তেমনি ক্ষীণ দেহলতা সৌন্দর্য্যভরা, সবই তাহার, কেবল মুখখানি দেখিতে পাইলাম না। যাহা দেখিলাম, তাহাতেই মহাসুখে আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া উঠিল। আমি আস্তে আস্তে খোলার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলাম, মালতী, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

আচ্ছা, তা আসবে বৈ-কি! তুমি হলে মোদের বড় কুটুম্বি! বলি চাঁদ! তুমি হাঁট ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়। এস না চাঁদ, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করা যাক্। সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইতেই একটা যমদূতের মত কদাকার লোকের সঙ্গে চোখোচোখী হইল। আমি অপ্রতিভ হইয়া বিনীত স্বরে বলিলাম, আপনি কি বলছেন বুঝ্‌তে পারছি না; ওই যে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, ওকে খুঁজ্‌তেই আমি এখানে এসেছি। ও আমাদের মালতী।

হাঃ হাঃ ও তোমার মালতী—মল্লিকা নয় চাঁদ, এ আমার বড় সাধের টগর ফুল। বলিতে বলিতে সেই বিশ্রী লোকটা তরুণীর ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া জোর করিয়া তাহার মুখখানা আমার দিকে তুলিয়া ধরিল। আমি পলকের জন্য চাহিয়া দেখিলাম—যাহাকে মালতী ভাবিয়াছিলাম, সে মালতী নহে। কিন্তু যেই হোক্, ইহারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত; মুখখানি বড় মলিন। বড় বিষণ্ণ। সেও যে উৎপীড়িতা বিতাড়িতা দুঃখিনী এটা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। তরুণীর অজানিত ব্যথায় আমার হৃদয় আকুল হইল। আমি ধীরে ধীরে সেই যমরূপী মানুষটির পানে চাহিয়া বলিলাম, আমার অন্যায় হয়েছে চিন্‌তে পারি নাই, মাপ করবেন মশাই! লোকটি অঙ্গভঙ্গী করিয়া উপহাসের স্বরে উত্তর দিল, এবারের মত মাপ করেছি বৈ কি,—নইলে এতক্ষণ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হত আর কি? আজকের মত বেঁচে গেলে সোণা, ভাল মুখে শিখিয়ে দিচ্ছি—আর যা কর, কর, ঘোগের ঘরে সিঁদ কেটো না। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে রাস্তা ধরিলাম। একটা বীভৎস হাস্যধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার ভারাক্রান্ত মনটাকে আরো একটু ভারি করিয়া তুলিল। পথহারা

পথিকের মত লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনের কোলাহলের পর মুখর জগৎ শান্ত হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রগুলি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। প্রভাহীন মলিন চন্দ্রমা মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছেন। টবের সদ্যঃ প্রস্ফুটিত বেল ফুলের গন্ধে অলস সমীরণ উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়া দেখি, বারান্দায় মাদুরে বসিয়া মা চরকা কাটিতেছিলেন। পিল-সুজের উপরের উজ্জ্বল আলোটি মার মুখের উপর পড়িয়া সেই স্নেহভরা সুকোমল মুখখানি স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত হইয়াছিল। আমার সাড়া পাইয়া মা আশাপূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু খবর করতে পেরেছিস্ প্রসাদ ?

আমি মার পায়ের কাছে বসিয়া বলিলাম, কিছু খবর হল না মা। অনেক খুঁজেছি—কালীঘাট, ভবানীপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। মার গম্ভীর মুখ আরো একটু গম্ভীর হইল। মামা বাহিরে আসিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, খুঁজ্‌তে গিয়েছিস্ বলে এম্‌নি করেই কি খোঁজে প্রসাদ ? সেই সকালে বেরিয়েছিলি এতক্ষণে ফিরে আস্‌ছিস—কি খেয়েছিস্ ? বলিলাম, কিছু খাইনি মামা! সমস্তটা দিনের ভিতর খাওয়া হয়নি ; খুব করিছিস্! প্রসাদ! চট্ করে দুটো খেয়ে গিয়ে আবার কি খোঁজা যেত না! বলিতে বলিতে মা রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম—মালতী কি অপরাধে এমন করিয়া গেল। আমি আসিয়াছি এই অপরাধেই কি সে আমাকে চির অপরাধী করিয়া অনির্দ্দেশ্যের উদ্দেশে তাহার জীবন

তরণীটি ভাসাইয়া দিয়াছে? আমার হৃদয়ের গোপন কাহিনী সে কি জানিতে পারিয়াই এমনি করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমার অপরাধ, আমি তাকে ভালবাসিয়াছি, কিন্তু সে ভালবাসা তো কখনো তাহাকে জানাইয়া তাহার নিকট হইতে প্রতিদানের প্রত্যাশা করি নাই। চোখের ভাষায় আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু মুখের ভাষায় আমার অব্যক্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাস কখনো তো তাহাকে জানিতে দেই নাই! তবু—তবু সে কেন আমার হৃদয়-বীণার তারগুলি ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। অপরাধ, কেবল এইটুকু অপরাধ—ইহারই কি এত জ্বালা—এত বিষ! আর কোন দিন তো ইহার আস্বাদ বুঝি নাই। এ যে আমার নূতন অভিযান, নব উদ্দীপনা! শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। বাহিরে আসিয়া গ্যাসের আলোকে পথটির পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে পড়িল, কাল এমনি গভীর রজনীর নিভৃত নীরবতার মধ্যে সহায় সম্বল বিহীনা অভাগিনী এই পথেই প্রথম পা ছুটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। এ সেই পথ—তেম্‌নি আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। রাস্তার ছুই পাশে ছোট বড় বাড়ীগুলি সদর্পে মাথা তুলিয়া তেম্‌নি রৌদ্র বৃষ্টি সমানে উপভোগ করিতেছে। কিছুরই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল আমারই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে! এ পরিবর্ত্তন আমি আশা করি নাই, আমার স্বপ্নের অগোচর—অভাবিত, অপ্রত্যাশিত! আমি সেবক, আমি সন্তান, সব কাজ জলাঞ্জলি দিয়া অবহেলা করিয়া আমার কি রমণীর চিন্তা করা সাজে? আমি যে কঠোর, কঠিন, নির্ব্বিকার। সব হইতে স্বতন্ত্র, সুদূর। কিন্তু মন যে কোন যুক্তিই মানিতে চায় না, সে আমার শাসনের বহির্ভূত। যুক্তি নাই, তর্ক নাই, শাসন নাই, তাড়না

নাই, সে আপনার ধ্যানে আপনি ধ্যানী। তাহাকে কেমন করিয়া শান্ত করিব? সংযত করিব? কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাল লাগিল না। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াছি, পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। রাস্তার মোড়ে কোথাকার ফেরতা একটি যুবক পথ চলিতে চলিতে আপন মনে গাহিতেছিল—

'প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো,
চরণ চিররেখা আঁকিয়ে যে গো।'

গলার স্বরটি তেমন মিষ্ট না হইলেও গানটি আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। বিনিদ্র অবস্থায় বদ্ধগৃহে গিয়া বাকী রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বাহির হইতে দরজাটা টানিয়া দিয়া মালতীর উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। আমার মাথার উপর চন্দ্রতারা খচিত নীলাকাশ, সম্মুখে বাধাহীন প্রশস্ত রাস্তা; আমি মোহস্বপ্নাভিভূতের ন্যায় চলিতে লাগিলাম। কোথায় থামিব তাহা জানি না; কিন্তু চলার আমার বিরাম হইল না। অনেক দুঃখ অপমান সহিয়া দীর্ঘ দিবা, বিনিদ্র রজনী কলিকাতার পথে পথে উল্কার মত ঘুরিয়া আমার আশার ক্ষীণ আলোক শিখাটি হঠাৎ নিবিয়া গেল। হৃদয়ের তেজ উদ্যম আতস বাজির মত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। রহিল দুঃসহ দাহন জ্বালা, আর অবর্ণনীয় বিপুল ব্যথার ভার। কিন্তু মালতীর সন্ধান মিলিল না। ভাবিলাম কোথাও চলিয়া যাই,—কোন দূর দূরান্তরে ঘনগুল্মদুর্গম বনের ছায়ায় বসিয়া তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলি; কিন্তু যাইব কোথায়। পল্লীর শান্ত শীতল কোল, বাঁশবনের মর্ম্মর ধ্বনি, গোচারণের বিস্তৃত মাঠ—ঘুঘুর উদাস ডাক—ইহারা আমাকে

আকর্ষণ করিতেছিল, যাহারা বা আমার হৃদয় টানিতেছিল তাহাদের নিকটে ফিরিতেই মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মার কাছে গিয়া বলিলাম, আমি আজ দেশে যাব মা, রাতের গাড়ীটাই ধরতে চাচ্ছি!

মা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত তাড়াতাড়ি কেন প্রসাদ? আজই যাবি, কৈ আগে তো বলিস্ নাই?

এখনই ঠিক করলাম যাবার কথা মা। আর কিছু বলিলাম না,—বলিতে পারিলাম না। মা স্নেহভরা চক্ষে আমার পানে চাহিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম, তুমি আমার সব কথা জান মা; আমি দেশের কাজে অবহেলা ক'রে কেন এখানে এসেছিলাম। এ আমার পাপেরই শাস্তি মা। মা আমার মস্তকটি কোলের উপর টানিয়া কহিলেন, কিছু বল্‌তে হবে না প্রসাদ, আমি সব জানি বাবা। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, দেশের কাজই যেন তোর সব চেয়ে বড় কাজ হয়। সব চিন্তার ওপর দেশের চিন্তাই যেন প্রধান হয়। তোকে যে দেশ মায়ের কোলেই আমি সঁপে দিয়েছি প্রসাদ; তুই দেশের—দেশ তোর।

কি উদ্ধার, কি মুক্তি! মরুভূমিতে স্নেহ প্রস্রবণ! মুহূর্ত্তে অমৃত রসে আমার হৃদয় মন পরিপূর্ণ হইল। অন্ধকার মনোমন্দিরে জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ প্রজ্বালিত হইল। হৃদয়-বীণার তারে তারে ধ্বনিয়া উঠিল "বন্দে মাতরম্"। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া মার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলাম। আমি প্রেমিক, আমি ভালবাসিয়াছি, ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল আমি আর কারো নহি, কেহ আমার নহে,—আমি জননী জন্মভূমির একনিষ্ঠ সেবক। উৎপীড়িতা অপমানিতা জননীর আমি সন্তান, আর কিছু নহি।

কমলের কথা

কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া শুষ্ক মলিন মুখে প্রসাদের কলিকাতায় ছুটিয়া যাওয়া দেখিয়া সেদিন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার মন একটু ক্ষুব্ধও হইয়াছিল। কিন্তু মার মুখখানি স্মরণ হওয়াতে তখনই আমাব মনের সমস্ত মেঘ কাটিয়া গেল। এ অনাস্বাদিত অমৃতের সন্ধান পূর্ব্বে আমি জানিতাম না! এ স্বর্গীয় মধুর আস্বাদ যে পাইয়াছে তাহার জীবন সফল, ধন্য। মাতৃ-ভক্ত প্রসাদ যে মাকে দেখিবার জন্যই কলিকাতা গিয়াছিল, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিল না। আশা করিয়াছিলাম, প্রসাদ মাকে লইয়াই নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু অভিনব বেশে কয়েকটি সাথীর সহিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রসাদকে ফিরিতে দেখিয়া, তখন. আর তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না। প্রসাদ বাষ্পভরা কণ্ঠে ডাকিল ভাই, বল বন্দে মাতরম্! আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বন্দী করিয়া প্রতিধ্বনির মত বলিলাম, ভাই, বন্দে মাতরম্! আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। চক্ষে অশ্রুর ধারা ছুটিল। আমি বর্ত্তমান ভুলিয়া, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গাহিলাম, বন্দে মাতরম! এ কি মন্ত্র! এ কি উদ্বোধন সঙ্গীত, ইহার প্রভাবে সুপ্ত জাগ্রত হয়, প্রাণহীন প্রাণ পায়। আমার মধ্যেও যেন নবীন শক্তির সঞ্চার হইল।

শ্যামল দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত আম্র কাননের ছায়া-নির্জ্জন পল্লীর পথে মায়ের গান গাহিয়া সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিলাম! শ্রান্তিতে শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। যাহার কৈশোর, যৌবনের প্রারম্ভ বিলাসের স্রোতে আনন্দের

প্রলয় ক্রীড়ার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, সে কি কর্ম্ম-সাগরে ডুবিয়া এক দিনেই কর্ম্মবীর হইতে পারে? তাহার জীবনের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে। অবসন্নের মত বিছানায় শুইয়া চাকরকে 'চা' আনিতে বলিলাম। অমল হাসিয়া বলিল, কিহে ননীর পুতুল; নগর ভ্রমণ করেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে না কি? এখনো তো দেশের কোন কাজেই হাত দেওয়া হয়নি ভাই, সবে আরম্ভ, এখনই কাহিল হ'লে চল্‌বে কেন!

অমলকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, তোমাদের হতাশ হলে ত চল্‌বে না ভাই; ধীরে ধীরে আমায় গড়ে নিতে হ'বে; আমি যে একেবারেই নিষ্কর্ম্মা!

নিষ্কর্ম্মাই কদিন পর আবার বড় কর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌বে কমল! প্রসাদের কাছে কল্‌কাতায় কিছু নতুন খবর পেলে?

বলিলাম, একটু চা খেয়ে প্রসাদের বাড়ী যাব ভাই, তাকে তো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

এই তো মস্ত কাজের লোক হয়েছ কমল; এখুনি আবার বেরুতে চাচ্ছ! বলিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের নক্সা আঁকিতে অমল পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রসাদের কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, প্রসাদ! কেহ সাড়া দিল না। প্রসাদ বাহিরে গিয়াছে মনে করিয়া ফিরিয়া আসিব ভাবিতেছিলাম, চাকর, বলিল, বাবু ঘরেই আছেন। ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইলাম—দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ধরাসনে বসিয়া প্রসাদ যেন কি করিতেছিল। তাহার মুদ্রিত নয়ন, জোড়হস্ত;—আমার আগমন সে বুঝি জানিতেই পারিল না। যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল। আমি

প্রসাদের আরো একটু নিকটে সরিয়া গিয়া আলোটি বাড়াইয়া দিয়া কি দেখিলাম! একখানি ছবির সম্মুখে প্রসাদ তন্ময় হইয়া কিসের ধ্যান করিতেছে। প্রসাদ যে চিত্রকর, এ কথা আমার নিকটে অপ্রকাশ ছিল না। কলিকাতায় মার সহিত দেখা করিতে গিয়া প্রসাদের গৃহেই তাহার চিত্র বিত্তার পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু এ কি চিত্র—নির্জ্জনে বসিয়া প্রসাদ কি নারী সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতেছে? হৃদয়ের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি নারীর পায়ে অর্পণ করিতেছে? ইহারাই দেশের একনিষ্ঠ সেবক, দেশভক্ত! কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া সবই চলে। মুখে সাধুতার ভান। গয়লা-বৌকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে প্রসাদের হাত আছে কিনা তাহাই বা কে বলিবে?

আমি বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিলাম, প্রসাদ, কাকে পূজা করা হচ্চে ভাই?

স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া প্রসাদ আমার পানে চাহিল। তাহার বিশাল চক্ষুতে অশ্রুজল ছল ছল করিতেছিল। সে কাতরস্বরে কহিল, আমি দুর্ব্বল, তাই বল প্রার্থনা করছিলাম কমল! মন আমার বিক্ষিপ্ত হয়েছে, শান্ত হবার বর চাচ্ছিলাম ভাই।

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলাম, কোন দেবীর কাছে কামনা হচ্ছে প্রসাদ! গয়লা-বৌ কবে থেকে দেবীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া বেদনা পূরিত ক্লিষ্টস্বরে প্রসাদ বলিল, সে দুঃখিনী বিতাড়িতা, সে তোমার উপহাসের যোগ্য নয় কমল! আমি যাঁর কাছে বর চাচ্ছিলাম, তাঁকে দেখ্‌লেই তুমি চিন্‌তে পারবে। বলিতে বলিতে প্রসাদ প্রদীপটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া ছবিখানি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

সেদিকে চক্ষু তুলিয়াই আমি বজ্রাহতের মত চমকিয়া উঠিলাম। গয়লা-

বৌর চিত্র ভাবিয়া কাহাকে উপহাস করিয়াছিলাম? এই সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রসাদ—ইহাকেই সন্দেহ! ইহাকে অবিশ্বাস! লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আবার ছবিখানির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। এতো স্বজন-পরিত্যক্তা, আশ্রয়হীনা, দীনা মালতী নহে। এ যে আমাদেরই পদদলিতা অপমানিতা জননী জন্মভূমির প্রতিকৃতি। সুনীল সমুদ্রের বক্ষ হইতে প্রসন্ন স্মিত বদনে জননী উঠিয়াছেন। দুইখানি পদপল্লব ধৌত করিয়া উন্মাদ তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপরে মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে অস্তগামী রবির সোণালী আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিস্মিত জগৎ মুগ্ধ হইয়া মাতৃমূর্ত্তির পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রের তীরে তীরে শ্যামল অরণ্যানীর ছায়া শীতল তলে দাঁড়াইয়া কোটী কোটী নর-নারী মায়ের বন্দনা গাহিতেছে, নাম করিতেছে। মা দক্ষিণ হস্ত মেলিয়া সন্তান-দের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মায়ের হরিদ্বর্ণের অঞ্চলে রাশি রাশি মণিরত্ন ঝলমল করিতেছে। মুক্ত কেশ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। এই আমাদের মা, জননী জন্মভূমি—সকল দেশের রাণী; অথচ মর্ম্মপীড়িতা দুঃখিনী জননী জন্মভূমি—আমরা ইহারই পুত্র হা ধিক! হা লজ্জা!

আমি মায়ের চিত্রখানি প্রণাম করিয়া প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবিটা কোথায় পেলে প্রসাদ! এমন সুন্দর জীবন্ত ছবি তো দেখিনি।

দেখ্‌বে কোথা থেকে ভাই, কেবল নতুন বেড়িয়েছে, আমি কলকাতা থেকে কিনে আন্‌লাম।

মাকে আন্‌লে না কেন প্রসাদ? মা ভাল আছেন? তোমার মন খারাপ হয়েছে বল্লে কেন?

প্রসাদ কথা কহিল না, খানিকক্ষণ চিন্তার পর বলিল, আমি একটা

পাপ করেছি কমল—তা তোমরা জান না, কিন্তু তাতেই আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমি শক্তিহীন হয়েছি। দেশের কাজে আর আমার উৎসাহ নাই ভাই।

বলিলাম কি পাপ প্রসাদ! যার জন্য এত কুণ্ঠিত হচ্ছ! আমায় বল্‌বে না ভাই?

প্রসাদ আমার হাতখানা হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সজল নয়নে করুণ কণ্ঠে গয়লা বৌর কাহিনীটি বলিতে লাগিল। কেমন করিয়া উৎপীড়িতাকে উদ্ধার করিয়া আশ্রয় দেওয়া, কেমন করিয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করা। অবশেষে উদ্বেলিত হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসে তাহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া যাওয়া, শেষকালে গয়লা-বৌর প্রস্থানে তাহার মুকুলিত আশাপূর্ণ অন্তরের হতাশ আক্ষেপ, বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। মানুষের অন্তঃকরণের সংবাদ আমি রাখিতাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিশোর-কিশোরীর প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সবই বুঝি চক্ষের মোহ। মনের একটা ক্ষণিক নেশা! রমণী প্রীতি আমারো কম ছিল না; এখনো যে হৃদয়ের কোন্ হইতে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছি, তাহাও ঠিক কথা নহে। কিন্তু প্রসাদের এই মনোভাবের স্বাদ তো কখনো পাই নাই, এ যে আমার অচিন্তিত অভাবিত নূতন কথা শোনা! থিয়েটারে অনেক অভিনয় দেখিয়াছি, উপন্যাসও কম পড়ি নাই;—কিন্তু সে সব চিত্র সে জল্পনা কল্পনা একটি দিনের তরেও আমার হৃদয়ে ছায়াপাত করিতে পারে নাই। ভাল-বাসার স্বরূপ কি জানি না, জানিবার সাধও ছিল না। অকস্মাৎ প্রসাদের ভাবান্তরে আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। ভাবিলাম প্রসাদ গয়লা-বৌকে

চায়, ওটা উহার দুদিনের চোখের নেশা, যৌবনের প্রবল তৃষ্ণা। গয়লা-বৌ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এ পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, কাছে পাইলে উহার অস্তিত্বও প্রসাদ অনুভব করিতে পারিত না।

বলিলাম, গয়লা-বৌ দুর্লভ হবে না প্রসাদ। কল্‌কাতার এমন সব জায়গা আছে যা তুমি জান না। আমি চিনি, আমি চেষ্টা করলেই তাকে আনতে পারব। তাকে পাওয়া গেলে, দুই দিনেই তোমার নেশা ছুটে যাবে ভাই, নেশা চলে গেলে তখন তাকে কোথায় পাঠাবে?

সহসা প্রসাদের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মলিন বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিভরা দৃষ্টিটা আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে প্রসাদ বলিল, কমল নিজের মত সবাইকে ভেব না ভাই। ওতে ভালবাসার অমর্য্যাদা হয়। তুমি চিরকাল স্ত্রীজাতিকে ভোগের দ্রব্য ভেবেছ, তাই ভেবে তাদের প্রতি অনাচার অত্যাচারও কম করনি, কিন্তু ভালবাস নি,—ভালবাসা জান্‌বে কেমন করে? আমি মালতীকে চাই না, তার সুখে আর শান্তিতে সুখী হতে চাই—শান্তি পেতে চাই। জগতের সম্মুখে তাকে গৌরবের আসনে বসিয়ে বিপদ মুক্ত অবস্থায় দেখ্‌তে চাই। আমার ভালবাসা, তার দেহকে নয়—প্রাণকে। সে তুমি জান না কমল!

প্রসাদ বলে কি? ভালবাসা দেহের নয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়। বড় সুন্দর কথাটি তো, বড় মধুর উপমা। প্রাণকে ভালবাসা, আঃ, কি মিষ্টি! ইহারই নাম প্রেম! জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যে দূর থেকে তাকে ভালবাস্‌বে, প্রসাদ, সে যদি তোমায় চায়—তখন?"

প্রসাদের ম্লান অধর প্রসন্ন হাসিতে সমুজ্জ্বল হইল। সে একটু ভাবিয়া বলিল, সে যদি আমাকে চায়, তাকে যদি পাওয়াই যায়, তাহলে সকলের

সাম্‌নে তাকে আমি পেতেই চাইব, কমল! পাবার জিনিষ পাওয়া যাওয়াই ত আনন্দের, ভাই!

কি করবে—তাকে নিয়ে প্রসাদ? সে বিধবা, ভিন্ন জাতের মেয়ে—সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে তো তোমাদের মিলন হওয়া সম্ভব হ'বে না। তোমাকে অন্যায়ের আশ্রয়ই নিতে হবে। উত্তেজিত হইয়া সরোষে প্রসাদ বলিল, প্রাণান্তে তা করব না কমল! যাকে ভালবেসেছি, তার মাথায় কলঙ্কের ডালি দেব না। যদি মিলন হয়, পরিণয়ের মধ্যে দিয়ে হবে। নইলে এ জীবনেও তাকে আমি স্পর্শ করে মলিন করব না। আমার ভালবাসার শিরায় শিরায় আত্ম-বিসর্জ্জন, পদে পদে আত্মাহুতি। এ ভীষণ প্রণয়াগ্নির মর্ম্ম তোমার বুঝবার ক্ষমতা নেই।—সত্যই এতদিন ক্ষমতা ছিল না। যাহা যুবকের রূপজ মোহ বলিয়া, খেয়ালীর খেয়াল ভাবিয়া অবহেলা করিয়াছি, অবজ্ঞা করিয়াছি; তাহা এই—এমন অনন্ত! এমন অসীম! এমন অব্যয় পরশ পাথর! ইহারই মূল্য কি সাধকের সাধনায়, তাপসের আত্মত্যাগে? ইহাই কি স্থান বিশেষে মায়ের বুকে, ভাইয়ের স্নেহে, সন্তানের শ্রদ্ধায়, বন্ধুর প্রীতিতে? ইহা চির সুন্দর? এই প্রেম—ইহারই নাম ভালবাসা? দুই বাহু বাড়াইয়া প্রসাদকে বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিলাম, না বুঝে তোকে আঘাত দিয়েছি প্রসাদ, তুই আমাকে মাপ কর ভাই। আমি অন্ধ ছিলাম আজ তুই আলোর খবর দিয়ে দিলি! আমাকে বিশ্বাস কর—আমার উপর নির্ভর রাখ, আমি মালতীকে খুঁজে আন্‌ব। কাল ভোরেই আমি তাকে খুঁজতে কলকাতায় যাব।"

প্রসাদ কথা বলিল না। স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখে অপার নির্ভর জানাইয়া দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

১২

লেখক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

চারুশীলার কথা

বাড়ীউলীর বিরুদ্ধে একটা কথা জীভে আন্‌তেও গা ছম ছম করে। বাবা, যে মহীষমর্দ্দিনী মেয়েমানুষ! দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার পুলিশকে ঘাস জল খাওয়াবে বলে ভয় দেখায়। মিউনিসিপালের লোক তার ভয়ে টেক্স আদায় করতে আস্‌তে চায় না। যদি বা আসে এমন গালি গালাজ খেয়ে যায় যে আর কি বল্‌বো। ক'দিন ধরে চোখের উপর দেখ্‌ছি, তালা দেওয়া ঘরের মধ্যে মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মরছে। পেটে তার না যাচ্ছে একটি বিন্দু জল, কি এক মুঠো ভাত। বাড়ীউলির তাতে ভ্রূক্ষেপই নেই। রাত্রে যখন মেয়েটা খুব কাঁদে, তখন আদরের ভুলোকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দেয়, মেয়েটা তখনকার মত লজ্জায় ঘেন্নায় আড়ষ্ট হ'য়ে চুপ করে। ভুলো যেতে চায় না, ঠেলে ঠেলে পাঠায়, বলে, বশ করতে হবে।

মেয়েটা ত আমার কেউ নয়, কিন্তু কি জানি আমার মন কেন কাঁদে তার জন্যে। জানি-নে কেন, অন্ধকার রাত্রে তার ঘরের তালা ভেঙ্গে বের করে দেবার জন্যে আমি ছট্‌ফট্ করে মরি!...তাকে বশ করবে শুন্‌লে আমার বুকের পাঁজরাগুলো পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকে। সে যখন ঘরের মধ্যে হাহাকার করে, তখন আপনা থেকে আমার দু' চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়ে। দিনের বেলা দাওয়ায় খেতে বসে বাড়ীর আর সব ভাড়াটে

মাগীরা যখন মেয়েটার রকম-সকম দেখে হেসে ঢলে পড়ে, সে বশে এলে কলকাতা-সহরের নামজাদা বাবুদেরও কেমন করে পায়ের ভোড়ায় জড়িয়ে রেখে দিতে পারবে, তারই পরামর্শ করে, আর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে মেয়েটা যখন ডুকরে কেঁদে ওঠে, তখন আমি ভাত খেতে পারি নে; আমার দু'টো চোখই ঝাপসা হয়ে যায়, হাতের ভাত হাতে থাকে, চোখের জল পড়ে ভাত ভিজে যায়।

সেদিন ধরে ফেলেছিল, বাড়ীউলী মাসী। বল্লে, কি হল লা চারি?

ঢোঁক গিলে বল্লুম—যে ঝাল দিয়েছ মাসি!

তাতেই কি ছাই পার পাবার যো আছে! সাক্ষীরা আমার জবান-বন্দীর উল্টো কথাই বল্লে। চটে গিয়ে মাসী বল্লে—আজকাল বড় লোকের মেয়েমানুষ হয়েছিস্, এ সব রান্না কি আর মুখে রোচে!

তাকে চটাতে আমাদের কারুই সাহস হত না; তার মন রেখে চল্‌তে পারলে বেঁচে যেতুম আমরা। বল্লুম—তা নয় মাসি, বোধ হয় লঙ্কা চিবিয়েছি।

সুশীলা, সরলা, দাসী সবাই বল্লে—তাই হ'বে।

হাসি-গল্প, ইয়ার্কি চল্‌ছে, খাওয়াও হচ্ছে, মেয়েটা কি করছে কে জানে! ভাত যে পায় নি, তা আমি ভাল করেই জানি। মাসী, ভাত না দিয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বশ করবে নিজেই বলেছে! আর দিলে কি আর আমরা দেখ্‌তে পেতুম না! সেই কোন্ সকালে একটা ধামি করে চারটি মুড়ি দিয়ে এসেছিল, আবার সেই সন্ধ্যেবেলা দু'খানা রুটি আর একটু গুড় দেবে,—সারাদিনে আর কিছু না,—এক গণ্ডুষ জলের জন্তে যদি দম লেগে মরে যায়, তা'ও দেবে না!

গলা দিয়ে ভাত নামল না। যখন মনে হ'ল আমরা বুড়ো মাগীগুলো বুড়ো গোগ্রাসে প্যাজকলির চর্চ্চরী দিয়ে, কাঁকড়ার দাড়া চিবিয়ে ভাত গিলছি, আর এই বাড়ীর একটা ঘরে একটা কচি মেয়ে না ভাত না জল, কেঁদে লুটোপুটি খাচ্ছে,—এত কালের খান্‌কী আমি, আমার মুখের গরস মুখে তুলতে হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল।

মাসী বল্লে, কি লা চারি, হাত গুটুলি যে। রুচলো না?

ভয়ে ভয়ে বল্লুম, মাসি গা-টা কেমন করছে।

মাসীর মুখ, যা তা বলে ঠাট্টা করতে লাগল, আর কালামুখীরা তাই শুনে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, ও তার গায়ে ঢলে পড়ে।

একটু পরে বল্লুম, মাসী পোষা পাখীগুলাকে ত গেলালে, তোমার জংলীর খবর কি?

মাসী একবার সেই ঘরের দরজার তালাটার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—পোষ মানতে আর দেরী নেই।

জানতুম, ভাত দেয় নি, দিয়েছে চুলোর ছাই খেতে, তবু বল্লুম— ভাত খাচ্ছে বুঝি?

মাসী গম্ভীর ভাবে বল্লে—হ্যাঁ।

একজন মুখফোঁড় ছিল, সেই বল্লে—ভাত খাচ্ছে না পাঁশ খাচ্ছে। ওকে আবার ভাত দেবে! ঢের ঢের ঠ্যাটা মেয়েমানুষ দেখেছি, এমনটি কিন্তু বাবার কালেও দেখলুম না বাছা! অমন রং, অমন ঢং, অমন কস্তা-পেড়ে শাড়ী, খালি সিঁথে, চুড়ির গোছা আবার সতীগিরি! মুখে আগুন, মুখে আগুন!

হা ভগবান! এরা পারেও! এই খা-খা করছে রদ্দুর। পৃথিবী ফেটে

চৌচির হয়ে যাচ্ছে, সহরের বড় বড় বাড়ীগুলার ছাদ থেকে আগুন উঠে লোককে পুড়িয়ে ঝলসে দিচ্ছে, এ সময়েও মেয়েটার মুখে আগুন দিতে এদের বাধে না। কেমন করে পারে যে তা ত বুঝি নে। গেরস্থর বৌ-ঝি না-হয় নাই হল, তাই বলে আর মেয়ে মানুষ ত, কি করে যে পারে!

সবাই খেয়ে যে-যার থালা হাতে নিয়ে কলতলার দিকে চলে গেল, আমি সেই-খেনেই বসে রইলুম। কলতলাটা একটু খোঁজের ভেতর, নেত্য কালীর ঘরের পাশ দিয়ে টালি-বাঁধা একটা গলি রাস্তা আছে, সেইটের শেষে কলতলা। এদিকটায় আবার চট্ টাঙানো, এদিক থেকে কিছু দেখা যায় না। তবে তাদের হাসির হররা শুনতে পাচ্ছিলুম।

ভাত আমার পাতে যেমনকার তেমন ছিল, গোড়ায় যে কটা খেয়ে-ছিলুম, সেই যা! তরকারীও সব ছিল। ভাবলুম, থালাশুদ্ধ ঘরের জান্‌লা গলিয়ে মেয়েটাকে দিয়ে আসি! এঁটো, হোক্ এঁটো, জাত বড় না প্রাণ বড়! উপবাস ভাল, না আহার ভাল! আবার ভয়ও হোল, জানি-নে কি জাতের মেয়ে সে! বামুনটামুন যদি হয়, এঁটো খাওয়াব? সে পাপ ত আমাকেই লাগ্‌বে। এজন্মে ত এই, আবার পরের জন্মে কি হবে কে জানে!

ভেবে একটা কিছু মীমাংসা করে' ফেলবার আগেই মাসী উঠোন থেকে বলে উঠ্‌লো, ফাঁসীর খাওয়া খাচ্ছিস্ না-কি লা চারি?

হয়ে গেছে মাসি!—বলে উঠে দাঁড়ালুম।

দুপুর বেলায় এ বাড়ী, এর পাশের, ও পাশের সব বাড়ী একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। আমাদের বাড়ীর মাগীদের খেতে যা দেরী, তার পরই দাওয়ায়, ঘরে গড়া গড়া মাদুর বিছিয়ে এক গাল দোক্তা, বিড়ি, দেশলাই

পাখা নিয়ে যে যার দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়ে। আজও সব শুয়ে পড়ল। দু' একজন শুলে না, তাদের অন্য কাজ ছিল, ঘরে খিল দিলে।

আমিও শেতল পাটিটা বগলদাবায় করে যে ঘরে মেয়েটা বন্ধ ছিল, সেই ঘরের দাওয়ায় এসে শুলুম। মাসী দেখ্‌তে পায় নি, সে এর আগেই ছোকরা বন্ধু একটিকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে ঢুকেছিল।

বাড়ীটা নিস্তব্ধ হতেই জানলায় মুখ দিয়ে দেখি, স্যাঁতসেঁতে মাটীর ওপর উপুড় হয়ে মেয়ে শুয়ে পড়ে আছে। গায়ে কাপড় নেই, থাক্‌বেই বা কোথেকে, সর্ব্বাঙ্গ যার জ্বলে পুড়ে আঙ্গার হয়ে যাচ্ছে, গায়ে কাপড় সে রাখতে পারে? একরাশ চুল কাঁধের পাশ দিয়ে মাটীতে লুটোচ্ছে, খোলা পিটটায় ধুলো মাথামাখি – আছার বিছেড় করছে। দু'টো হাত জড় করা, তারই ভেতর মুখখানা রেখে শুয়ে আছে।

ডাক্‌লুম—দেখ!

সাড়া পেলুম না।

আবার ডাক্‌লুম—ও গো শুন্‌ছ? দেখ।

ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে, কাপড় চোপড়গুলো সামলে নিয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম—আমি এই জানলায়!

আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি আবার শুয়ে পড়ছিল, আমি বল্লুম– কিছু খাবে?

সে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না।

আমি বেশ বুঝতে পারলুম, অখিদেয় 'না' বল্‌ছে না সে, এ বাড়ীতে, কি এ বাড়ীর লোকের হাতে খাবে না, তাই—না।

বল্লুম—যদি খাও ত বল, বাজার থেকে খাবার আনি।

তবু বল্লে—না।

আমি বল্লুম—একটু জানলার কাছে সরে আস্‌বে?

সে জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

আমি আস্তে আস্তে বল্লুম—কথা আছে শোন। আমি বাড়ীউলি নই; তবে খান্‌কী বটে! সে ছাপ ত আর ওঠাতে পারব না ভাই!

এ কথাটা সত্যি বলেছিলুম; তাই বল্‌তে বল্‌তে বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকটা আরও কেঁপে উঠল। বল্লুম—উঠে এস।

তবু বোধ হয় তার ভয় ঘোচে নি, সে হাঁ করে চেয়ে রইল, এল না।

আমি তার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে বল্লুম—মা কালীর দিব্যি, ভাল কথা বল্‌ব।

মা-কালীর নামেও যখন সে নড়ল না, নিজের ওপরই ঘেন্না হল। ছিঃ ছিঃ আমাদের মুখে এত বড় দিব্যি তা'ও লোকে মান্‌তে চায় না! কি জঘন্য জীবন! না, না, জঘন্য নয়, জঘন্য হলে এ জীবন যাপন করতে পারি কখনও? কিন্তু জঘন্যই যদি না হবে—তবে ঐ মেয়েটি জানলার আড়ালে থেকেও আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না কেন? ভয় না ঘৃণা? ভয়? কিসের ভয়? এখানে থেকে আমি ওর কি ক্ষতি করব? আর আমি ত পুরুষ নই, মেয়ে মানুষকে মেয়ে মানুষের ভয়ই বা কিসের জন্যে! আবার মনে হল যে না, মেয়ে মানুষকেও ভয় করতে হয় বৈ-কি! আমাদের মাসীকে ভয় না করে কে?

সে কিছুতেই এল না দেখে, সরে যাচ্ছিলুম, মেয়েটি একটুখানি এগিয়ে এসে বল্লে—তুমি কে?.. তার গলার স্বর ভারি কাঁদ-কাঁদ!

আমি বল্লুম—এই বাড়ীরই এক অভাগিনী। আমাকে তোমার ভয় নেই, সরে এস।

এল।

তা'কে স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লুম—কিছু খাবে?

সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় পাবে তুমি যে আমাকে খেতে দেবে?

আমি বল্লুম—সে ভাবনা তোমার কেন ভাই! খাবে কি-না বল, দেখ।

বল্লে—কিনে আনাবে?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—দোকান থেকে?

আবার আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম যে হঁ্যা।

সে বল্লে—তুমি পথে বার হও?

হই বৈ কি! কি খাবে বল, এখনি এনে দিচ্ছি।

বল্লে—খাব না কিছু। তবে—

আমি বল্লুম—বল না ভাই!

সে মিনতির স্বরে বলে উঠ্‌লো, তুমি যদি পথে বার হও, আমার পিসি-মার বাড়ীতে গিয়ে একবার বলে এস-না, আমাকে এরা—আর সে বল্‌তে পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার পিসিমার ঠিকানা জান?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বল্লে—না। একটা সরু রাস্তার উপর দোতালা বাড়ী নীচেটা ভারি অন্ধকার।

হাসিও পেল, দুঃখও হল। বল্লুম—ও রকম রাস্তার দোতালা বাড়ী আর নিচের তলায় অন্ধকার বাড়ী এই সহরে পঞ্চাশহাজারটা আছে, ও বল্লে ত জানা যাবে না ত।

তাঁর ছেলেকে সবাই জানে! তাঁর নাম বল্‌বো?

তাতেও ত কাজ হবে না। রাস্তার নাম, নিদেন পাড়ার নামটাও কি জান না?

সে আকাশ থেকে পড়ে বল্লে—রাস্তার আবার নাম কি। আর পাড়া ত আমাদের পাড়া গাঁতেই আছে। কলকাতা সহরে আবার পাড়া কি!

বুঝলুম, কোন আশা নেই। কিন্তু সে কথা তাকে প্রাণ ধরে বল্‌তে পারলুম না। কি করে বলব তাকে সে কথা! সে-যে আমার মুখের দিকে হাঁ করে' চেয়ে আছে, যেন আমার কথার ওপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে। কোন্ প্রাণে পাপিষ্ঠা আমি তাকে বলব যে, তার উদ্ধারের কোন আশা নেই, কোন্ পাষাণে বুক বেঁধে শোনাব সে কথা?

সে আমাকে ভাব্‌তে দেখে বল্লে—এক মামা আছেন—

বলে ফেলেছিলুম—আর মামা!

এক লাফে আমার দিকে ছুটে এসে বল্লে—কেন, কেন, কি হয়েছে?

বল্লুম—হয় নি কিছুই। তবে—

তবে কি?

বলি কি! ভাবছি,—কেঁদে ফেলে জান্‌লা দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে আমার পেট-কাপড়ের কাপড়টা চেপে ধরে বল্লে—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ওগো,

আমার পিসিমাকে খবর দাও। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও।

দেখ, আমারও তাই ইচ্ছে, কিন্তু—

সজল চোখে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, যেমন করে পার, দয়া কর গো, দয়া কর। ভগবান তোমার ভাল করবেন, দয়া করে তাঁদের খবর দাও, এখানে থাক্‌লে আমি আর এক দিনও বাঁচব না, মরে যাব, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, যেমন করে পার—

বল্লুম—আর কিছু বলতে হবে না। আমি দেখ্‌ছি। কিন্তু কিছু খাবে কি ?

সে কাঁদতে কাঁদতেই বল্লে—না। ঐ দেখ না দু'দিন মুড়ি দিয়েছি, রুটি দিয়েছি, সব পড়ে আছে, ছুঁই-ও নি !

গরাদেতে চোখ রেখে দেখলুম—তাই বটে।

তা'হলে দু দুটো দিন, দুটো রাত্তির অভাগিনীর পেটে একটা গুঁড়োও যায় নি। ওঃ !

না, যেমন করে পারি, ওকে এ বাড়ীর বার করে দেবই। যেমন করে পারি, যে করে পারি ! তারপর ওর অদেষ্টে যা থাকে, তাই হবে, এ পাপ পুরী থেকে ত যাক্‌, বরাতে থাকে পিসি না কার নাম করছে, সেইখেনে পৌঁছুবে, না-হয় পুলিশের হাতে পড়বে। মনে হ'ল তা হলে ভালই হবে !

তাকে অভয় দিয়ে বল্লুম, আচ্ছা, তুমি এখন বস গে, আমি দেখ্‌ছি।

মেয়েটি কৃতজ্ঞস্বরে বল্লে—যদি সে বাড়ীতে যাও, তাঁকে ডেকো, ডেকে তাঁকেই বোলো।

কা'কে ?

তাঁর নাম—প্রসাদ ?

ভারি আগ্রহ হল, জিজ্ঞাসা করলুম, সে কে ?

পিসিমার ছেলে।

কি করেন !

সৈনিক।

সৈনিক কি গো ? লড়াই করে ?

না—ছবি আঁকেন।

তবে যে বল্লে—সৈনিক। পটো বল।

তিনি বলেন, সৈনিক। দেশের কাজ করেন।

ও আমার কপাল। ভলেণ্টার ? তাই বল।

তিনি খবর পেলেই আমাকে নিয়ে যাবেন এসে। তাঁকেই খবর দিও।

তা দেখ্‌ছি। কিন্তু একটা কথা সত্যি করে বল ত, পিসিমার বাড়ী থেকে তুমি পালিয়ে এলে কেন ? কি মুখ নামাচ্ছ যে ! বল্‌তে পার্‌বে না ? আচ্ছা থাক।

বলে পাটির ওপর এসে বসলুম। ভাবতে লাগলুম, করি কি ? পুলিস ? ও বাবা ! ভয়েই গা কাঁপতে লাগ্‌ল ! মাসী টের পেলে জ্যান্ত পুঁতবে না আমায় ? আর ওর কাছে পুলিশ। পুলিসের ঠাকুদ্দাদার নাক কেটে দেয় .....

আজ যে শনিবার তা মনে ছিল না, সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠ্‌তেই মনে পড়্‌ল, হাবু এসেছে। ফি শনিবারে ছাপাখানার ফেরত সে এইখানে আসে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে

এলুম। ভেতরে ঢুকে, কাঁধের ময়লা চাদরে মুখের, ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বল্লে—খবর কি দিদি?

হাবু আমার মা'র পেটের ভাই! আমাদের বাবাকে আমরা দেখি নি, দেখে থাক্‌লেও মনে নেই। তবে মা'কে মনে আছে, মা-র দু'কোলে আমরা এই দু'টি ভাই বোন ছিলুম! মা এই অভাগিনীর মতই এক অভাগিনী ছিলেন বোধ করি, বাবার পরিচয় দেন্ নি। হাবু ছাপাখানায় কম্মো করে, একটা মেছে থাকে, শনিবারে শনিবারে আমার এখানে আসে, সন্ধ্যে হতেই চলে যায়।

তা'কে বসিয়ে হাওয়া করছি, সে বল্লে—পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ল, দিদি!

ভালই হল ভাই! একটু ভাল খা দা, শরীরটে যাতে ভাল থাকে তাই কর।

শরীর কি আর খাওয়ার জন্যেই খারাপ হয়! খাটৃ-নিটে যা পড়েছে—

হ্যাঁরে হাবু, তুই যে বলিস্, মনিব আমার হ্যান ত্যান, কারু দুঃখু কষ্ট দেখতে পারে না, তা তোদের দিকে চায় না কেন?

হাবু বল্লে—সত্যি দিদি, অমন মনিব হয় না। মাটীর মানুষ, দেবতা! কখনো একটা কড়া কথা শুনিনি তাঁর মুখে। ছেলে মানুষ, তার ওপর কত লেখাপড়া জানেন ত, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে ভাব, আমরা ত পুঁটি মাছ, তবু কখনো তুই বলে ডাকেন না। আমাদের যাতে বেশী খাট্‌নি না হয়, তার জন্যে কড়া আইনও করে দিয়েছেন, আমরা রোজ বেশী পাব বলেই ত ওপোরটাইন খাটি।

মনিব কিছু বলে না?

না। তা বল্‌বেনই বা কেন? বেশী পয়সার জন্যে যে খাট্‌তে

পারে—তাকে তিনি বারণ করতেই বা যাবেন কেন? কেবল রবিবারে কারু কাজ করবার হুকুম নেই। বেহ্ম কি-না, সমাজের বারণ!

সমাজ কি হাবু?

আছে—আছে। আমাদের যেমন মন্দির না, ওঁদের তেমনি সমাজ আছে। সেখানে গিয়ে পূজো টুজো করে?

খ্রীষ্টানী বুঝি?

না গো না, বেহ্ম—বেহ্ম।

কি পূজো করে?

শুনেছি, ঠাকুর দেবতা নেই।

হোই রে হোই, ওকেই বলে খ্রীষ্টান।

হাবু এ সম্বন্ধে বেশী তর্ক করতে পারলে না, বল্লে, সে নিজেই ঠিক জানে না; তাই কথাটা ঘুরিয়ে ফেলবার জন্যে বল্লে—দিদি, তাঁর কাজ যদি শুনিস্, অবাক হয়ে যাবি।

কি—বল্ না শুনি?

এই—সব—এই—সব—মেয়েদের জন্যে উনিই উদ্যোগী হয়ে একটি আশ্রম গড়ে দিয়েছেন, পয়সা ওঁর নয় বটে, তবে উনিই প্রধান। তারপর সমস্ত জাতের কচি কচি সব বিধবাদের বিয়ে—তা'ও কটা দিয়েছেন। কাগজে ত এ সবই লেখেন, তারপর কোথায় বন্যা হ'ল, সেখানে গিয়ে মেতে গেলেন, কোন্ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, বাবু আমাদের ঠিক সেই খানে; নিজে কত বই লিখেছেন, কত কাগজে সব লেখা যে তাঁর বেরোয়—

হ্যাঁরে, হতভাগিনীদের আশ্রয় দেন?

দেন। তাঁর কাজই সেই দিদি। তাঁদের শিল্প ভবনে গিয়ে মেয়েদের

যাতে অন্য কোন দিকেই মন না যায়, আর কোন পথে না যেতে পারে তারা, তাই কত রকমের ভাল ভাল কাজের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কাগজে ত সেই কথাই লিখ্‌ছেন।

মনে হ'ল, এই ত সুযোগ! হাবুকে কেন বলি না, এই মেয়েটির সম্বন্ধে তার মনিবকে জানাতে! জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা হাবু, যদি শোনে, কোন একটি গরীবের মেয়েকে কেউ আট্‌কে রেখেছে—বেশ্যা বাড়ীতেই ধর, তাকে তিনি উদ্ধার করতে পারেন?

পারেন না—আবার! দিদি, পুলিসের সব চেয়ে যে বড় সাহেব, সে কতদিন আমাদের আফিসে এসে বলে গেছে, বাবু যা বল্‌বেন, সে তাই কর্‌বে!

কিন্তু পুলিসের নামে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। পুলিস দিয়ে হবে না। অন্য কি উপায় হতে পারে? নিজে যখন কিছু ভেবে পেলুম না, হাবুকে সব খুলে বল্লাম, শুনে হাবু দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, দিদি, তুই ভাবিস্‌নে, এ খবর পেলে তিনি বড়ই সুখী হবেন। এখন বোধ করি বাড়ীতেই পাব, একবার ঘুরে আসি আমি। ছুটে খবরটা আমি দিয়ে আসি; তারপর—কি হয় মজাটা দেখ্ তুই!

বল্লুম, ভাই, তা'তে শুধু ঐ মজাই নয়, তোমার দিদির অদেষ্টে আরও অনেক মজা ঘট্‌বে। তার চেয়ে এক কাজ···

হাবু বল্লে, কি কি? সে একেবারে চন্ মন্ করছিল।

বল্লুম, আমি যদি সন্ধ্যে বেলা তাকে বার করে দিই, তুই নিয়ে গিয়ে তোর মনিবের কাছে দিয়ে আসতে পারবি?

খুব পারব।

তবে এক কাজ কর দিকিন। টাকা আছে পকেটে দুটো। একটা দেশী বোতল কিনে আন্ দেখি।

হাবু বল্লে—মদ ?

হ্যাঁ রে! তোর ভয় কি! তুই ত আর খাচ্ছিস্‌নে!

কি হবে শুনি ?

মাসীকে খাইয়ে ট্যাস করে তবে ত ছুঁড়ীকে বার করব। তুই দরজার কাছে গাড়ী নিয়ে থাকবি, পৌঁছে দিবি।

হাবু রাজী হয়ে চলে গেল।

বেশ্যা আমি, দেহ বেচে খাই, কাউকে দয়া করা স্নেহ করা, ভালবাসা এ জীবনে কোনদিন দরকার বুঝি নি, করি নি, মুদি যেমন জিনিষ বেচে, আমিও তেমনি দাম নিয়ে যে যা চেয়েছে, তা'কে তাই দিয়েছি। বিনামূল্যে খয়রাত কোন জিনিষ করিনি, করতে যে হয় এর আগে তা জানতুমও না।

আজ তাই হয়ে গেল।

ট্যাস হ'তে মাসীর দেরী হল না। চার পাত্তর টেনেই, দেহ থেকে কাপড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে তবে আর এক কথা। খোলা কাপড়ের আঁচল থেকে চাবিটি নিয়ে ঘরটা খুলে বল্লুম, কথা কয়োনা, এস।

বল্লে—কোথায় আগে বল।

আমার বুক টিপ্ টিপ্ করছিল, জিভে জুগিয়ে ছিল, যমালয়, বেধে গেল, বল্লুম, আমায় চিন্তে পারছ না, দুপুর বেলায়—

বল্লে—চল।

গাড়ীতে তুলে দিয়ে চাবিটি মাসীর আঁচলে বেঁধে রেখে বোতলটা গালে ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কমলের কথা

হাবড়ার পুলের মুখে ট্রামে উঠেছি একটা কাগজ ফেরিওয়ালা ছোঁড়া ধরে বস্‌ল "প্রকৃতি" একখানা কাগজ কিন্‌তেই হবে। নাছোড় বান্দা। এমন ছিনে জোঁকও মানুষ হয়? কি করি, দুটো পয়সা, খরচ করতে হল! কাগজখানা খুলেই দেখি, মালতী নামে একটি মেয়ে…সে বলে প্রসাদের মা তাহার সম্পর্কে পিসিমা। এই প্রসাদ বা তাহার কোন আত্মীয়…সম্পাদকের নিকট…

ট্রাম থেকে নেমে ট্যাক্সি নিলুম। সম্পাদক লোকটি ছেলে মানুষ, গৌরবর্ণ, ছিপ ছিপে সুন্দর চেহারাটি। কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হয়ে মালতীকে গাড়ীতে তুলে দিলেন।

মালতী ঘোমটা দিয়ে উঠেছিল, আমি প্রসাদ বলে পরিচয় দিয়েছি, তাই সে জান্‌ত। গাড়ী ছুটতেই বোধ করি সে চিন্তে পেরেছিল, কেঁদে উঠ্‌লো।

তখন আর তা'কে কিছু বল্লাম না। বল্লাম না কেন, পারলাম না। তার মুখের দিকে চাইতে মাথা নুয়ে পড়ছিল।

মা'র বাসার সামনে নেমে জোর করে তার হাত ধরলাম, টান্‌তে টান্‌তে মা'র সামনে ফেলে দিয়ে বল্লাম মা! গয়লা-বৌ-কে পেয়েছি।

আনন্দে মা কেঁদে ফেল্লেন। একটু পরেই বল্লেন, প্রসাদকে এখুনি যে খবর দিতে হবে, সে যে বড় ব্যথা নিয়ে গেছে কমল।

খবর দিচ্ছি মা! আপনি একে দেখুন।

গয়লা-বৌ পড়ে যাচ্ছিল, মা ধরে ফেল্লেন।

সেই ট্যাক্সি নিয়েই বিডন-স্কয়ার পোষ্টাফিসে গিয়ে একটা টেলিগ্রাফ রওনা করে দিয়ে আপনার মনেই বল্লাম—কাঙাল ! আমাকে দিয়েও তুমি এমন কাজটা করাতে পারলে ! ধন্য তুমি !

১৩

লেখিকা—শ্রীস্নেহশীলা (বসু) চৌধুরাণী

কমলের কথা

শুনিছি, টেলিগ্রাফ সময়ে সময়ে খুব দ্রুত পৌঁছে যায়, আবার কখনো-কখনো বিষম দেরীও হয়। কয়েকটী ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিছি, চিঠি আর টেলিগ্রাফ প্রায় একই সঙ্গে এসেছে, যদিও তার জন্যে দশগুণ দাম বেশী ধরে দেওয়া হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ এরকম হয় না, দুপয়সার চিঠি আর দেড়টাকার টেলিগ্রামের পার্থক্য অনেক, আকাশ আর পাতাল—যতখানি! কিন্তু সমস্ত দিনটা কেটে গেল, তবু প্রসাদ-টা এলো না, এতে আমার "তারের" ওপরই অবিশ্বাস হচ্ছিল। অঘটন যেটা, অসম্ভব যেটা, সেটা হয় ত বা আমাদের দিয়েই ঘটে গেল। মনে করতেও আমার গা যেন আগুন তাতে জ্বালা করে উঠ্‌ছিল। আমি কোথায় সারাদিন ;—লোকটাকে বাড়ী ঢোকবার মুখেই ভয়ানক আশ্চর্য্যান্বিত করে দেবার কল্পনা করে কাণ দুটোকে সদর দরজার কড়ার ওপর খাড়া করে রেখেছি, আর সে-কি-না আস্‌বে না? এর চেয়ে আপশোষ আর কিসে হতে পারে?

টেলিগ্রামে বেশী কথা লিখিনি, খালি লিখেছি,

চলে এস, বড় দরকার, মা উৎকন্ঠিত!

মনে মনে সমস্ত ক্ষণ ঐ কথাকটা আলোচনা করিছি, আর তার পরে প্রসাদের অবস্থাটা যে কি রকমের হবে তা'ও মনে মনে কতকটা কল্পনা করে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস 'তার' পেয়ে সে ভারি চম্‌কে যাবে, তার পর আকাশ-পাতাল, স্বর্গ মর্ত্ত হাঁতড়ে কিছুই বুঝতে না পেরে, মুখটি চুণ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে! পথের চিন্তা যে তার কি হবে সে ত জানাই আছে, তারপর একখানা ট্যাক্সি ধরে হাওয়া ভরে উড়ে এসে শুষ্ক-মুখে দরজায় দাঁড়াবে; আমার একটি সাধ আছে, নিজের হাতে দরজাটি খুলে দিয়ে একবার প্রসাদের সে সময়কার মুখখানি দেখব, আর একবার 'প্রসাদ, মালতী এসেছে'—শোনবার পর তার মুখখানি কেমন হয়—দেখেই নিশ্চিন্ত হব।

সত্য নিশ্চিন্ত হব! মা'র মুখ দেখে বুঝতে পেরিছি, গয়লা-বৌকে পাওয়া না যেতে তাঁকে যত উদ্বিগ্ন দেখেছি, এখন যেন তাঁকে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন দেখ্‌ছি। আমার এই মা-টির স্বভাব এত দৃঢ়, এত গম্ভীর যে, যতই স্নেহের মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াক, তাঁর মনের কথাটি ধরতে পারবে না। অথচ সে মন যে কত উচ্চ, কত মহান্‌, কত পবিত্র—তা'ও জেনেছি। সেই অনেকদিন আগে, যেদিন অত্যাচার-পীড়িতা, পরদুঃখ-কাতরা এই নারীমূর্ত্তিকে কম্পিতাধরে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে অনিমিষে চাইতে দেখেছিলুম, সেদিন সে মুহূর্ত্তে পশুর হৃদয়েও মাতৃমন্ত্র উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল। সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, বৈশিষ্ট্য দেখে আমার অন্তরের কু প্রবৃত্তি গুলো সাপুড়ের বাঁশীর শব্দে মুগ্ধ সাপের মতই মাথা গুঁজে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর মুখের কমনীয়তার সঙ্গে এমন একটা কঠোরতা মিশে তাঁর শ্রী-কে অপূর্ব্ব করে তুল্‌তো, তাঁর আয়ত

নয়নের বিস্তৃত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে এমন এক উজ্জ্বল আভা বিকশিত হত যে, একবার যে দেখবে, তাকে কিছুক্ষণের জন্যও মনের সেই পাতাটায় বসে বসে আঁকতে হোত। আমাকেও হয়েছিল। আমিও এঁকেছিলুম, আর আপনার মনে বলেছিলুম, এমনটি আর দেখি-নি।

সাপ ক্ষণেকের জন্য—যতক্ষণ বাঁশী বাজে, ততক্ষণের জন্য মুগ্ধ থাক্‌তে পারে, মুগ্ধ থাকা তার স্বভাব নয় বেশীক্ষণ। বাঁশী থাম্‌লে তার সুপ্ত হিংস্র-বৃত্তি আবার জেগে ওঠে! কতক্ষণ পরে, ঠিক জানিনা, আমারও সুপ্তি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। আমাকে যে কেউ মোহ-মুগ্ধ করতে পেরেছে—এ কথা মনে হতে নিজকেই আমার ঘৃণা হতে লাগল। বাঁশী থেমে গিয়েছিল, মন্ত্র যা, তা, যেখানকার সেইখানে পড়েছিল। বাড়ী আস্‌তেই, সঙ্গীদের মধ্যে আস্‌তেই, আবার সেই পশু বৃত্তিগুলা মাথা তুলে বিজয়-গর্ব্বে চিরপরিচিত পথে বার হবার জন্যে পা বাড়িয়ে বস্‌লো! অনেকদিন দ্বন্দ্ব চলেছিল, আমার সঙ্গে আর সেই "মা'র" মূর্ত্তিখানার সঙ্গে। নিজের পরাজয় মেনে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলুম ; কিন্তু যারা আসল কারণ বোঝবার কোন চেষ্টা না করেই করুণার বশে পরাজয়ের বিচার করবে, তাদের মুখ ভেবেই আমি পরাজয় স্বীকার করতে পারিনি। সবার চাইতে বেশী ভয় আমার ছিল, খুড়ো ম'শায়কে! খুড়োমহাশয়ের বাপ মা কোন কালে কোন দেশে কেউ ছিলেন কি-না জানি-নে। খুড়ো মশায় সত্যি কথা বল্‌তে বাপের কেয়ার যে একবিন্দু করতেন না তা তিনি কম করে দশহাজার বার স্বীকার করেন। আর তাঁর গর্ভধারিণী মা'র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, যাঁকে চোখে দেখিনি, তাঁ'কে মানিওনে। উদাহরণ স্বরূপ খুড়ো বলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মান্‌তে তাঁর খুব ইচ্ছে নেই, তবে পাহারাওয়ালার পূজো দিতে প্রায়ই পাঁচসিকা সাতসিকা

ব্যয় তিনি স্বেচ্ছায় করে' থাকেন। বুড়ো হয়েছেন ত, দেব দেবীর কথা উঠুক, শুনবেন—বামুণগুলোর পয়সা গ্যাঁড়া মারবার ফিকির। প্রসাদের মা'কে 'মা' শুনে বলেছিলেন, খুড়ো কোকিল কাকের বাসায় যখন মানুষ হয়, তখন মানুষই হয়, তার গলা বার করে না। মা বল, তা'তে ক্ষতি নেই, জেনো মা লোকের একটিই হয়। সে মা যদি একবার মরে—খতম্!

আর অমল! অমল বল্লে, ঠিক তার উল্টো। বল্লে—মা—ঐ নদী আমার মা! ঐ সবুজ রঙের ধানের ক্ষেত—আমার মা! ঐ অস্থি চর্ম্মসার গাভী—মা, যে মাটির'পরে দাঁড়িয়ে আছি সেও আমার মা! সন্ন্যাসীর মত সর্ব্বত্যাগী সাধুর মত সুনির্ম্মল বেশে, দিব্য কান্তিতে একদিন আমার ঘরে ঢুকে মা'য়ের পরিচয় জানিয়ে দিলে! বল্লে—ঐ মা, কমল, ঐ মা! ভাইরে তোর আমার, লক্ষজনের মা—ঐ!

অমল যেদিন আমার চোখের সম্মুখে মায়ের ছবিটা ফুটিয়ে তুলেছিলে, আমার স্মরণ আছে, আমার সেদিনের অবস্থাটা কতক পরিমাণে কম্পাস ভাঙ্গা সমুদ্র পোতের মতই দিগ্বিদিক হারিয়ে টাল মাটাল করছিল। কাছে কূল আছে হয়ত, দেখা যাচ্ছে না, লাগতেও পারছি নে, আবার অকূলে ভাসতেও পারছি নে। ঠিক এমনই ধারা মন নিয়ে আমি প্রসাদের মা'র অনুরোধ অনুশাসন ঠেলে কলকাতায় গেছলুম, আবার দুরভিসন্ধির মস্ত বোঝা মাথায় করে দেশে ফিরে আসতে যাব,—উদাসী অমল, যাদুকর অমল আমাকে ডাক দিলে!

জন্ম জন্মান্তরের আলস্য আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল, কোথা গেল, তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলুম, অমল তার যাদুদণ্ড বুলিয়ে আমাকে নতুন করে গড়েছিল। তারপর—কতদিন কত রাত্রি নিজের জীবনের অতীত

দিনগুলো আলোচনা করেছি। যতই করেছি, ততই বুঝতে পেরেছি, অমল যদি আমার এ নূতন পথের চালাক হয়, তবে সে পথের পথ প্রদর্শক একজন আছেন। সে জন আমার সেই মা! তিনি প্রসাদের গর্ভধারিণী জননী হলেও আমাকে গর্ভের সন্তান বলেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথম আমার পশু হৃদয়টাকে মনুষ্যত্বের আঘাত দিয়ে চেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন, প্রথম যিনি আমাকে মনুষ্য জাতির মায়ের সন্ধান বলে দিয়েছিলেন! প্রথম যিনি মা'য়ের চরনে আত্ম বলিদান দিতে আমার মত পাষণ্ডেরও অধিকার আছে বুঝিয়েছিলেন।

প্রসাদের মুখে গয়লা-বৌর হারানোর খবর পেয়েই আমি কলকাতায় ছুটে আসি নি, আমার কলকাতায় আসবার সে একটা কারণ হতে পারে, তবে প্রধান নয়। প্রধান কারণ, আমি মা'কে দেখতে এসেছিলুম। আমার পরিবর্ত্তনে মা'র কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখবার সাধ যে কত প্রবল হ'য়েছিল, আমার অন্তরে অন্তরে তা শুধু জানে এই অন্তরটাই!

মা'র পরিবর্ত্তন হয় নি। মা ত নয়, মা যেন আমার হিমালয় শৃঙ্গ। কত ঝঞ্ঝা, কত বৃষ্টি, কত ভূকম্প, কত প্রলয়, হয়ে গেছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নেই - অচল, অটল, অপরিবর্ত্তনীয়।

যে অনাবিল স্নেহ ধারা সেই প্রথম দিনেই আমার পরে এসে পড়েছিল, আজও দেখলুম, তাই আছে। এটা দেখে আমি ক্ষুণ্ণই হয়েছিলুম। হাজার হোক্, চিরদিনের পশু ; দেবত্ব কি আর তার আয়ত্ত হয়? অভিমানে বুক ফুলে উঠ্‌লো, আজকের কমল যে, তাঁর প্রসাদের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়, আজ দেশের সুসন্তানদের সংস্পর্শে তারও মলামাটি ধুয়ে খাটি সোণা বেরিয়ে পড়েছে, তা জেনেও যিনি তার প্রাপ্য নায্য পাওনা না দেন, তাঁর

হৃদয়ের উচ্চতার প্রতি শ্রদ্ধা কারই বা থাকে যে আমার থাক্‌বে! আমি ত ঠিকই করে ফেলেছিলুম, এমন হতাদরের উত্তর আমি দিয়ে যাব। আর সে উত্তর যাতে বেশ করে তাঁর মর্ম্মে ঘা দেয়, তাও করে যাব। আমি এদের বাড়ীতে জল গ্রহণও করব না। আমার কর্ত্তব্য ছিল সাক্ষাৎ করা, করেছি, তার বেশী আর নয়।

অবোধ, মুর্খ দাম্ভিক যে—সে আর কত ভাল ভাবুতে পারে! কূপমণ্ডুক ত—সূর্য্যের কিরণ যে কি, তার কদর যে কতখানি, সে তা বুঝবে, কেমন করে। সে না বুঝুক, সূর্য্য ত অনুদার নন, পাপী তাপী সকলের ওপরই যে তাঁর সমান করুণা, তা থেকে বঞ্চিত সে হলো না, কাজেই তাকে না চেনার অপরাধ তারই, সূর্য্যদেবের নয়। এটা আমি বুঝলুম মা'র মুখের একটা কথায়!

গয়লা-বৌ মূর্চ্ছাভঙ্গে মা'র কোলে মাথা রেখে যখন সেই খোলার ঘরের অভিজ্ঞতা বলছিল, চারি বলে একটি মেয়ে কেমন কল-কৌশল খাটিয়ে তার ভাইকে দিয়ে 'প্রকৃতির' বড় বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল, বড় বাবু তাকে দেখে, চারির ভায়ের মুখে তার কথা শুনেই মা বলে ডেকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ে পরিচয় দিলেন, তারপর ক'দিন তাঁর আজ্ঞায় বাড়ীর সবাই তাকে কত যত্নে রেখেছিলেন, কিন্তু কাউকে তিনি কোন প্রশ্ন করতে দেন্ নি, নিজেও করেন নি, কেবল একদিন বলেছিলেন, মা মালতী, আমার কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোকের হাতে আমার কাগজ যায়, তাদের মধ্যে তোমার কোন আত্মীয় যদি দেখ্‌তে পান, তিনি নিশ্চয় এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন, আর যদিই তাঁদের দৃষ্টি না পড়ে কি কোনো কারণে তাঁরা তোমাকে না

নিতে আসেন, এই ত তোমার ঘর রয়েছে মা, এই ঘর এই সব আপনার লোক, এদের নিয়েও কি তুমি থাকৃতে পারবে না!

কদিন কেটে গেল, কেউ এল না দেখে, তিনি একদিন খাবার সময় মালতীকে ডেকে বল্লেন—তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে রাঁধতে জান না বল্লে তোমার অসম্মান করা হবে, মা, আমার ইচ্ছে একদিন তুমি রেঁধে আমাদের খাইয়ে দাও।

গয়লা বৌ বল্‌তে লাগ্‌ল, বড় বাবু বল্লেন, ভেবো না মা, আমার জাত যাবে। সে ভাবনা নেই। আমরা ব্রাহ্ম, জাত আমাদের কোথাও যায় না, ভাঙ্গে না, ঠিক থাকে।—কিছুতে ছাড়লেন না, সেদিন দুপুরবেলা যা জান্‌তুম রেঁধেছি, পরিতোষ হয়ে খেয়ে কত আশীর্ব্বাদ করলেন, আমরাও খেতে বসেছি, এমন সময় হাসিমুখে এসে বল্লেন—মা মালতী, প্রকৃতির বিজ্ঞাপনে কায হয়েছে, তোমার আত্মীয় এসেছেন, নাম বল্লেন—কমল।

গয়লা-বৌ-কে নতাননে নীরব হতে দেখে মা বল্লেন—বল ম, লজ্জা কি। তার পর?

পিসিমা, আমার ভয় হয়েছিল .

বল মা বল!

তারপর—তোমার নাম করলেন! তোমার বাড়ী শুনে ..

সে থাম্‌ল। বাকীটা আমরা বুঝতে পারলুম। মা বল্লেন—মালতী, কমলকে দেখে তোমার ভয় হয়েছিল, হবারই কথা, তুমি ত জানে না—কমল সে কমল নেই! স্বর্ণকমল হয়ে গেছে। কমল প্রসাদ আমার দুই ছেলে। এদের রেখে যেতে পারলে আমার কোন দুঃখই থাক্‌বে না।

হারে অবোধ মূঢ়! তোর অভিমানের ত এই পদার্থ! মা'র ঘরেই একটা পশমের ছবি টাঙ্গানো দেখেছিলুম লেখা ছিল—

কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়!

তাও কি কখনো মিথ্যা হয়?

মা বোধ করি দশবার গাড়ীর খবর নিয়েছেন! আমারই মনে ভাবনার অন্ত ছিল না,'তার' পেয়েও প্রসাদ কেন আস্‌ছে না,—মা'র ভাবনা যে কত কি তা আর জানি নে, না, বুঝিনে।

রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে ছাতে শুয়ে রাজ্যের কারণ খুঁজে বেড়াতে লাগলুম,—কোন্‌টা প্রসাদের আগমনের বিঘ্ন হতে পারে! কারণ ত কল্পনায় এক লক্ষেরও অধিক বার করলুম, কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হল না। 'মা উৎকণ্ঠিত'—এ খবরের চেয়ে প্রসাদের কাছে বেশী মূল্যবান খবর যে কিছু থাকতেও পারে না, সেটা খুব ভাল জানতুম বলেই দুর্ভাবনা হ'তে লাগল। লোকের মনের খবর আমি জানি নে, আমার নিজের কথা বলতে পারি, প্রসাদের সম্বন্ধে দুর্ভাবনা আমার মনে স্থায়ী হতে চাইল না! লোকে বলে বটে, আপনাদের লোকের জন্যে অল্পেই দুশ্চিন্তার উদয় হয়—কিন্তু আমার তা হয় নি!

খুব মনের জোর নিয়েই তাই রাত্রে বিছানা নেবার আগে মা'কে বলতে পেরেছিলুম, আমার মনে হচ্ছে, টেলিগ্রাম পৌঁছোয় নি মা!

মা—তা হ'বে—বলে চলে গেলেন।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, কি আমি চাই? উত্তর হল, গয়লা-বৌ-কে সুখী করতেই আমি চাই। প্রশ্ন—তা কেমন করে

হবে? উত্তর—প্রসাদকে সে ভালবেসেছে, সেটা ত আর কারোই অজানা নেই, তার সঙ্গে বিয়ে হলেই সে সুখী হবে।

অসবর্ণ বিবাহ আইনতঃ অসঙ্গত নয়। তবে সমাজতঃ অন্যায় হতে পারে। কিন্তু সে সমাজ, প্রাণহীন জড়ের সমাজ! সে সমাজে আন্তরিকতা নেই, অনুভূতি নেই, কেবল আগেকার সমাজের ভেতরটা করী-ভুক্ত কদবেলের মত অন্তঃসারশূন্য খোলায় ঠেকেছে। মানুষ যে, যার প্রাণ আছে, তার কাছে এ সমাজের দাম খুব বেশী নয়, সে অনায়াসেই এমন সমাজের গণ্ডীর বাহিরে আসতে পারে, এসে বেঁচে যায়ও।

আমি নিজে মানি নে। তবে আমার না-মানার কারণ এ নয় যে, শুদ্ধ লোকাচার পূর্ণ সমাজকে আমি অশ্রদ্ধার চোখে দেখি বলে! তা মোটেই নয়! আমার না-মানার একমাত্র কারণ, আমি গ্রাহ্য করি-নে। কিসের সমাজ ও? কেন সমাজ! কি কাজ করেছে? কার কতটুকু উপকারে লাগে?

প্রসাদ মানে, তবে তার মানার মধ্যেও খানিকটা বৈচিত্র্য আছে। সমাজে থাকব বলে সে মানে না, এই খোলাটার ভেতর শাঁস পুরে আবার তাকে একদিন পূর্ণ করবে, এই আশায় সমাজকে সে মানে, আর রক্ষা করে চল্‌তে চায়। কিন্তু তা করলে তার চল্‌বে না। আমি তা'কে দিয়ে নতুন সমাজ গড়াব। আমার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সহায় হবে, গয়লা-বৌ—মালতী!

অসবর্ণ বিবাহ করে প্রসাদ একঘরে হয়, আমি গিয়ে তাকে দু'ঘরে করব। আর এ গর্ব্ব আজও কমলচন্দ্র করতে পারে যে, যে সমাজে সে আর প্রসাদ থাক্‌বে, সে সমাজ একঘরে নয়,—শতঘরে, সহস্রঘরে হয়ে পড়তে তার দেরী হবে না।

প্রসাদের কথা

অমলের হাতে টেলিগ্রাম খানা দিয়ে বল্লুম, ভাই কিছু বুঝতে পারছ?

অমল অনেকক্ষণ লাল কাগজখানায় চোখ রেখে চুপ করে বসে রইল, তারপর গম্ভীরভাবে বলে উঠল—তোমার যাওয়া উচিত, প্রসাদ!

উচিত ত, কিন্তু যাই কি করে বল! এখানে-ও ত কাজ কম নেই।

অমল বল্লে—তা আর কি করা যাবে বল! একটা বিশেষ কিছু না ঘটলে আর কমল জরুরী তার করত না, এটা বুঝছ ত?

মনে-মনে সেটা যে না বুঝছিলুম তা নয়, কিন্তু কাজও ছিল সেদিন আমাদের অনেক। সে দিন আমরা দেশের সমস্ত চাষীকে মাঠে জমায়েৎ হতে বলে এসেছি। তাদের নিয়ে আমাদের একটা মস্ত কাযের খসড়া করতে হবে। আমরা দেশ থেকে পাটের চাষ উঠিয়ে দিয়ে ধান, তুলো এ সবের চাষ তাদের দিয়ে করাতে চাই। প্রথমে তাদের কিছুতেই রাজী করা যায় নি। ঘরে ঘরে গিয়ে সেধেছি, প্রত্যেককে আলাদা বুঝিয়েছি, অনুনয়, বিনয়, কিছুতেই কিছু হয় নি। তারা তাদের পিতৃ পিতামহদের ওপর খুব শ্রদ্ধাবান; তাঁরা যে কাজ করে গেছেন, তারা তা'ত করবেই, তার কম বেশী একচুল করবে না,—করলে তাঁদের অশ্রদ্ধা করা হবে, এই তাদের মত। তার ওপর স্বার্থের সম্ভাবনা যেখানে অধিক, সে পথ ছাড়ানোও ত সহজ নয়।

তাই যখন তাদের আলাদা আলাদা মত করাতে কিছুতেই পারা গেল না, তখন আমরা তাদের সকলকে বড় ভুঁইয়ের মাঠে জমা হতে বলে এসেছিলুম। সেখানে আমরা তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, পাটে আর তুলায় প্রভেদ কি আর কতখানি।

পাটের বীজ বোনবার সময় এসে পড়েছে, আজকালের মধ্যেই সবাই বীজ বুনে ফেল্‌বে, এখন একদিন এখান থেকে চলে গেলে, ফল যে কি দাঁড়াবে, তা খুব ভাল করে জানি বলেই, কমলের জরুরী তার পেয়েও ছুটতে পাচ্ছি নে। আমার মা উৎকণ্ঠিত জেনেও পায়ের শক্তি হারিয়ে বসে আছি। আমি জানি, মা আমার না-যাবার কারণ জান্‌লে কখনই আমার উপর বিরক্ত বা ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু সেটা জানাবার উপায়ই বা কি! 'তার' করে দেব? 'তার' অবশ্যই এখনই পৌঁছে যাবে, মা'র ভাবনাও আর থাক্‌বে না, কিন্তু—কিন্তু তা'তেও আমার মনের ব্যাকুলতা নিবারিত হবে কি?

কমলের তারে কি দরকার, তার কোন উল্লেখ না থাক্‌লেও আমি বুঝতে পারছিলুম, অভাগিনী মালতীকে পাওয়া যায় নি, তারই জন্যে মা উদগ্রীব, সেই জন্যই আমায় আহ্বান! কমল পারে নি তাকে খুঁজে বার করতে, পারা অসম্ভবই ছিল। কিন্তু আপন স্বার্থ বিজড়িত ছিল বলেই অন্যরূপ কল্পনা করে আমি অন্তরে সুখের আস্বাদই অনুভব করছিলুম! কমল অনেক খবর রাখে, অর্থবান, লোকবলও তার যথেষ্ট, তার চেষ্টায় সত্যিই মালতীকে হয়ত আমরা ফিরে পাব, এই আশালতা-টাকে আমি অন্তরের বারি সিঞ্চনে জাগিয়ে রেখেছিলুম,—কমলের তার পেয়েই আমার সে আশালতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেলো!

তাকে ফিরে না পাওয়ার যে দুঃখ—নতুন করে আবার জেগে উঠ্‌লো! এই বলে মনকে প্রবোধ দিলুম, আমার কোন হাত নেই।

কিন্তু এ প্রবোধ ত মন মান্‌তে চায় না। সে যে বায়ুতাড়িত তরণীটির মতই ধেয়ে যেতে চায়, সেইখানে সেই অজানা অচেনা স্থানে, যেখানে অভাগিনী মালতী আপন-হারা বিভোর হয়ে পড়ে আছে। দুটি নয়নে তার শত ধারা বইছে!

অমল এ-সব জান্‌ত না, আমি তাকে না বলে পারলুম না। ব'লে যেন বুক খালি হয়ে গেল।

অমল বল্লে—আমি এদের হাতে পায়ে ধরে একটি দিনের সময় চেয়ে নেব, তুমি একদিন ঘুরে এস।

আমি বল্লুম, ভাই, অত বড় সহরে কোথায় সে আছে, একদিনে কি তাকে খুঁজে পাব!

অমল বল্লে—পাবে, পাবে, নিশ্চয় পাবে। আমি বল্‌ছি—পাবে।

আমাদের মধ্যে অমল ছিল, সত্যবাদী ঋষি! তাকে আমরা ভালবাসতুম, শ্রদ্ধা করতুম, ভক্তিও করতুম। তাই তার কথা শুনে সত্যিই আমার মনে হল, হয়ত পাব! কিন্তু আর একদিনের অক্লান্ত শ্রম যে বিফল হয়ে গেছল, তাও ত জানি না, সে কথাও বল্লুম।

শুনে অমল বল্লে—সেদিন তুমি তাকে খুঁজেছিলে বটে প্রসাদ, কিন্তু এমন করে' হৃদয় দিয়ে খোঁজ নি!

খুঁজি নি?

না। সেদিন তুমি মালতীকেই খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলে,—তোমার মালতীকে খুঁজ্‌তে যাও নি, গেলে পেতে!

অমল

শোন! হৃদয়কে বঞ্চনা কর না, এই মালতীকে তোমায় চাই। আমার মতে তুমি এখনই কলকাতা চলে যাও। মালতীকে খুঁজে বের কর। তারপর ...

অমল এক মিনিট থেমে বল্লে—প্রসাদ, দেশের কায করতে হৃদয় চাই, সে হৃদয় যদি অন্য কোথাও বাঁধা পড়ে থাকে, তা হলে দেশের কায করবে কেমন করে ভাই! দোহাই প্রসাদ! হৃদয়কে উপবাসী রেখে দেশের কায করতে নেমে মিথ্যা পণ্ডশ্রম কর না। আমার কথা শোন প্রসাদ, আজই চলে যাও!

আমার মাথার ভেতর তখন কি-যে হচ্ছিল, আমিই জানি নে! কোন কথাই স্থির ভাবে ধারণা করতে পারছিলুম না, বল্লুম—ভেবে দেখি অমল!

অমল বল্লে—ভাবতে সময় লাগে, সময় চিরদিন বিশ্বাস-ঘাতক!

কিন্তু মা'র মত ত জানি নে—

তার দরকার নেই! মা যে প্রসাদ! সন্তানের মা কি সন্তানের মতের বিরোধী হতে পারেন!

বল্লুম—তা'হলে কাল সকালেই যাব।

অমল ঘাড় নেড়ে চলে গেল, রাত তখন ১১টা।

১৪

লেখক—শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ

অমলের কথা

আলোর ঝলক্ যখন পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে, তখন চতুর্দ্দিকে একটা জাগরণের কোলাহল সৃষ্টি করে। তেমনি দেশে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এমনি একটা আলোর ঝলক্ আসিয়া দেশময় চেতনার উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তোলে।

এমনি একটা স্রোত আসিয়া যখন হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিল, অমনি আমার রুদ্ধ অর্গল মুক্ত হইয়া গেল। সে আকুল প্রবাহে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দিলাম। মনে হইল, যে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহাকে এতদিনে লাভ করিয়াছি। আমি প্রাণ ঢালিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইলাম।

প্রথমে খুবই উৎসাহের সহিত কর্ম্ম-স্রোতে বহিয়া যাইতে লাগিলাম। একটা প্রেরণা আসিয়া আমার হৃদয় তন্ত্রীর সবগুলি তারকে অব্যক্ত মধুর সুরে সজাগ করিয়া তুলিল। কিন্তু কলিকাতায় বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে আমি সুর হারাইয়া ফেলিলাম। আমার গোপন বীণার সবগুলি তার একসঙ্গে 'ধর্ম্মঘট' করিয়া সহসা নীরব হইয়া পড়িল। তাহারা আমাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—যেখানে প্রত্যেকেরই নেতা সাজিবার

স্পৃহা আছে, কিন্তু নীতিজ্ঞান নাই; ব্যক্তিত্বের সৌধ গড়িবার প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি দেখাইবার আগ্রহ নাই; বিরাট্ ধর্ম্ম মন্দির তুলিয়া সকলকে চমকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ সমভাবে সকলকে বুকে টানিয়া লইবার মত ঔদার্য্য নাই—সেখানে আমরা মিলনের সুর ঢালিতে পারিব না। আমি আশাহত হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

সেই দুর্দ্দিনে যখন বিভ্রান্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন হঠাৎ একদিন কমলের সঙ্গে পথে দেখা হইয়া গেল। কমল আমার সমপাঠী। তাহার সহিত আমার আচার ব্যবহারের, রীতি-নীতির অনেক প্রভেদ, তবু ওকে চিরদিনই—কেন জানি না—বড়ই ভালবাসি। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের সঙ্গে জীবনে কোন কাজেই মিল হয় না; অথচ প্রাণে প্রাণে বেশ মিল থাকিয়া যায়। কেন এমন হয় জানি না। কবিরা বলিয়া থাকেন—এটা না কি নাড়ীর টান। তা যাই হউক—কমলের সঙ্গে আমার ভাবটা ছিল এমনি একটা রৌদ্র মেঘের লুকোচুরির মত আব্ছায়া রকমের। প্রাণের কাছে অনেক প্রশ্ন করিয়াও এর কোন কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাই নাই।

কমলের সঙ্গে অনেক দিন পরে আবার নূতন করিয়া মিশিতে আরম্ভ করিয়াছি। এ সময়ের মধ্যে উহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উদ্দাম লালসার প্রবাহে সে অবাধে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে, তবু প্রাণটা একেবারে অতল গহ্বরে হারাইয়া যায় নাই। এই পঙ্ক-স্রোতের ভিতর হইতে হৃদয়ের উজ্জ্বল কমলটী বিকাশলাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কমলের হৃদয়-কমল একদিন অপূর্ব্ব শ্রীতে বিকশিত হইবেই—কোন

প্রতিকূল স্রোতই তাহাকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমি ঠিক করিলাম, যদি কমলের প্রতি আমার প্রকৃতই দরদ্ থাকে, তাহা হইলে উহাকে অধঃপতন হইতে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। প্রলোভনের যাদুঘর এই কলিকাতার লেলিহান্ গ্রাস, আর তরুণ-মস্তিষ্ক-চর্ব্বণকারী, কুমন্ত্রণা-বিশারদ 'খুড়ো'টির কবল হইতে কমলকে রক্ষা করিতে হইবেই। আমি কমলের সহিত নিবিড়ভাবে মিশিতে লাগিলাম। নিজের মনটাও তখন কলিকাতা হইতে পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল। আমি কমলকে লইয়া তাহাদের পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলাম। দিন কয়েক পরে খুড়াও আসিয়া দেখা দিল। কি আপদ! যে রাহুর ভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম, সে রাহু আবার আসিয়া জুটিয়াছে। মহা ভাবনায় পড়িলাম।

খুড়োটি যে সে পাত্র নন। তিনি শুধু কমলের মাথাটি ভক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, আমার এই নীরস মাথাটির উপরও তাঁর বেশ লোলুপ দৃষ্টি আছে। সেদিনের কথাতেই এর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাকে বলিতেছে—বাবাজী, পাড়া গাঁ বলে একে ঘেন্না করো না। এখানে এমন মাল আছে যা দেখলে মাথা ঘুলিয়ে যাবে—পাঁচবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়বে। মাল ত না, যেন আমের মোরব্বা—কেবল খাই-খাই ভাব। ভাগ্যিস্ এরা কল্‌কাতায় যায় নি। এরা এখানে আছে বলেই ত তোমাদের মত এমন সৌখীনবাবুদের একটু আদর যত্ন দেখাতে পারি। তার পর বার কয়েক বুক চাপড়াইয়া গৌরবের সহিত বলিল—বুড়ো বলে ভেবো না যে একেবারেই পছন্দ বোধ নেই। কমল আমার পাকা জহুরী—সে জিনিষ চেনে। খুড়োর নামে বাবাজী অজ্ঞান।—এই বলিয়া খুড়ো আনন্দে হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার খোঃ খোঃ করিয়া কাশিতেও

বাধা হইল না। খুড়ার কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সমস্ত দেহ উষ্ণ হইয়া উঠিল। কিছুতেই রসনাকে সংযত করিতে পারিলাম না। জোর গলায় বলিলাম—"সাবধান খুড়ো! ফের যদি তোমার মুখে এ সব কথা শুনি, জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেল্ব। কোন কমলই তোমায় বাঁচাতে পারবে না।" আমার গোঁয়ার-গোবিন্দ চেহারা দেখিয়া সেই যে খুড়া পলাইল,—আজ পর্য্যন্ত আর তাহার দেখাটি নাই। ভগবান্ করুন, ও পাপমুখ যেন আমাদের আর দেখিতে না হয়।

কোন দিন সাক্ষাৎ ভাবে পল্লীর সাথে পরিচয় ছিল না। পল্লীর কত মধুর চিত্র কল্পনা করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম,দূর হইতেই জিনিষটাকে ভাল দেখায়। কল্পনার ছবির সহিত বাস্তব চিত্র অনেক সময়ে বড় বৈষম্য ঘটায়। কত আশা করিয়া পল্লীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই নিরাশ হইয়া পড়িতেছি। হয় ত পূর্ব্বে এ পল্লী মধুর উৎস ছিল—কিন্তু আজ সে মূর্ত্ত শ্মশান। তাহার অন্তর মথিয়া সুললিত সঙ্গীত আসে না—যাহা আসে তাহা বেদনার হাহাকার আর নৈরাশ্যের ক্রন্দন। ভাবিয়াছিলাম, এ শ্মশানে আবার মাধুর্য্যের প্রাসাদ গড়িবার চেষ্টা করিব। কিন্তু সে আকাশ-কুসুম আমার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। এখানে আর যাই থাকুক্, মানুষ নাই। যাহারা আছে, তাহারা প্রায়ই মানুষের প্রেত-মূর্ত্তি! এ শ্মশানের অধিপতি নির্জ্জীব নিশ্চল সমাজ-রূপী একটা পাষাণ-মূর্ত্তি। তাহার গলায় দু'গাছি সূতা, কপালে প্রকাণ্ড উল্কি, (লোকে বলে ওটা নাকি কৌলীন্যের জয় টীকা), মাথায় আঠা দিয়া লাগানো একটি টিকি। প্রেতমূর্ত্তিগুলি নির্ব্বিবাদে যুগ যুগ ধরিয়া ইহার পূজা করিয়া আসিতেছে। এ পূজায় তাহাদের ক্লান্তি নাই—ইহা ছাড়া যে

আরও অনেক করণীয় কাজ আছে, তাহা তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। সমাজের দোহাই দিয়া অসামাজিক কাজ করিতে এদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। পর নিন্দায় ইহাদের পরম আনন্দ। দৈনিক এক হাজার বার মালা টপকাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিদেন্ দুই হাজার বার পর নিন্দা না করিলে সে দিনটাই ব্যর্থ যায়।

এখানে আসিয়াই একটি লোকের সঙ্গে বড়ই ভাব হইয়াছে। সে প্রসাদ। কমলের মুখে প্রসাদের মা'র অনেক কথা শুনিয়াছি, এবং তাঁহার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়াছি। প্রসাদের সবল দেহ ও জ্যোতির্ম্ময় চোখ দুটি দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, এ একটি মানুষের মত মানুষ। নিবিড় ভাবে পরিচিত হওয়ার পরে দেখিলাম, এর দেহটা যেমন সবল—মনটা তেমন সবল নয়। এক কোণায় একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে। মালতী তাহাকে ঘূর্ণিবেগে ঘুরাইতেছে। প্রসাদ মালতীকে লাভ করিতে চায়। মালতীর রূপের জ্যোতিতে বুঝি প্রসাদের চোখ দুটি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। প্রসাদের মুখে অনেকবার মালতীর রূপের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার গুণের পরিচয় ত তেমন কিছু পাই নাই। এই রূপই প্রসাদকে পাগল করিয়াছে—প্রসাদ মরিয়াছে। মানুষ কত বড় ভণ্ড,—সে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে—আত্মাকে প্রবঞ্চনা করিতে একটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রসাদ প্রেমিক সাজিতে চায়; কিন্তু এ যে প্রেম নয়, রূপের তৃষ্ণা,—এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না। প্রেমিক হইতে হইলে যে আত্মদানের শক্তি—যে সংযম দরকার, তাহা এই সংসারে কয়জনের আছে? এখানে প্রেমের অর্থ—লালসার উদ্দাম প্রবাহ —যৌবনের নির্ম্মম অভিশাপ।

প্রসাদবাবুকে আসিতে ‘তার’ করা হইয়াছে। উৎকণ্ঠায় বারবার ভাবি, এই বুঝি তিনি আসিলেন। আমাকে দেখিয়া কি ভাবিবেন—কি জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সব নানা চিন্তা আসিয়া মনটাকে অস্থির করিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে প্রসাদবাবুকে না দেখিয়া বড়ই দমিয়া গিয়াছিলাম। তাঁকে দেখিবার জন্য আমি যতটা আকুল, আমাকে দেখিবার জন্য তিনিও কি তেমনি আকুল? আমার ছবিটা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন। তবু কেন জানি না, অভিমানে আমার বুকটা ফুলিয়া উঠিতেছিল। কেনই বা ছবি আঁকা, আর কেনই বা এই শাস্তি? আমার উপর বুঝি একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। হবেও বা তাই। তিনি ত জানেন না—আমি কি চক্ষে তাঁকে দেখিয়াছি! ভগবান্ বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তিনিই আমার কাছে জাগ্রত ভগবান্। একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি দিতেছে। না—না, তা কিছুতেই হইতে দিব না। আমি তাঁকে স্পর্শ করিব না। আমার দেবতার গায়ে কলঙ্কের ছাপ দিয়া তাঁকে কখনই মলিন হইতে দিব না। আমার দেবতার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব না। আমার নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে দমন করিব—আমি সংযত হইব। সাত-পাঁচ কত ভাবিতেছি, এমন সময় বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—‘মা, আমি এসেছি। দরজা খোল।’ এ’ত প্রসাদ বাবুরই কণ্ঠস্বর। অজানা পুলকে আমার হৃদয়টা ভরিয়া গেল। পিসীমা আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম—প্রসাদ বাবুই বটে।

দুপুর বেলায় সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে আমি আমার ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছিলাম, এমন সময় ধীরে প্রসাদবাবু ঘরে ঢুকিলেন। আমি ভাল করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলাম না। একটা তড়িৎ প্রবাহ আমার সমস্ত দেহ মনে কি ভীষণ কম্প তুলিয়া দিল। মনে হইতেছিল, তিনি যদি এখন চলিয়া যান, তাহা হইলেই বাঁচি। কেহ যদি দেখিয়া ফেলেন, কি উপায় হইবে ?

তিনি ডাকিলেন—"মালতি !" আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল—সাড়া দিতে পারিলাম না। তিনি আবার বলিলেন—"মালতি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।" আমি বহু কষ্টে সঙ্কোচ ভয় দূর করিয়া উত্তর দিলাম—"বলুন।" তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কেন এ বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, সব বুঝেছি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোমাকে না পেলে আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হবে। বল, মালতি বল, তুমি আমার হবে।" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কিছুক্ষণ মনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম চলিল। আকুল ভাবে ভগবানকে স্মরণ করিলাম—ভগবান্ আমাকে বজ্র বহন করিবার শক্তি দাও, আমার দেবতাকে দুর্ব্বলতার হাত হইতে রক্ষা কর। আমি জয়ী হইলাম। এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম —"না—না, তা হবে না—কক্ষণো হবে না।" এই বলিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পাশের ঘরে আসিলাম। মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সমস্ত আলোক যেন নিভিয়া গিয়াছে—সেই অন্ধকারের ভিতরে পৃথিবীটা আমাকে লইয়া শোঁ-শোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম।

প্রসাদের মা'র কথা

প্রসাদ আসিয়াছে। মালতীকে খুঁজিয়া পাওয়াতে সে খুবই সুখী হইয়াছে। কমল বলিতেছিল—"প্রসাদ দা'র সঙ্গে মালতীর বিয়ে হ'লে কেমন হয়।" আমি কমলকে ভৎর্সনার সুরে বলিলাম—"ছিঃ কমল, এসব বল্‌তে নেই।" কমলের মনে হঠাৎ কেন এ কথাটা জাগিল? প্রসাদ কি কমলকে কিছু বলিয়াছে? কমলকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ভয়,—কি অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া বসি। প্রসাদ কি জানে না, সে আমার কত গৌরবের ধন। আমি চাই—প্রসাদ একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া তাহার মায়ের মুখ উজ্জ্বল করুক।

সন্তানকে স্নেহে স্নিগ্ধ করিয়াই কি জননী-হৃদয় নিশ্চিন্ত থাকিবে? না তা নয়। দরকার হইলে তাহাকে কঠোর হইয়া সন্তানকে দুর্ব্বলতার হাত হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

প্রসাদকে সকল কথা খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিব। নানা চিন্তা করিয়া এক দিন প্রসাদকে একা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রসাদ, এ সব কি শুনি?" প্রসাদ আমার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, আমার ভুল,—আমার অপরাধ,—আমার দুর্ব্বলতাকে এবারের জন্যে ক্ষমা কর।" পুত্রের দরদ্ কোথায়, মাতৃ-হৃদয় তাহা মুহূর্ত্তে ধরিয়া ফেলিল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন কথা বলিবার মত শক্তি তখন ছিল না। হৃদয়ের সমস্ত বাঁধ চূর্ণ করিয়া অশ্রুর প্লাবন বহিয়া গেল।

প্রসাদকে বুকে টানিয়া লইয়া মাতা-পুত্রে কতক্ষণ কাঁদিয়াছি জানি না, হঠাৎ চাহিয়া দেখি, জানালার রেলিঙ ধরিয়া মালতী কাঁপিতেছে। ছুটিয়া গিয়া মালতীকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে আমার বুকে মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

১৮

লেখিকা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

কমলের কথা

দেশে ফিরে এসেছি। মা-ও চলে এসেছেন। বাঁচা গেছে। কলকাতা যার ভাল লাগে, লাগুক, আমার আর ভাল লাগে না।

সংসারটা যে কি রকম, তা আজও বুঝে উঠতে পারছি নে। আমি একে যত চিনতে যাই, এ ততই দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। সংসার কি সত্যই এমনি, না শুধু আমার কাছেই এমনি?

ভাবি—ভগবান কি না দিয়েছেন আমাকে, সবই দিয়েছেন, নিজে ইচ্ছে করে যদি আমি তা নষ্ট করে ফেলি, তার দায়ী তো তিনি নন্! তিনি শুধু দেখে যাবেন, আমার কাজের ফল ঠিক কর্‌বেন, দায়ী হবেন না।

অমল এখানে এসে বেশ ছিল, আমিও তার সঙ্গে মিলে বেশ দিনগুলো কাটিয়ে দিতুম। বলতে কি—এই সময়টাতেই আমি মনে যথার্থ শান্তি পেয়েছিলুম, আর কখনও এমন শান্তি পাই নি। আমার রাহু খুড়োমশাই হঠাৎ এক দিন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছলেন, তাঁর সাড়া সে সময়টা পাই নি। পরে শুনেছিলুম, তিনি নাকি দুশ্চরিত্র অমলকেও নষ্ট করবার কল্পিতে ছিলেন, তাহার কোমল মাথাটি চর্ব্বণ করবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

কিন্তু অমলের তাড়া পেয়ে একদম গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অমল এক একবার আমার গা চাপড়িয়ে হাসতে হাসতে বলত, রাহুমুক্ত চাঁদের আলোর মত, তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ুক ভাই, দেশটা শান্ত হোক।

এ দিকে ভাইয়ের মত অমল, এ দিকে দেবীরূপিণী মা, এরা দুজনে আমার শুষ্ক হৃদয় নদীতে তুফান উঠিয়েছিলেন। প্রতিদিন একবার করে মাকে আমার দেখে আসা চাই-ই। যদি কোন দিন না যেতে পারি, আমার মনে হয়, সেদিনটা আমার সম্পূর্ণ মিছে হয়ে যেত।

প্রসাদ আমার কাছে অনেক কথা গোপন করে যেত, যেন সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারত না। আমি তার মনের মধ্যে থেকে তার ভ্রান্ত ধারণাটা কিছুতেই দূর করতে পারি নি। দেখলুম, মানুষের মনে একবার অবিশ্বাস জন্মে গেলে, কিছুতেই আর তা দূর করা যায় না। মালতীকে আমিই যে নিয়ে গেছলুম, এ কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না জানলেও, প্রসাদ আমায় বিশ্বাস করেনি। মুখে সে হৃদ্যতা দেখালেও, তার মনের কোনখানে যে এই অবিশ্বাসটা জেগে ছিল, তা আমি বেশ বুঝতে পারলুম। দেশের জমিদাররূপে দেশের সেবার জন্যেই সে আমায় পাশে ডেকে নিয়েছিল। অমল যেমন ভাইয়ের মত পরিপূর্ণ স্নেহ দিয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল, সে তেমন করে নিতে পারে নি।

না নিক্, তাতে আমার একটুও ক্ষতি নেই। আমি ভাই পেয়েছি, মা পেয়েছি, আমার বুক ভরে গেছে,—তার স্নেহ ভালবাসা আমি চাই নে। আমি সত্যকে চিনেছি, আমি সত্য পথের পথিক হব,—আর কিছুর দরকার নেই, আর কিছু আমি চাইনে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা। সারাদিন অবকাশ পাই নি, অন্য গ্রামে গেছলুম

অমলের সঙ্গে। প্রসাদ যায়নি, তার এ দিকে কাজ ছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেই অমলকে বললুম, একটু বস ভাই, আমি ঝাঁ করে আসছি।"

সে আপত্তি করবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

আপন মনে চলছিলুম বেশ। সন্ধ্যার তরল আঁধার তখন গ্রামের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে,—দূর দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠেছে,—উজ্জ্বল আকাশটা আস্তে আস্তে মলিন হয়ে আসছিল,—তাই দেখতে দেখতে আমি চলেছিলুম। বাগানটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালুম, এ বাগানটা প্রসাদদেরই। দেখলুম, গাছের নীচে অন্ধকারের মধ্যে কে বসে। আমার পাশেই ছিল সে, একটু ভাল করে দেখতেই চিনতে পারলুম, সে মালতী।

চাপা কান্নার শব্দ আমার কাণে ভেসে আসছিল, আমি তাই দাঁড়ালুম। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলুম, কেন সে কাঁদছে? তবে কি মা কিছু বলেছেন?

মা কিছু বলবেন, এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। সেই স্নেহময়ী দয়াময়ী মা,—যাঁর মুখে একটা তিক্ত কথা কেউ কখনো শোনে নি,—যাঁর রাগ করা একেবারেই কল্পনাতীত,—তিনি কিছু বলবেন? তবে—বোধ হয় প্রসাদ,—না, সেও কিছু বলবে না। আমি প্রসাদকে চিনি, সে কিছু বলতে পারে না, মায়েরই ছেলে ত সে।

ভাবলুম, তাকে জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে, কিন্তু প্রথমটায় কিছুতেই কথা বলতে পারি নে, কে যেন গলা চেপে ধরলে। এ কি আমিই সেই—যে এক দিন—

না, থাক সে কথা, জোর করে এগিয়ে গিয়ে ডাকলুম "মালতি—"

সে চমকে উঠ্‌ল। আমায় সামনে দেখে উঠে দাঁড়াল। তার কোল

হতে সাদা মত কি একখানা পড়ে গেল,—সে দিকে সে চাইলে না, কিন্তু আমি চাইলুম।

আমি বললুম, এখানে এই সন্ধ্যাবেলা একলা কাঁদছ কেন মালতী? কেউ তোমায় কিছু বলেছে কি?

আমার কণ্ঠস্বরে করুণা বেজে উঠেছিল কি কঠোরতা ঝরে পড়েছিল, তা সেই-ই জানে। সে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারলুম, তার বুকের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত চলেছে—উত্তর দেবে কি না। খানিক পরে উত্তর দিলে—না, কেউ কিছু বলে নি।

কথাটা শেষ করে সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলে গেল, আর একবার ফিরেও চাইলে না।

আশ্চর্য্য হয়ে আমি তার পানে চেয়ে রইলুম। কি আশ্চর্য্য স্বভাবের এই মেয়েটা! আমি তাকে এ পর্য্যন্ত চিনতে পারলুম না—সে কি! আমায় সে ভারি অবহেলার চোখে দেখে, আমি যে একটা মানুষ তা সে কোন কা'লই মানতে চায় নি, আজও মানলে না! এমন গর্ব্বিত ভাবে সে চলে গেল যে, সেই গর্ব্বিত পা দু'খানার প্রতি ক্ষেপের দাগটা যেন আমার বুকের মধ্যে গেঁথে গেল।

আত্মসংবরণ করে ফেললুম। ছিঃ, আবার মোহ! আমায় সব বিসর্জ্জন দিতে হবে,—আমায় এ সব চিন্তা ভুলতে হবে যে। সে আমায় না মানুক, তাতে আমার কি? তার চোখে আমায় যে মানাতেই হবে, এমন কোনও কথা হতে পারে না।

বুকের মধ্য হতে কে অধীর চীৎকার করে বলে উঠল—বৃথা আশ্বাস! একবার এখানটায় হাত দিয়ে দেখ, তার পর কথা বলো। তুচ্ছ একটা

নারী—সে কি না তোমার মত একটা পুরুষকে এমন করে ঘৃণা করে চলে যায় ?

মা—রক্ষা কর, রক্ষা কর তোমার ছেলেকে। আমার চারিদিকে বাঁধ দিয়ে রেখেছ,—তুফান উঠছে, বাঁধ ভেঙ্গে গেলে, আবার বান ডাকবে যে ! মা ! ধর্ম্ম-রূপিণী, এসো মা শক্তিদায়িনী, দাঁড়াও, যেমন করে মহিষাসুরকে দলিত পেষিত করেছিলে, আমার বুকের এই দুর্দ্দান্ত রিপুটাকে তেমনি দলন কর মা।

বুকে জোর পেলুম। চলে যাচ্ছিলুম, চোখ পড়ল সাদা সেই বস্তুটার ওপরে। ভাবলুম নেব না, স্পর্শ করব না ; কিন্তু পারলুম না—সেটাকে আবার তুলে নিতে হল।

একখানা রুমাল, বুঝলুম এখানা প্রসাদের সেই খদ্দরের রুমালখানি ; যেখানা সেদিন অমল নিজের হাতে সুত কেটে তাঁতে বুনে তার পর নিজের হাতে সেলাই করে প্রসাদকে উপহার দিয়েছিল।

এক মুহূর্ত্তে চোখের সম্মুখ হতে কালো পর্দ্দাটা খসে পড়ে গেল, সত্য আবিষ্কার হয়ে গেল। বুকে কিন্তু বড় আঘাত পেলুম। তাই জড়ের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

সম্ভব—সম্ভব, জগতে সবই সম্ভব। মালতী প্রসাদকে ভালবাসতে পারে, এও যেমন সম্ভব, আবার প্রসাদও যে মালতীকে ভালবাসতে পারে, সেও তেমনি সম্ভব। জগতে অসম্ভব কি আছে ? কিন্তু তবু মন বললে এমন ধরণের সম্ভব ত সে আশা করে নি।

আগুন নিয়ে খেলা—হাত পুড়বে, অবশ্য পুড়বে। প্রসাদ আগুন নিয়ে খেলতে বসেছে, তার সোণার ঘরে আগুন জ্বলে উঠেছে—এখন উপায় ?

রুমালখানা পকেটজাত করলুম।

সেই দিন যে কি করে মার কাছে বলে ফেললুম ;—প্রসাদদার সঙ্গে মালতীর বিয়ে দিলে কেমন হয়, সে কথা ব'লতে পারি নে। চেয়ে দেখলুম, মার জ্যোতিঃমণ্ডিত মুখখানা নিমেষে মলিন শবের মত হয়ে গেল। অনিমেষে তিনি আমার পানে চেয়ে রইলেন ; তার পর বলে উঠলেন—ছিঃ কমল, ও কথা বলতে নেই।

সে কথা আমার বুকের মধ্যে গিয়ে এঁকে গেল। লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পরলুম না, আস্তে আস্তে বিদায় নিয়ে বাড়ী এলুম।

তাই কি হতে পারে? এও কখনও সম্ভব হয়? মালতীর সঙ্গে প্রসাদের বিয়ে—সমাজ কখনই সহ্য করবে না! সমাজকে না মানলুম – মা কখনই সহ্য করতে পারবেন না। মার যে ঐ একটী মাত্র ছেলে! আর মালতী, সে কত জায়গায় না পরিচিতা হয়ে গেছে।

রাত্রে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙ্গল সকাল বেলায় —প্রসাদের ধাক্কায়।

আঃ—কি ঘুমই ঘুমাচ্ছো কমল, একঘণ্টা ধরে ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙ্গে গেল। ওঠো, মুখ হাত ধুয়ে নাও, এখনি তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে!

আমি ধড়ফড় করে উঠে পড়লুম। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে বললুম, কোথায় যেতে হবে।

প্রসাদ বলিল—জমি জমা গুলো দেখতে,—অমল ঘুম ভাঙ্গতেই চলে গেছে, বলে গেছে তোমায় নিয়ে যেতে। একটু জল খেয়ে নাও, ফিরতে দেরী হবে।

প্রসাদের সঙ্গে বেরুলুম।

দুজনে পাশাপাশি চলছিলুম,—প্রসাদ ধীর স্বরে বললে, তুমি মাকে

জিজ্ঞাসা করেছিলে কমল, মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে কেমন হয়? হঠাৎ তোমার এ কথা জিজ্ঞাসা করার মানেটা কি?

সাহস করে চেয়ে দেখলুম, তার মুখখানা বেশ শান্ত। তখন সব কথা খুলে বললুম, আরও বললুম, আমায় মাপ কোরো ভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি—কথাটা কতদূর অন্যায়।

প্রসাদ প্রসন্নমুখে বললে, তোমার দোষ কি ভাই? তুমি ভাল কথাই বলেছিলে। মা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

বল্‌তে বল্‌তে সে থেমে গেল। আমি বল্লুম—তুমি কি বল্‌লে?

গভীর স্বরে প্রসাদ বললে—এ কি হবার মত ভাই? বিয়ে কথাটা কি যেমন তেমন মুখের মত একটা কথা? জীবনের সঙ্গিনীরূপে যাকে স্কন্ধে গ্রহণ করতে হবে, শুধু তার দিক আমার দিক দেখলেই চলবে না,—দেখতে হবে আগে আমার মাকে, নিতে হবে আগে তাঁরই মত! আমার বুক ভেঙ্গে গেলেও আমাকে মার আদেশ পালন করতে হবে। মা যদি বলেন, কে তোর কাছে বড়, তোর জননী জন্মভূমি, না মালতী, না আমি। আমায় অবশ্যই বলতে হবে—সকলের আগে মা তুমি, তার পর আর সব। আমার মায়েরই ছায়া জন্মভূমিতে, আর সেই নারীরই অংশরূপা সব। ভাই, আমার মা কি যেমন তেমন মা? আমার মা যে পূর্ণা মা! তিনি তো অসম্পূর্ণা নন যে, তাঁর কথা ঠেল্‌তে পারব। মালতীকে আমি ভালবাসি, তা বলে তাকে গ্রহণ করতে পারব না। তাকে আজীবন এমনি ভাল-বাসব পত্নীরূপে; কিন্তু আজ গ্রহণ করে বরণ করে আমার মায়ের চোখে জলধারা বহাতে পারব না।

দেখলুম—প্রসাদের চোখ ছল ছল করছে।

মালতীর কথা

আমার দেবতা—ওগো, তুমি আমারই একমাত্র দেবতা। আমি তোমায় ভক্তি করি, ভালবাসি,—তোমার গায়ে একটী আঘাত লাগলে আমার বুকে গিয়ে তা বাজে। ওগো, আমি তো আশা করি নি তোমার আমার এত কাছে আসা,—কেন তুমি এলে, কেন তুমি জানালে তুমি আমায় ভাসবাস ?

সে দিনকার সেই কথাটাই থেকে থেকে আমার কাণে যেন বেজে উঠত—বল মালতী বল, তুমি আমার হবে ?

ছি, কিন্তু মনে ভাবতে বুকের ভেতর ভারি গোপনে একটা পুলকের শিহরণ বয়ে যেত,—আমাকে তা অভিষিক্ত করে' দিয়ে যেত। আমি জোর করে চাপতে চাইতুম—ছি ছি, এ কি কথা, একে মনে আনাও পাপ।

মা ছেলের কথাও আমি শুনেছিলুম। বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল! হায়, এমন করে নিজেকে নিঃস্ব দুর্ব্বল করে ফেললে তুমি, শুধু আমার জন্যে,—ওগো, শুধু এই হেয়, ঘৃণ্য নারীর জন্যে !

কিন্তু তুমি দিতে এলেও আমি নেব না। কেন নেব? যার হৃদয় আছে, সে কখনও অন্যের জিনিষ এমন করে নিতে পারে না। নিঃস্ব হ'য়ে আসা সহজ, কিন্তু নিঃস্ব করাটাই না কঠিন।

পিসীমার মুখখানা গম্ভীর দেখলুম, কেন, তা আমি অনুভবেই কতকটা বুঝলুম। এই পাপীয়সী নারীর জন্যে তাঁকে কত না সইতে হচ্ছে। ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরা মায় হতে পারে না। ছেলে যদি সহস্র

অকাজ করে, মা তাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে ধরবেনই। পিসীমা ও তো সেই মা।

কমলবাবু আর বড় একটা আসেন না। সে দিন তাঁর চোখের সামনে ধরা পড়ে গিয়ে, আমি যেন কেমন হয়ে গেছলুম। কি যে বলব, তা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। প্রসাদবাবুর রুমালখানা আমার কাছে ছিল, তাড়াতাড়িতে সে দিন কোথা যে হারিয়ে ফেলেছি, তার কিছু ঠিক নেই।

পিসীমা প্রসাদ বাবুর বিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চারিদিকে একটা কুৎসা বেরিয়েছিল, যাতে সম্বন্ধ জোটাই দায় হয়ে উঠল।

সে দিন আমি ঘাটে গেছলুম জল আনতে; আকাশে সে দিন নিকষ কালো মেঘে সেজে এসেছে আষাঢ়ের বিকেল,—বেলা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পুকুরের জলে কালো মেঘের ছায়া এসে পড়ে, আরও কালো দেখাচ্ছিল। তার ধারে ধারে বাবলা গাছে হলদে রঙের ফুলগুলো ফুটে উঠে, অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখছিলুম, এমন সময় পেছনে কোমল স্বরে কে বলে উঠল, "জল নিতে এসেছ বুঝি গয়লা-বউ?"

তাকিয়ে দেখলুম, প্রসাদবাবুদের পুরুত ঠাকুরের সেই মেয়েটী। এর মধ্যে কখন যে তার সেই ছোট্ট শরীরটী যৌবনের তুলি স্পর্শে রঙিন হয়ে ভরে উঠছে, তা আমি দেখি নি। অনেক দিন তাকে দেখি নি,—বোধ হয় বছর দুই তিন হবে,—তার বয়েস তখন ছিল, বছর এগার বার; এখন বছর চৌদ্দ হবে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে একটু হাসলে, বললে,— আমায় ভুলে গ্যাছ না কি বউ?

আমি সামলে নিয়ে বললুম—না ভাই, ভুলব কেন? এত দিন বুঝি মামার বাড়ী ছিলে?

মেয়েটি চোখ দু'টো আমার চোখের উপরে স্থাপন করে বললে, হ্যাঁ, মামার বাড়াতেই ছিলুম। কি করব,—এখানে অত্যাচারের চোটে থাকতে পারলুম না যে। যে তোমাদের এখানে লোক সব—

চকিতে আমার মনে ভেসে উঠল, সে সব দেখেছিল,—আমার উপরে যেদিন অত্যাচার হয়, সেদিন সে এসেছিল। আমি তাকিয়ে দেখলুম, তার মুখখানা ভারি মলিন। জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার মা কোথা?

তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শুনলুম তার মা নেই, তিনি অনেক দিন আগে মারা গ্যাছেন। মামা মামী অনর্থক এ ভার সইতে রাজি হননি। কারণ শচীর বিয়ের ভার তা হলে তাঁদের ঘাড়ে পড়ে। সংসারে এমনিই তো প্রায় হচ্ছে! দুবেলা ভাত দেওয়া যেতে পারে,পরণের ছেঁড়া কাপড়খানাও দান করা চলতে পারে। কিন্তু বিয়ে দেওয়াটা,—তাতে অনেক খরচ পড়ে যায়,—কাজেই বিয়ের আগে আত্মীয়রা ভার নিতে চান না। মামারা পরশু তাকে এনে তার কাকার কাছে দিয়ে গ্যাছেন। কারণ, জাতটা তাঁদেরই ;—কলঙ্ক হলে তাঁদের কুলেই হবে ;—মামার কি, বিশেষ তাঁর বোনই যখন নেই।

মনটা ভারি কোমল হয়ে এ'ল। আহা, অভাগিনী মেয়েটার সংসারের সঙ্গে এই বয়সেই বেশী রকম চেনা শোনা হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কাকা কাকিমা ভালবাসেন?

শচী একটু হাসলে মাত্র,—তার সেই হাসিতেই আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেলুম।

জল নিয়ে বাড়ী এলুম। মনের মধ্যে মেয়েটীর সুন্দর মলিন মুখখানা,—তার দুঃখের কথাগুলো জাগছিল। আমি নিজে দুঃখ পেয়েছি বলেই, তার দুঃখ এত সহজে আমার বুকে আঘাত করতে লাগল। যে ব্যথা পেয়েছে, সে ব্যতীত ব্যথিতের ব্যথা আর কেউ বুঝতে পারবে না। ধনী কি অভাবের জ্বালা বুঝতে পারে,—দরিদ্রের ব্যথা অনুভব করতে পারে?

আমার নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, এ মেয়েটীকে কি করে সুখী করা যায়? এমন কি কেউ নেই, যে তাকে বিয়ে করে?

হঠাৎ মনে জেগে উঠল, প্রসাদবাবুর কথা।

এ হতে পারে না কি? প্রসাদবাবু বিয়ে করবেন না বলেছেন; এই তুচ্ছ ঘৃণ্য নারীকে ভালবাসেন বলে, আর কোন নারীকে ভালবাসতে পারবেন না। তিনি এমনই ভাবে দেশের কাজই করে যাবেন, কিন্তু এও কি একটা দেশের কাজ নয়? এই যে কুমারীটি, একে এই দারুণ কষ্ট হতে উদ্ধার করা, এও ত দেশের শ্রেষ্ঠ কাজ! এর কাকা হয় তো কোনও চরিত্রভ্রষ্ট উলছুটে লোকের হাতে একে সমর্পণ করবেন, এবং এর জীবনটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে,—সুখ শান্তি জন্মের তরেই হারাবে! অমূল্য নরজন্ম গ্রহণ করে, সে শুধু ব্যর্থ হয়েই থাকবে। আর তার মাতৃত্ব, এইটাই যে বিষম কথা! দেশের সেবায় চাই সুস্থ সবলদেহী সন্তান! তার সন্তান হবে চিররুগ্ন, তার দ্বারা দেশের কোনও উপকার হবে না, সে একটা দেশের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। এমনি করেই না আমাদের দেশে রুগ্ন-দেহ, দুর্ব্বল প্রকৃতি লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মাতৃত্বের বিকাশ হতে পারছে না, দেশ অধঃপাতে যাচ্ছে।

প্রসাদবাবুর কথা শুনেছিলুম, পিসীমার সঙ্গে তিনি এই কথাই

বলছিলেন। সন্তানের স্বাস্থ্য, তার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি মায়ের উপরেই নির্ভর করে। সন্তান যে হবে, সে যথার্থ সন্তান হতে পারবে—বাপ মায়ের জন্যে। কুচরিত্র বাপেরও অনেকগুলি সন্তান হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য—সে কথা বলে আর কাজ কি? আমাদের দেশে তার তো অপ্রতুল নেই।

বলব—এ কথা আমিই পিসিমাকে বলব। তাঁকেও একবার বলব কি? বলবা মাত্র তাঁর মুখখানা কি রকম হয়ে যাবে—তিনি হয় তো ভাববেন, যাকে আমি এত ভালবাসি, তারই মুখে এই কথা?

বুকের অতি গভীর এক জায়গায় ব্যথা বেজে উঠল। তাঁর মুখখানা কল্পনায় এনে ক্ষণিক বিভোর হ'য়ে বসে রইলুম।

না, তবু বলব। এতে তাঁর ভাল, দেশের ভাল,—দশের ভাল, আর এই মেয়েটীর ভাল। আমারও এতে ভালো।—

এতে ভাল? কিসে ভাল নয়? আমার দেবতা তিনি, দেবতাকে ভক্ত উপরেই রাখতে চায়। ভক্ত আশা করে না, দেবতা তার কাছে আসুক। দেবতাকে দিতে হবে ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা। আমি ওদিকে যাব, আমার দেবতাকে আমি নিঃশেষে কেবল ঢেলে দিয়ে যাব। তাঁকে সকল আপদ বিপদ হ'তে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর কাছে পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবো। আমি আমার দেবতাকে নষ্ট করতে পারব না, নিজের হাতে তাঁকে কাদা মাখাতে পারব না।

১৬

লেখক—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

গয়লা-বৌ, শচীর সঙ্গে প্রসাদের বিয়ের কথা যখন মায়ের কাছে পাড়িল, তখন প্রসাদ কাছেই ছিল। সে আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিল।

মনটা তার ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কেন তা' সে বুঝিতে পারিল না। সে ধাঁ করিয়া মায়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মা, আমার বিয়ের কথাটা তোমরা দয়া করে' আলোচনা করো না; আমি বিয়ে ক'রবো না।"

সেই দিনই সে হঠাৎ তল্পীতল্পা বাঁধিয়া কলিকাতা রওয়ানা হইল—সে বলিল, ভারী জরুরী দরকারে সে যাইতেছে। কিন্তু আসল কথা—গয়লা-বৌর কাছ থেকে পলাইবার তাড়া ছিল।

ষ্টেশনে আসিয়া সে মহা বিভ্রাটে পড়িল। একটি অল্প বয়সের বউ হাবড়া ষ্টেশন হইতে শ্বশুরের সঙ্গে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি ঝি। পূর্ব্বের ষ্টেশনে ভদ্রলোক কোনও কারণে ট্রেণ হইতে নামিয়া যান, কিন্তু আর উঠিতে পারেন নাই। ট্রেণে উঠিবার জন্ত ছুটিতে ছুটিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া খুব গুরুতর রকম আহত হইয়া পড়েন। তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বউ ও ঝিকে নামাইয়া Waiting Roomএ রাখিয়াছেন। বধূ ভয়ে কাঁদিয়া ভাসাইতেছে, ঝি ভয়ানক চেঁচামেচি করিতেছে।

প্রসাদ ঝির কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিল। এই ভয়গ্রস্ত

নারীকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে তার মন সরিল না। পথে ঘাটে অসহায়া স্ত্রীলোকের উপর নানারকম অত্যাচার হয়, তাহার জানা ছিল। তাই এই নারী দুইটি তাহাদের অভিভাবকের জিম্মায় না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রসাদ তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিল না। সে তাহাদের কাছে গেল না, কেবল তফাৎ হইতে তাহাদের পাহারা দিতে লাগিল। কলিকাতার ট্রেণ প্রসাদকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পর UP ট্রেণে ভদ্রলোক আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁর হাত পা ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা, দুইটি ভদ্রলোক ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নামাইল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ভদ্রলোকটির নাম উমানাথ। এলাহাবাদে তাঁহার কিছু বিষয় আছে, তাই দেখা শুনা করেন, আর এক আধটুকু ব্যবসার চেষ্টা করেন। বউটি তাঁর পুত্রবধূ, গত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। উমানাথ বাবু পুত্রবধূকে লইতে আসিয়া এমনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রসাদের কাঁধে ভর করিয়া উমানাথবাবু ওয়েটিং রুমে আসিয়া বসিয়াই বলিলেন "তাই তো, এখন উপায়!"

তাই তো উপায়? এখন তাঁকেই বা দেখে কে,—আর বউকেই বা দেখে কে?

অনেক গবেষণার পর কোনও উপায়ই স্থির হইল না। একমাত্র উপায় এলাহাবাদে উমানাথ বাবুর ছেলেকে, না হয় ময়মনসিংহে মেয়ের বাপের কাছে টেলিগ্রাম করা। উভয়েই দুই দিনের ফের। এ দুই দিন উমানাথ-বাবু থাকেন কোথায়, আর কেই বা তাঁদের দেখে শোনে। প্রসাদ তাঁহাদিগকে নিজের বাড়ীতে লইতে চাহিল। উমানাথ তাহাতে বড়

প্রসন্ন হইলেন না। তিনি বলিলেন, যদি দয়া করে গ্রামের কোনও ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এলাহাবাদে পৌঁছে দেন, তবে আমি তাঁর কেনা হ'য়ে থাকি।

প্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁতে নখ কাটিতে লাগিল, তার যে কলিকাতা যাইবার বড় তাড়া। কলিকাতায় কাজের ভিড়ের ভিতর ডুবিয়া সে সব ভুলিতে চায়।

উমানাথ আবার বলিলেন, ব'লতে সাহস হয় না,—কিন্তু আপনি না কি বড় দয়া ক'রেছেন, তাই বলি,—যদি আপনার বিশেষ অসুবিধা না হয়, তবে আপনি যদি আমাদের পৌঁছে দেন।

ঘোমটার ভিতর হইতে বধূ যে কাতর নয়ন বিশ্বাসের সহিত প্রসাদের মুখের উপর নিবদ্ধ করিল, তাহা প্রসাদের চক্ষে পড়িল। সে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল—তার যে বড় তাড়া।

হঠাৎ তার মনে পড়িল, অমলের কথা—সে যে শুনিলেই যাইতে প্রস্তুত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসাদ বলিল, আচ্ছা, আমি আপনাদের লোক এনে দিচ্ছি।—বলিয়া অমলের সন্ধানে ছুটিল।

অর্দ্ধপথে তার আপনার উপর রাগ হইল। অমলের পক্ষে আজ গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া যে ভয়ানক অসুবিধা হইবে, তাহা সে জানিত। কাল হাটবার, রাজ্যের লোক তার কাছে আসিবে;—তুলা নিতে ও সুতা বেচিতে। এ কাজ অমল কিম্বা প্রসাদ দুজনের একজন না থাকিলে হইবে না। কাজেই অমল যদি যায় তবে প্রসাদকে গাঁয়ে থাকিতে হইবে। তা' ছাড়া; প্রসাদই বা যাইবে না কেন? পরের হিত করিবার এমন অবসর, এতবড় একটা স্পষ্ট কর্ত্তব্যের সামনে সে সঙ্কুচিত হইবে কেন?

বিরক্ত হইয়া প্রসাদ ফিরিয়া বলিল, চলুন, আমিই আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

উমানাথ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঘোমটার ভিতর হইতে আর একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আসিল। দুই ঘণ্টা পরে প্রসাদ উমানাথ বাবুদের লইয়া এলাহাবাদ চলিল।

পথে তাঁহাদের পরিচয় হইল। উমানাথ বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রসাদের সঙ্গে অনেক বিষয় লইয়া আলাপ করিলেন। প্রসাদ দেখিল, লোকটির অন্তর উদার, পৃথিবীর খবর তিনি রাখেন;—আর লোকহিতে তাঁর মতি আছে। উমানাথ বাবুর প্রতি তার শ্রদ্ধা হইল।

উমানাথ বলিলেন, বাবাজীর কি বিবাহ হ'য়েছে?

প্রসাদ বলিল,—না—বলিতে কিন্তু তার মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল।

উ। বিবাহ ক'রবার ইচ্ছা নাই?

প্রসাদ বলিল, না।—বলিতেই তার মনের ভিতর থম্ করিয়া উঠিল। সে কেন যে এই প্রৌঢ়ের কাছে ফট্ করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল, ভাবিয়া পাইল না। নিজের উপর রাগ হইল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

উমানাথ তখন তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, বিবাহ করা উচিত। বিবাহ না করিলে মনের একটা স্থিতিই হয় না। তাঁর অভিজ্ঞতায়—যে কয়টা লোক বেশী দিন বিবাহ না করিয়াছিল, তারা সবাই হয় পাগল হইয়াছে;—না হয় অল্প বয়সে মরিয়াছে, না হয় এমনি একটা কিছু হইয়াছে।

এ সব কথায় অন্য সময় হইলে প্রসাদ অনেক আপত্তি করিতে পারিত।

কিন্তু এখন তার চিত্ত এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিল বলিয়া সে আপত্তি করিল না। সে বলিল,—আমি কখনও বিয়ে ক'রবো না, এমন তো বলি নি। আপাততঃ ক'রবার ইচ্ছা নেই।

ওঃ বুঝেছি, বাবাজী বুঝি অর্দ্ধেক রাজত্ব ও বিদ্যুৎবর্ণা রাজকন্যার জন্য অপেক্ষা করছেন? তা' কিছু মনে করো না বাবা,—আমরা বুড়ো হ'য়েছি, অনেক দেখেছি শুনেছি,—ও সব আইডিয়া কোনও কাজেরই নয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর কোনও দেশেই কোনও স্বামী এ পর্য্যন্ত স্ত্রী পেয়ে—বিয়ের বছর দুই পরে ষোল আনা সুখী হয় নি। কেই দুই আনা, কেউ দশ আনা কেউ বড় জোর বারো আনা—আর average ক'সে নেও, সব দেশেই সাত আট আনায় দাঁড়াবে। বিয়ে, বাবাজী, কপালঠোকা ব্যাপার। একটু দেখে শুনে, সামনে, উপস্থিত যেটা থাকে—ঢু মেরে লেগে যাও—শেষ পর্য্যন্ত দু আনাই হ'ক দশ আনাই হ'ক, তোমার বরাত মত সুখ লেগে যাবে। এই ধর না আমার বিয়ে, বাবা টেলিগ্রাফে ঠিক ক'রলেন! না তিনি, না আমি, না মা, মেয়ে দেখলেন। তাঁকে খবর দিলে এক বন্ধু। অমনি তারে তারে বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। তা' বাবাজী, আমি জাঁক করে' ব'লতে পারি—আমি অন্ততঃ বারো আনার দলে দাঁড়িয়েছি। আর আমাদের ব্যারিষ্টার নবীন মুখুয্যে, সাত রাজ্যি ঘুরে কোর্টশিপ করে' বিয়ে কল্লে, ষোল বছরের মেয়ে—পাঁচ বছর না যেতে যেতে মেয়ের রূপ হ'ল পেত্নীর মত,—আর গুণের জোরে মুখুজ্যে ভায়া প্র্যাকটিস ছেড়ে আজ দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমনি গিন্নীর ঝাঁজ! সব এইখানে বাবাজী, সব এইখানে—বলিয়া তিনি কপালে হাত দিয়া দেখাইলেন।

প্রসাদ একটু হাসিয়া বলিল,—আপনার ভাগ্যে বার আনা হ'য়েছে বলে' কি সবাই 'তারে' বিয়ে ক'রবে ব'লতে চান ?

উমা। তা' ব'লতে চাইনে। তবে মোটের উপর ফলের যে খুব তফাৎ হ'বে, তা ব'লতে পারি না। গড়-পড়তা সেই লাভ আট আনাই থাকবে, আর কারও ভাগ্যে হ'বে বারো আনা ;—কারো ভাগ্যে দু' আনা।

প্রসাদ। আর কারো ভাগ্যে শূন্য !

উমা। তা' হ'তে পারে হয় তো। শূন্য ভাগীও হ'বে—যেমন হ'য়েছেন কোর্টশিপ করে মুখুজ্জে মশাই।

প্রসাদ। তবে আপনি ভালবাসাবাসি জিনিষটায় বিশ্বাস করেন না ?

উমা। শ্রীবিষ্ণু ! বল কি বাবাজী ! তুমি ছেলে মানুষ—তোমায় কি-ই বা ব'লবো ? আমার একটা বদনাম আছে যে, এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমি আর আমার স্ত্রী যেন lover রয়ে গেছি। ভালবাসায় বিশ্বাস করি না মানে কি ?

প্র। যদি ভালবাসা আছে মানেন, তবে স্বামী স্ত্রীর কপালঠুকে বিয়ে করে, শেষে ভালবাসার জন্যে স্বর্গের দিকে হাত পেতে থাকার চেয়ে, ভালবাসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রলে দোষ কি ? যা'কে ভালবাসি, তাকে যদি বিয়ে করি, তবে এই আঁধারে ঢিল মারবার দায় থেকে তো মুক্তি পাওয়া যায়।

হাসিয়া উমানাথ বলিলেন, "এ সব তোমার Poetry বাবাজী, নিছক Poetry। ভালবাসা বইয়ে প'ড়েছ, আসল জিনিষটির আস্বাদ পাও নি কি না, তাই এই সব ব'লছো। বিয়ে হ'লে ভালবাসতে হ'বেই,—তা সে দু আনাই হ'ক, আর বার আনাই হ'ক। ওই যে শূন্য'র কথা বল্লে, সেটা

সম্পূর্ণ আমি মানি না। যার সঙ্গে দিনরাত শোয়া বসা, একই interest নিয়ে নড়া চড়া, তার সঙ্গে মনের মিল কতকটা যে হ'তেই হ'বে। কাজেই বিয়ে করে' ভালবাসার জন্য কারও ভগবানের কাছে হাত পেতে বসে' থাকতে হয় না। তা' ছাড়া ভালবাসা হ'ল বিয়ের একটা bye-product— বিয়ের আসল উদ্দেশ্য তো নয়। সেই bye-product এর জন্যে সারাজীবন হাঁ করে বসে' যে কাটাতে চায়, তার মত বেকুব কেউ নেই। শুধু ভালবেসে স্বামী স্ত্রীর চলে না। তেমন চলে—যদ্দিন কোর্টশিপ হয়,—পুরুষ থাকেন একখানে, নারী থাকেন আর একখানে। যেমন তেষ্টা পেলে লোকে জল খায়—তেমনি। যখন তাদের ভালবাসা পায়, তখন তাদের দেখা শুনা। স্বামী স্ত্রীর তো সেটি হ'বার জো নেই। তাদের সম্বন্ধ চব্বিশ ঘণ্টার—বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের। তাদের সমস্তটা জীবন একেবারে সামনা সামনি হ'য়ে মেশামেশি হ'য়ে যায়। তাদের মধ্যে যত রকম কারবার হয়, তার মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদান সেরকে ছটাকের বেশী নয়। সেই প্রকাণ্ড কারবারের কোনও পুঁজীর উপায় না ক'রে, যদি তুমি কেবল ভালবাসা সম্বল ক'রে জীবন-স্রোতে গা ঢেলে দেও, তবে তোমার দেউলে হ'বার ষোল আনা সম্ভাবনা।

এই ধর না মুখুজ্যের কথা। তারা পরস্পরকে ভালবাসতো তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তা' ছাড়া কোনও কিছুতেই তাদের মিল ছিল না। মুখুজ্যে ছিল পণ্ডিত, তার স্ত্রী প্রায় আকাট মুর্খ। মুখুজ্যে বেজায় খরুচে, স্ত্রী ভীষণ কৃপণ। মুখুজ্যের মদ না হ'লে চলে না, স্ত্রী মদের গন্ধ সইতে পারে না। কাজেই ভালবাসা থাকলেও তা নিয়ে সংসার চললো না। কত ছোকরাই তো উঠ্‌তি বয়সে একটা মেয়ের চাঁদমুখ দেখে শেলী বায়রণ

কপচাতে থাকেন,—আর ভালবাসেন। কিন্তু বস্, যদি ওইটুকু সম্বল নিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন, তবে পস্তাতে হ'বে নিশ্চয়। তুমি হয় তো গোঁড়া হিন্দু, তোমার তিনি খৃষ্টান। তুমি হয় তো দুধ ভালবাস, তাঁর দুধ দেখলে ন্যাকার আসে। তুমি হয় তো গা ঘেঁসাঘেসি করে' শোয়া পছন্দ করো না, তার গা ছুঁয়ে না শুলে ঘুমই আসে না। তা ছাড়া, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার তিনি হয় তো নাপ্তিনী—যার সঙ্গে তোমার মনের যোগ মোটেই হ'তে পারে না। এস্থলে বিয়ে করা স্রেফ বেকুবী। 'লভ' করতে হয়, 'লভ' কর; কিন্তু যেখানে মিল না আছে, সেখানে বিয়ে ক'রো না,— ক'রলে সুখী হ'তে পারবে না। তাই আমাদের সমাজে আবহমান্ কাল থেকে স্বজাতিতে বিবাহ, সমান বিবাহ,—এই সব চলে আসছে; তাই ধনীর পক্ষে গরীব বিয়ে করা উচিত নয়, গরীবের ধনী বিয়ে ক'রতে নেই।

প্রসাদ কটমট দৃষ্টিতে উমানাথের দিকে চাহিল। এ বুড়া কি তার অন্তরের কথার সন্ধান পাইয়াছে? না হইলে তার এ সব বকিবার কি প্রয়োজন। এ সব কথা তার মোটেই ভাল লাগিল না। সে একটু অসহিষ্ণুভাবে কথাটা চাপা দিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া রহিল।

উমানাথ বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিলেন না,—অনেকটা বকিয়া একটু শ্রান্ত হইয়াছিলেন,—হুঁকা কল্কি বাহির করিয়া তামাক খাইবার উদ্যোগ করিলেন।

এলাহাবাদে নামিয়াই উমানাথ বাবু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তার আফিসে ঢুকিয়া দশ টাকা খরচ করিয়া একখানা টেলিগ্রাম করিলেন, প্রসাদের মার নামে।

তাঁহার সঙ্গে রওনা হইবার সময় প্রসাদ তার মার নামে একখানা চিঠি

লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা উমানাথ দেখিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই চিঠির ঠিকানা তাঁহার স্মরণ ছিল। টেলিগ্রাম করিয়া তিনি প্রসাদকে লইয়া বাড়ী গেলেন।

প্রসাদের মার কাছে তিনি নিজের নাম গোত্র-কোষ্ঠীর পরিচয় দিয়া লিখিলেন, প্রসাদের সঙ্গে তিনি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। প্রসাদ তাঁহার সঙ্গে আছেন। প্রসাদের মায়ের যদি অভিপ্রায় হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া এলাহাবাদে আসিয়া কন্যা দেখিয়া যান। যে পর্য্যন্ত তাঁর আসা না হয়, সে পর্য্যন্ত উমানাথ প্রসাদকে এহাহাবাদে রাখিবার অনুমতি চাহিলেন।

প্রসাদের কথা

ভাল ফ্যাসাদ করেছে এই উমানাথ বাবু। বাস্তবিক, পরের উপকার ক'রতে নেই। সেকালে সিন্দবাদ এ কথা বুঝেছিলেন, যখন সাগরের বুড়ো তাঁর কাঁধে ভর ক'রে ব'সেছিল ; আর বুঝছি একালে আমি। উমানাথ বাবুর উপকার ক'রতে আমি এলাম এলাহাবাদ, পরের দিনই ফিরে যাব। তা' তাঁর আবদার সাতটা দিন তাঁর বাড়ীতে থেকে যেতেই হ'বে। আমি তো বুঝিয়ে বল্লাম, আমার ভয়ানক তাড়া, ভয়ানক কাজ। কিন্তু উমানাথ বাবু যখন তাঁর ওই আশ্চর্য্য হাসি হেসে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কাজের রকমটা কি? তখন আমি তাঁকে কোনও একটা সুবিধামত জবাব দিতে পারলাম না। আমি ব'লে বসলাম যে,—মার খুব জরুরী দরকারে কলকাতা যাচ্ছিলাম।

ভদ্রলোক আবার তেমনি করে' মুচকি হেসে একখানা টেলিগ্রাম বের করে দেখালেন, মা লিখেছেন ;—আপনি প্রসাদকে যত দিন ইচ্ছা রাখতে পারেন, যদি তার কোনও আপত্তি না থাকে।—বস্ এ কথা ফেঁসে গেল। আসল কথাটাও বলা হ'ল না। কেন হ'ল না, তা' ব'লতে পারি না। কেবল আমার মন হ'তে লাগলো যে, এই লোকটির কাছে মালতীর কথা উত্থাপন করাও অসম্ভব। কথাটি তুললেই, নিশ্চয়ই ইনি আমার পেটের নাড়ী থেকে সব গোপন তথ্য বের করে' ফেলে, এমন একটা মৃদু পরিহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দেবেন যে, আমার সব রোমান্স একেবারে ফুঁ হ'য়ে উড়ে' যাবে।

যেতে পারলাম না, কিন্তু মহা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম। মনটা ভারী উত্যক্ত বোধ হ'ল, উমানাথের উপর ভীষণ রাগ হ'ল। সমস্ত ক্ষণ খুঁৎ খুঁৎ করে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু খুঁৎ খুঁৎ করবার খুব যে বিশেষ কোন হেতু ছিল, এ কথা জোর করে বলতে পারি না। ভদ্রলোকের সমস্ত পরিবার মিলে আমায় এমন তোয়াজে রাখছেন যে বলবার নয়। তাঁর বড় ছেলে সুধীর, যা'র স্ত্রীকে আমি অসময়ে বিপদে পতিত দেখে এই ফ্যাসাদে এসে পড়েছি, সে তো আমার গোলামী ক'রছে। আর তাঁ'র স্ত্রীটি—সে তো গোড়া থেকেই আমার দাসী ব'নেই র'য়েছে। কথা সে কয় না আমার সঙ্গে, কিন্তু যত ক্ষণ বাড়ীর ভিতর থাকি, তত ক্ষণ সে স্বামীর সঙ্গে আমার চারিদিক দিয়ে ঘুর ঘুর করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কেবল তার ঘোমটার তলা থেকে তার ডব্‌ ডবে' চোখ তুলে সে কাতর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চায়। সে চাহনী যেন আমার অন্তরের খুঁৎখুঁতুনিকে লক্ষ্য করে' স্পষ্ট তিরস্কার করে,—এমন চাবুক মারে মনের পিঠে যে, আমি ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে উঠি। এ মেয়েটির বয়স বড় জোর পনেরো বছর হ'বে—একেবারে ছেলে মানুষ,—কিন্তু তার এমন ভারিক্কি চাল, আর চক্ষের দৃষ্টি দিয়ে এমন গম্ভীর তিরস্কার কোথা থেকে এলো, তা' ভেবে পাইনে।

আর একটি মেয়ে আছে, সুধীরের ছোট বোন চপলা। কথাটা অন্যায় ব'ল্লাম! মেয়ে অনেকই আছে। উমানাথ বাবুর পাঁচটি মেয়ে। দুটির বিবাহ হ'য়েছে, আর তিনটি এখনো ঘরে মজুত। তা ছাড়া, তাঁর ভাগ্নীও গুটি দুই আছে। কিন্তু আমার চ'খে লেগেছে কেবল ওই একটি মেয়ে। এমন একটা দস্যি মেয়ে ভূভারতে কেউ দেখেছে কি না সন্দেহ। ভয়ানক

বাড়ন্ত মেয়েটি, বয়সও বছর চৌদ্দ হ'বে। কিন্তু সে লাফালাফি ছুটাছুটি করে' বেড়ায় যেন দশ বছরের খুকীটি। তার বাপ মা অনেক কষ্টে এইটুকু ক'রেছেন যে, সে এখন বাইরে রাস্তায় ছুটে যায় না, কিন্তু ধিঙ্গীপনা বাড়ীতে করে আঠার আনা। ভাইদের সঙ্গে তার মারামারি লেগেই আছে। সুধীর যে তার আট বছরের বড়, তাকেও সে গ্রাহ্য করে না। তার উপর যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করে, দুই এক ঘা' মারও খায়, মার খেয়ে হেসে গড়ায়।

আমি যখন প্রথম এ বাড়ীতে এলাম, তখন চপলার ভারি লজ্জা। আমার কাছে আসে না। সে যেখানে থাকে, সেখানে আমি গেলে, সে দৌড় মারে,—তা' সে মাঠের পর মাঠ ছুটে হয় তো পালায়। অথচ আমাকে দেখবার কৌতূহলও তার ষোল আনা আছে। আমি যখন ঘরে বসে থাকি, হঠাৎ দেখি, একদিককার ঝিল-মিলির একটা পাখী উঠে গেল,—আর তার ভিতর দিয়ে চঞ্চল দুটো চোখ মেলে উঁকি মেরে আমাকে চেয়ে দেখছে। আমার চোখে চোখে পড়তেই সে ঝিলমিলি ছেড়ে দিয়ে এই ছুট!

হ'ক চৌদ্দ বছরের মেয়ে, কিন্তু একে দেখে কোনও সঙ্কোচ হয় না। এর লুকোচুরী খেলা দেখে হাসি পায়, সঙ্গে সঙ্গে খেলতেও ইচ্ছা করে। তার আমাকে লুকিয়ে বেড়ান দেখে, আমার ইচ্ছা হ'ল তাকে একবার ধরে' সামনা সামনি দাঁড় করিয়ে ফেলি। এ ইচ্ছা হবার কারণ এই যে, আমি তাকে কিছুতেই চৌদ্দ বছরের মেয়ে ব'লে বিবেচনা ক'রতে পারি নি,—তাকে ছোট্ট একটি আট দশ বছরের দুষ্ট মেয়ে ব'লেই যেন আমি দেখেছি। তা ছাড়া, এ মেয়েটাকে কেবল আবছায়ার মতই আমি দেখেছি। ওই খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দুটো ডাগর চঞ্চল চোখ, দুয়ারের ফাঁকে চার পাঁচটা চাঁপার কলির মত আঙ্গুল—তার ডগায় ডগায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে—তা' ছাড়া,

কিছুতেই যখন পারলে না, তখন মুখ নীচু করে দু'হাত দিয়ে চেষ্টা ক'রতে লাগলো। আমি দু'হাতই ধরে ফেল্লাম। সে শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নানা রকম করে জোর করতে লাগলো। আমার মত গুণ্ডার হাত থেকে তাতে সে মুক্তি পাবে কেমন করে? কিন্তু এটা বুঝলাম যে, তার গায় জোর আছে। সে নবনীত-কোমলা নয়,—যদিও যে হাত দুখানা তার আমি হাতের ভিতর ধ'রেছিলাম, সে দুখানা ভারি নরম।

আমি হেসে বল্লাম "এইবার?"

সে কেবল, "ইঃ" "আঃ" "দেখুন" "যান" প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ ক'রতে লাগলো। একবার হঠাৎ তার গোটা মুখখানা আমি দেখতে পেলাম। লজ্জায় সে রক্তজবার মত লাল হ'য়ে গেছে; সে তার আগুনের মত ঝাঁঝাল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "ছিঃ"! আমি একদম মুসড়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। ওই দৃষ্টি, আর ওই "ছিঃ", এমন একটা তিরস্কার আমার মনের ভিতর এমনি ছুরীর মত হ'য়ে ব'সে গেল যে তা' বলবার কথা নয়।

তাই তো! এ কি বিসদৃশ কাণ্ডটা আমি করে' ব'সলাম! চপলা যে আর ছোট্ট মেয়েটি নয়, তা' আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে এখন অনুভব ক'রলাম,—আর লজ্জায় ম'রে গেলাম। চপলা যে আমাকে কি ভাবলো, তাতে আমার এক ফোঁটা সন্দেহ রইলো না। আমি তার কাছে একটা নেহাৎ পাপিষ্ঠ বনে গেলাম, আর আমার এই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ খেলাটা তার কাছে একটা ভয়ানক সাহসের চেষ্টা বলে দাঁড়িয়ে গেল। কি ঘেন্না!

সেদিন আর লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারলাম না। চপলার বৌদির চলন-চালন যেন আমার কাছে ভারী গম্ভীর ঠেকলো। তিনি নিশ্চয়

শুনেছেন, আর শুনে না জানি কি ভাবছেন! সুধীরও সব শুনেছে বলেই মনে হ'ল। উমানাথ বাবুরও মুখে বড় একটা হাসি দেখা গেল না। আর চপলা সেই যে ডুব মারলো, তাকে তো সারাদিনের মধ্যে দেখাই গেল না। আমি ভারি অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলাম। এ যে অখ্যাতি এ তো কয়-বারও নয়, সয়বারও নয়। কেউ আমার কাছে তো মুখোমুখী হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, তিরস্কারও করছে না যে বুঝিয়ে বলব। অথচ চোখে সবার এই তিরস্কার দেখতে পাচ্ছি। এর কি জবাব দেব? আর জবাব দেবই বা কি ছাই? আমার কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য—যে কেউ বিশ্বাস ক'রবে?

রাত্তিরের খাওয়ার পর আমি উমানাথ বাবুকে বাল্লাম,—আমি কাল সকালেই যাচ্ছি।

উমানাথ বল্লেন,—বিলক্ষণ, কাল তোমার মা আসছেন, আর তুমি যাবে কি রকম?

মা আসছেন? আমি আকাশ থেকে প'ড়লাম। উমানাথ বাবু আমাকে মার চিঠি দিলেন। তিনি লিখেছেন,—আমার যদি মেয়ে পছন্দ হয়, তবেই হ'বে.—তাঁর আর মেয়ে দেখবার দরকার নেই। তবে যখন উমানাথ বাবু নিতান্তই পীড়াপীড়ি ক'রছেন তখন মা আসছেন। বিশেষ আমি যখন এখানে আছি।

এ সব কি কথা? তলায় তলায় এত সব কাণ্ড হ'য়ে গেছে, আমি তার কিছুই জানি না!

আমি সুধীরকে নিরিবিলি পেয়ে বেশ একটু উষ্ণ ভাবেই বল্লাম,—এ সব কি? আমি তোমার বোনকে বিয়ে করবো না।

সুধীর ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে,—সে কি ? আমার স্ত্রী তা' হ'লে মিথ্যা ব'লেছে ?

আমার সন্দেহই রইল না—কি কথা সুধীরের স্ত্রী তাকে ব'লেছে। আমি একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলাম। মুখ নীচু করে' ব'লাম,—তিনি হয় তো ভুল বুঝেছেন, আমাকে মাপ করো।

কিন্তু মাপ করবার কোনও রকম লক্ষণ তার চেহারায় টের পেলাম না।

সেদিন রাত্রে ভারি এলোমেলো সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। মালতীর সঙ্গে চপলা মিশে গিয়ে—কি সব যে দেখতে লাগলাম, তা ভাবতেও লজ্জা করে। আমি দুপুর রাতে উঠে বসে জানালার উপর বসে' ভাবতে লাগলাম।

মালতীকে আমি ভালবাসি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেমন ভালবাসি! সে দিন উমানাথ বাবু ব'লছিলেন,—ভালবাসার রকম ফের আছে। আমি পাঁটা ভালবাসি খাবার জন্য। জকি লুইস সাহেব ঘোড়া ভালবাসে চড়বার জন্য ; আর চৌষট গড়ের মহারাজা বাহাদুর ঘোড়া ভালবাসেন আস্তাবলে বেঁধে রাখবার জন্য। ইংরেজরা আমাদের দেশটাকে ভালবাসেন—এমন দেশ কি হয়!—এত টাকা, এত নবাবী দুনিয়ার আর কোথাও মিলে না। আমরাও এই দেশ ভালবাসি। আমরা একটা মানুষকে ভালবাসি চোখ দিয়ে—তার রূপ দেখবার জন্য, আর একজনকে ভালবাসি হয় ত তার রান্না খাবার জন্য। একজনকে ভালবাসি তার দুঃখের জন্য, আর একজনকে তার ভালবাসার জন্য। খাঁটি ভালবাসা তাকেই বলি, যেখানে আমার সব মন প্রাণ ইন্দ্রিয় দিয়ে আর একজনের সবটাতে আমি আনন্দ বোধ ক'রতে পারি। এমনটা সংসারে হয় না।

তবে বারো আনা মাপে হ'তে পারে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে—যেখানে তোমার স্ত্রীর সবটায় মেশামেশি মাথামাথি হ'য়ে গেছে।

কথাটা মনে এখন বড় লাগলো। মালতীকে কি আমি ভালবাসি? তার রূপ মন্দ নয়, কিন্তু—এই ধর চপলার কাছে—তাকে রূপসী বলা চলে না, তা স্বীকার ক'রতেই হ'বে। তার দুঃখটাই আমার অন্তরকে বেশী মথিত ক'রেছে। সেই দুঃখপীড়িতা মূর্ত্তি যা আমি ছবিতে এঁকেছিলুম সেইটাই তো আমার অন্তরের ভিতর বসে রয়েছে। কিন্তু উমানাথ বাবু যা' বলেছেন, সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে—আমি মালতীর কি-ই বা জানি, কি-ই বা ভালবাসি। ওকে নিয়ে ঘর ক'রতে পারি কি? তার সঙ্গে আমার মনের যোগ কোথায়? আমার আদর্শ, আমার চিন্তা—এ সব তো তার মনের ধারে, কাছেও নাই। দেশ বলতে আমাদের গাঁখানা বই কিছু সে বোঝে কি না সন্দেহ। কবিতা তার প্রাণে কোনও সাড়া দেয় না। অন্য দিকে এই চপলা—এ লেখাপড়ায়, বুদ্ধিতে, কাজকর্ম্মে, চঞ্চলতায়, সব রকমেই আমার মনের চারিদিক দিয়ে বেড়ে তাকে তৃপ্তি দিতে পারে।

এ কথা ভাবতে আমার ভয়ানক রাগ হ'ল—নিজের উপর ভারি অশ্রদ্ধা হ'ল।

মালতীর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করছি বলে মনে হ'ল। কিন্তু সে তো আমাকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। তবে আর বিশ্বাসঘাতকতাই বা কই করলুম? তা' ছাড়া, আর একটা কথা—মালতী আমার ভালবাসার মান কোনও দিনই রাখেনি। আমি যেই ক'লকাতার বাড়ীতে গেলুম, সে অমনি বেরিয়ে গেল। আমি গেলুম ব'লেই যে গেল, তা'

নিশ্চয়। তার পর বিয়ের কথা সে অস্বীকার ক'রলে। আর শেষ শচীর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে' বসলো। তবে আর আমার দোষ কি ?

এমনি সব এলোমেলো ভাবনা আমার হ'ল। যতই ভাবতে লাগলাম, ততই দেখতে পেলাম যে, চপলাকে আমি বেশ রীতিমত—ভালবেসেছি ব'লতে আর এখন ভরসা করি না—কিন্তু রীতিমত কামনা ক'রছি; আর আমার মন আমার অজ্ঞাতসারেই তাকে পত্নীরূপে কল্পনা করে' অপার আনন্দ অনুভব ক'রছে।

ছি—ছি—ছি—আমি কি একটা এমনি অপদার্থ! মাকে যে আমি এই বলে বেরিয়েছি যে, আমি বিয়ে ক'রব না। আজ যদি হঠাৎ চপলাকে বিয়ে করে নিয়ে তাঁর কাছে ফিরি, তবে যে আর মুখ দেখাতে পারবো না! আমি নিজেই মনকে এই লঘুত্বের জন্যে খুব ধমকালাম, শাসালাম,—শেষে মালতীকে—জোর ক'রে ধ্যান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম।

কিন্তু মালতী যে নেই, সে আমার হবে না, হ'তে পারে না। সে পরস্ত্রী; তার কথা ধ্যান করাও যে আমার পাপ! আর এদিকে চপলাকে নিয়ে আমি যে কাণ্ডটা করে' ব'সেছি—তার বৌদি—সেও টের পেয়েছে, আর সুধীরকে ব'লেছে। এখন যদি আমি তাকে বিয়ে করবো না বলি, তবে তারা যদি চাবুকে আমার চামড়া তুলে দেয়, তবু তো আমার কিছু ব'লবার থাকবে না। যদি চাবুক তারা না মারে, সে কেবল তাদের অসময়ে উপকার ক'রেছিলাম বলে!

ভেবে চিন্তে কিছুই ঠিক ক'রতে পারলুম না। মা এসে আমাকে

এ দায় থেকে উদ্ধার ক'রবেন, এই ভরসায় সমস্ত ভাবনা চিন্তা মার পায় সমর্পণ করে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে প'ড়লাম।

*   *   *   *

মা এসে আমায় উদ্ধার ক'রলেন—চপলাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে।

মালতীর কথা

আমি তখন কুটনো কুটছিলাম। মার কাছে মামাবাবু এসে এক-খানা লম্বা টেলিগ্রাম পড়ে শুনালেন। এলাহাবাদের উমানাথ বাবু আমাদের প্রসাদ বাবুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান।

তার শুনেই মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। আমি লজ্জায় মরে গেলুম। আমার বুকের ভিতর যে ছুঁচ ফুটছিল, তা তাঁর কাছে লুকোবার জন্ম একমনে তরকারী কুটতে লাগলুম।

উমানাথ বাবুর বাপের নাম মার শোনা ছিল। তিনি যে বড় কেউকেটা নন, তা' তিনি জানেন। মা বল্লেন,—কি উত্তর দি বল্‌তো মালতী ?

কি লজ্জা ! আমায় কেন জিজ্ঞাসা, বল দেখি ? আমার ইচ্ছা কি, তা কি মায়ের এখনো জান্‌তে বাকী আছে ? আমি শুধু বল্লাম,—বেশ তো—বেশ হয়।

মার মুখখানা কিন্তু কেমন যেন শক্ত হ'য়ে উঠলো। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন,—তুই লিখে দে নির্ম্মল, প্রসাদ যদি বিয়ে ক'রতে চায়, তবে আমার অমত নেই। আর সে যত দিন ইচ্ছা সেখানে থাকুক। মামা বল্লেন,—কিন্তু দিদি, তোমায় যে যেতে লিখেছেন—উমানাথ বাবু। আমি বলি চল না একবার।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা বল্লেন,—না, আমার আর গিয়ে দরকার নেই।"

সেই তার করা হ'ল। তার পর উমানাথ বাবু ফের তার ক'রলেন। শেষ পর্য্যন্ত মা যাওয়াই স্থির ক'রলেন।

বেশ তো—বেশ! এই তো যোগ্য তার! আমি নীচ গয়লার মেয়ে, তায় বিধবা,—আমার এতে কি বলবার আছে? আমার ওপর তাঁর মন পড়ে থাকবে, এমন কি আছে আমার। তা'ছাড়া, তাঁকে তো আমি পেতে পারি না। আমি যে গয়লা, বিধবা! তাঁর ভাল হ'ক—তাঁর বউ এলে তাঁকে আমার মত ভালবাসুন,—এই তো আমি চাই! তাঁকে আমি তো মুক্তিই দিতে চাই—তাই তো ঘর থেকে পালিয়েছিলুম। তবে কি? বেশ তো—বেশ!

কিন্তু, মন মানে কই। পোড়া চোখের জল মানে কই! বুক যে ভেঙ্গে যায়! হায় রে পোড়ারমুখী,' হুটো দিন তুই কি স্বপ্নই দেখেছিলি,—আশার বাতাসে কোন্ স্বর্গে তুই উড়ে গিয়েছিলি? সব স্বপ্ন, সব মিছে! তাই না আজ তোর আছাড় খেয়ে তোর চির-পরিচিত মাটীর উপর পড়ে কেঁদে মরতে হচ্ছে! হায় হায়!

মা আমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছেন। পোড়া কপাল আমার! আমি বল্লুম,—আমাকে এ ক'দিন না হয় বাড়ীতেই রেখে যান। তাই হ'ল,—মা প্রয়াগ গেলেন।

*   *   *   *   *

আজ খবর এসেছে, কাল প্রসাদ বাবুর বিয়ে,—আমি তবু বেঁচে আছি! ব্যথায় যখন বুক ফাটে, তখন লোকে মরে না কেন? কিসের

আশায় আমার মত লোক বেঁচে থাকে? কেবল পরের গলগ্রহ হ'য়ে বেঁচে থাকবার জন্য?—হায় রে কপাল!

আজ আর একটা কথা মনে হ'চ্ছে। প্রসাদ বাবু একদিন আমায় ভালবেসেছিলেন। আচ্ছা, তাঁর বউ নিয়ে এখানে ফিরে এলে, আবার হয় তো আমায় ভালবেসে ফেলতে পারেন। যদি বাসেন, যদি তেমনি ক'রে এসে বলেন! তবু কি আমি বজ্রের মত শক্ত হ'য়ে থাকতে পারবো? না, পারবো না। আবার যদি সেই ভুবনমোহন মূর্ত্তি আমার সামনে প্রেমের কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়ায়, তবে যে আমি কেবল তার পায়ে লুটিয়েই পড়বো, তা বুঝতে পারলুম।

তবে?—কি সর্ব্বনাশ!

এখানে আর থাকা চলে না। থাকতে পারবোও না। এখনি আমার মনটা বউয়ের উপর হিংসায় ভরে উঠেছে। আমি শেষ পর্য্যন্ত কি ক'রে বসবো, তা কে জানে। যাকে সব চেয়ে ভালবাসি, সেই প্রসাদের জন্য আমার ঘরে কি শেষে আগুন জ্বালবো।

তার চেয়ে দীঘির জল মন্দ কি?

*　　　*　　　*　　　*

শেষ

মালতী আবার নিরুদ্দেশ হওয়ায়, সবাই নানা রকম কাণা ঘুষা করিতে লাগিল। তিন দিন পর নূতন বউ লইয়া প্রসাদ ও তাঁর মা ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন;—দীঘির জলে মালতীর দেহ ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

সমাপ্ত